শিক্ষায় শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যা

শিক্ষায় শিশু সমীক্ষা
ও
মনোবিদ্যা
(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীরণজিৎ দে, এম. এ. (কলোম্বিয়া), এম, এসসি.
(মনোবিদ্যার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়),
(শিক্ষায় কৃতিত্ব, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
অধ্যক্ষ, উচ্চ বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর ; ভারপ্রাপ্ত
অধ্যাপক, গবেষণা ও মনোবিদ্যা বিভাগ, স্নাতকোত্তর
বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর ; ভূতপূর্ব
অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং
কলেজ ও মনোবিদ্যার পরীক্ষক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাপ্তিস্থান
স্যাঙ্গুইন পাবলিসার্স কনসার্ন
৫, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এইচ. পি. কুণ্ডু
পোঃ ও জিলা বাঁকুড়া

মূল্য—টাঃ ৫·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীজগদীশ দাশ
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
১৬, নলিনচন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ভূমিকা

পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে শিশু সমীক্ষার যাবতীয় বিষয়ই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ; কিন্তু মনোবিদ্যার কয়েকটি বিষয় ঐ দুই খণ্ডে আলোচিত হয় নাই। তৃতীয় খণ্ডে এই বিষয়গুলির সবিস্তার আলোচনা করা হইল। স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা ও যুক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শিক্ষায় নির্দেশনা (Guidance), দলগত শিক্ষাপদ্ধতি (Group methods), শিখনের উপর নির্জ্ঞানের প্রভাব, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি আধুনিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে ; এমন কি একথা বলা যায় যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপদ্ধতিকে বুঝিবার জন্য শিক্ষকের এই সকল বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য। আধুনিক ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিয়াছে এবং আরও আসিতেছে তাহাতে শিক্ষায় নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহা হউক তিনটি খণ্ড একত্রে শিক্ষক শিক্ষণের সমস্ত স্তরের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে ; অর্থাৎ নিম্নবুনিয়াদী, উচ্চবুনিয়াদী, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী, বি, টি, ও বি, এড, কোর্সের শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যার প্রায় যাবতীয় বিষয়ই তিন খণ্ড লইয়া সমগ্র পুস্তকের মধ্যে থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে বিষয়গুলি যান্ত্রিক ও গতানুগতিকভাবে আলোচিত হয় নাই। আলোচনা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যার সাহায্যে করা হইয়াছে যাহাতে পরীক্ষার প্রয়োজন মিটাইয়াও বিষয়গুলির জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয় এবং এগুলি কিভাবে শিক্ষার নানাক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে হয় তাহার কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে।

রণজিৎ দে

———

প্রশংসাপত্র

সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য বলেন···লেখা বেশ সহজ হয়েছে। আমরা ইংরেজী বই পড়তে অভ্যস্ত। চিন্তাও অনেকখানি ইংরেজীতেই করি। কাজেই বাঙলায় বই লেখার সময় সেটা অনুবাদের মত হয়ে পড়ে। তোমার বই তা হয়নি।

এই জাতীয় বইয়ে theoretical আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু practical hint থাকলে ভাল হয়। এটা যে শুধু আলোচনার জন্য নয়, কাজের জন্য তা এতে বোঝা যায়। এবং আলোচনাটা কাজে লাগানও যায়। তোমার বইয়ে এই রকম practical suggestion আছে দেখলাম।

বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন বি, টি, কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখার্জী বলেন...সত্যি, আমার খুব ভাল লেগেছে আপনার বই। প্রতি বিষয়টির উপরই আপনি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন। বিষয়টির প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যাদি বেশ শৃঙ্খলা সহকারে আপনি আলোচনা করে গেছেন। অন্য বইতে মাঝে মাঝে যেমন দায়সারা কাজ দেখা যায়, সেরকম নয়। তিনটি ভাগ নিয়ে আপনার বই শিক্ষা মনোবিদ্যা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়ে থাকবে।

শিক্ষায় শিশু সমীক্ষা

ও

মনোবিদ্যা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা ও মনোবিদ্যা

শিক্ষা কিভাবে ঘটে তাহা বুঝিবার জন্য মনোবিদ্যার প্রয়োজন। শিক্ষায় মনোবিদ্যার স্থান কি বা মনোবিদ্যা পাঠে শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁহাদের শিক্ষাদান কার্যে কিভাবে উপকৃত হন তাহা তাঁহারা মনোবিদ্যার সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলে নিজেরাই বুঝিতে পারেন। তবু প্রথা আছে শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্বন্ধ লইয়া প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা। শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে শিক্ষক এবং শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যকে বুঝিতে সাহায্য করা। প্রত্যেক শিক্ষকের এমন কি প্রত্যেক লোকেরই শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণা আছে কিন্তু দেখা গিয়াছে মনোবিদ্যার জ্ঞানের অভাবে হয় সে ধারণা ভুল অথবা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মনোবিদ্যা অধ্যয়নের পর শিক্ষকের শিক্ষাদান অধিকতর ফলপ্রদ ও সফল হইবে। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় মনোবিদ্যা শিক্ষার প্রাণস্বরূপ। মনোবিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষা দাঁড়াইয়া আছে তাহা সার্থক আর যাহা নাই তাহা নিষ্ফল। একথা বলা ভুল যে শিক্ষার মধ্যে মনোবিদ্যাকে আনা হইয়াছে; মনই শিক্ষা গ্রহণ করে সেজন্য মনোবিদ্যা শিক্ষার মধ্যে বরাবরই ওতপ্রোত হইয়াই আছে—মনোবিদ্যা পাঠ করিয়া শিক্ষক এই সত্যই পুনরাবিষ্কার করেন মাত্র।

শিক্ষা কার্যকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষককে তিনটি জিনিষ ভাল করিয়া বুঝিতে হয়—শিক্ষার্থী, শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষার পরিস্থিতি।

শিক্ষার্থীদের লইয়াই শিক্ষাকার্য। পূর্বে পাঠ্য বিষয়ের উপর অধিকার থাকাকেই শিক্ষক হইবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হইত। কিন্তু যে শিখিবে তাহাকে না জানিলে যে তাহাকে শেখান যায় না একথা অনেক বেদনা, ব্যর্থতা ও বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া উপলব্ধ হইয়াছিল। এই উপলব্ধিই শিক্ষাব্রতীদের শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যায় আগ্রহী করিয়া তুলিল। শিশুর জীবন বিকাশের ধারা এবং তাহার আচরণের গঠনক্রমের জ্ঞান লইয়া আসিল শিক্ষা-জগতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। বিদ্যালয় ও শ্রেণীতে শিশুরা যাহা কিছু করে ও শেখে তাহার সত্য ব্যাখ্যা মিলিল। এই পুস্তকে শিশু সমীক্ষার বিস্তৃত আলোচনা এই জন্যই করা হইয়াছে। শিক্ষক তাঁহার শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বিকাশের ধারাটি বুঝিয়া তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাহাদের বিকাশ স্বাভাবিক ও অব্যাহত থাকে। বৌদ্ধিক শক্তি ছাড়াও শিক্ষাকার্যে আবেগের যে কতখানি প্রভাব আছে তাহাও শিক্ষক অবহিত হইবেন।

শিশুরা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই তাহারা নানা জিনিস শিখিতে থাকে। এই শেখার কাজকেই শিখন প্রক্রিয়া বলা হয়। শুধু যে শিক্ষক তাহাদের শেখান তাহা নয়, তাঁহাকে ছাড়াও তাহারা নানা জিনিস শেখে। বড়দের কাছে যাহা হয়ত তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় তাহাও তাহারা পরমাগ্রহে শেখে। বিদ্যালয়ে যাহা শেখান হয় না এমন অনেক জিনিস তাহারা বিদ্যালয়ের বাহিরে শেখে। এইসব শিক্ষা শিশুরা নিজেদের অন্তরের চাহিদার প্রেরণাতেই শেখে। এগুলির সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শের কোন সম্পর্ক থাকে না। শিশুরা নানারকম খেলাধূলা করিতে শেখে, গাছে চড়িতে, সাঁতার কাটিতে শেখে, নানা জিনিস সংগ্রহ করিতে শেখে। এগুলি শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করেন না—বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে এগুলি পড়ে না। তবুও জ্ঞাতসারে না শিখাইলেও তাহারা তাহাদের মনের মত অনেক জিনিস শিখিয়া লয়। শিখিবার সময় কি ঘটে, শিক্ষক যাহা শিখাইতে চান

ছাত্র-ছাত্রীরা কেন তাহা শেখে বা তিনি যাহা শিখাইতে চাহেন না তাহাই বা তাহারা কেন শেখে এই সব বিষয় জানাই শিক্ষা মনোবিদের লক্ষ্য। শিখন প্রক্রিয়া লইয়া অনেক গবেষণার কাজ হইয়াছে এবং শেখাটা কিভাবে ঘটে সে বিষয়ে অনেক কিছু জানা গিয়াছে। তবে অনেক কিছু জানা যে বাকী আছে তাহাও সত্য। অনুসন্ধানের ফলে ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে যে শেখার কাজটি সহজ ও সরল নয়, বেশ জটিল। এজন্য শিখন সম্বন্ধে যে সব সমস্যা আছে তাহাদের সমাধানও খুব সহজ হইবে না।

শিখনের উপর যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে সেগুলিই শিক্ষার পরিস্থিতি। অতিরিক্ত গরমের মধ্যে শ্রেণীতে কাজ করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মদক্ষতা কমিয়া আসে—ইহা এক শিক্ষার পরিস্থিতি। উৎসাহী শিক্ষক দৃশ্য শিক্ষা সহায়ের (Visual aid) দ্বারা পাঠ্য বিষয়কে স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় করায় ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহ সহকারে বেশী শিখিতে পারিল, শিক্ষকের মধুর ব্যবহারের জন্য তাহারা যে বিষয় তিনি শেখান তাহা শিখিতে ভালবাসে—ইহা একটি শিক্ষা পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত। অনেক শিক্ষা পরিস্থিতি আছে যাহা তেমন প্রকট নয় ও সহজে ধরা যায় না কিন্তু শিখনের উপর যাহাদের প্রভাব খুব বেশী, যেমন—শিক্ষার প্রতি পিতামাতা ও অভিভাবকদের মনোভাব। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ, কৃষিকাজ ইত্যাদি শিক্ষার বাহন কিন্তু যাঁহারা শুধু তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এইসব হাতের কাজ শিখিবার পক্ষপাতী নন এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্তানদের কাছে তাঁহাদের প্রতিকূল মনোভাব ও অশ্রদ্ধা জানান এবং তাহার ফলে তাহারাও হাতের কাজ শিখিতে উৎসাহ বোধ করে না। শিক্ষা-পরিস্থিতি ও শিখন-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ খুব নিগূঢ়।

শিক্ষাদান সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আমরা শিক্ষায়তনের সম্বন্ধে ভাবি। এমন মনে হয় যে, শিক্ষা যেন স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিকেই আশ্রয় করিয়া আছে। এই সব শিক্ষাস্থান বা শিক্ষা-পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষকই যেন নানাভাবে শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন এইভাবে তাঁহাকে দেখা হয়। তিনি শ্রেণীতে পাঠ ব্যাখ্যা

করেন, পরীক্ষা নেন, বাড়ীর কাজ করিতে দেন ইত্যাদি। অবশ্য শিক্ষার্থী, শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষা পরিস্থিতির মধ্যে শেষোক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা বা ইচ্ছামত পরিবর্তন আনা শিক্ষকের পক্ষে সহজতর। কিন্তু শিক্ষাকে শুধু শিক্ষা-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখাই ঠিক হইবে না। শেখার কাজে শিক্ষার্থী ও শিখন প্রক্রিয়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা মনোবিদ্যা দেখাইয়া দিয়াছে। পূর্বে এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, শিক্ষক যদি ঠিকমত শিক্ষা-পরিস্থিতি রচনা বা সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা হইলেই ছাত্র-ছাত্রীরা অভিলষিত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ ধারণা সত্য হইলে শিক্ষা খুব সহজ হইত এবং এইরূপ এইরূপ শিক্ষা-পরিস্থিতিতে এইরূপ এইরূপ শিক্ষা ঘটিবে—এইরূপ ছক কাটা প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান চলিতে পারিত। কিন্তু আমরা জানি এই রকমভাবে শিখাইতে গিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যর্থ হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। ব্যর্থতার কারণ এই যে—শেখার কাজ যান্ত্রিকভাবে হয় না, ইহা একটি সজীব প্রাণধর্মী ব্যাপার। শিক্ষার্থী দেহে-মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। সে তাহার অন্তর্নিহিত চাহিদা ও প্রেরণাবশে নানা জিনিস শিখিতে চায়, নানা জিনিস পরীক্ষা করিতে চায়। শেখার কাজ ক্রমেই আগাইয়া চলে ও নানা দিকে বিস্তৃত হয়। বিদ্যালয় একটি শেখার জায়গা কিন্তু একমাত্র নয়। তাহার অন্তর, তাহার সামর্থ্য, তাহার আগ্রহ, তাহার পরিপক্বতা, তাহার সামাজিকবোধ, তাহার আত্ম-ধারণা এসবই সে কি শিখিবে তাহা নির্ধারণ করে। পরিবেশ-সমাজ বস্তু-ব্যক্তির সহিত প্রাণে প্রাণে সক্রিয় যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী তাহার দেহে মনে শিক্ষাকে ফলাইয়া তোলে। মনোবিদ্যা এইদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি বাড়াইয়া দিয়াছে। মনোবিদ্যার জ্ঞানে শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন যে শিক্ষার্থী ও শিখন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপলব্ধি না থাকিলে শিক্ষা কখনও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া তিনি আরও জানিবেন যে শিক্ষার স্থান শুধু

বিদ্যালয় নয়—প্রকৃতি, সমাজ ও সারা বিশ্বই শিক্ষার স্থান হইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শিক্ষা কিভাবে ঘটে তাহা যথাযথ বুঝিতে পারার জন্যই শিক্ষকের মনোবিদ্যার জ্ঞান দরকার। আবার শিক্ষা কিভাবে ঘটে বুঝিতে গেলে যে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহাকে ভালভাবে বোঝা চাই কারণ সে-ই শিক্ষাকে ঘটিয়ে তোলে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বোঝা দুরূহ ব্যাপার। তাহাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বুঝিতে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা হয়ত আমরা মনে করি না। আমরা যাহা শিখাইব তাহারা তাহা শিখিবে ইহা আমাদের বেশ মনোমত। তাহাদের বুঝিয়া তাহাদের মত শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহা যেন আমাদের আত্মাভিমানে বাধে। সেজন্য শিশুদের বোঝার জন্য বড়দের একটি স্বাভাবিক অনাগ্রহ ও অনিচ্ছা দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষাকে ফলপ্রদ ও সার্থক করিয়া তুলিতে গেলে শিশুদের বোঝা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকার আর গত্যন্তর নাই। তাহাদের না বুঝিয়া শিখাইতে গেলে শিক্ষা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, অর্থেরও অপচয় হয়। তাহা ছাড়া ইহার ফলে শিশুরা হয়ত শিক্ষার প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িতে পারে এবং তাহাদের আবেগময় জীবনে আসিতে পারে বিক্ষোভ ও অশান্তি।

অবশ্য শিশুদের ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই যে ভাল শিক্ষক বা শিক্ষিকা হওয়া যায় তাহার কোন কথা নাই। ভাল শিক্ষক বা শিক্ষিকা হইতে গেলে আরও অনেক গুণের দরকার হয় কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রাথমিক প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে শিক্ষার সফলতা। এই জ্ঞান মনোবিদ্যাই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিতে পারে।

শিশুকে বুঝিবার নানাদিক আছে। মনোবিদ্যা পাঠ করিতে করিতে শিক্ষক সে বিষয়ে অবহিত হন। ছয় বৎসরের একটি শিশু হয়ত শিক্ষক যাহা শিখাইতে চাহিতেছেন তাহা শিখিতে পারিতেছে না। এখানে শিক্ষক শিক্ষা-পরিস্থিতি তাঁহার বিচারমত সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু যে ফল তিনি আশা করেন তাহা পান না। কিন্তু তিনি যদি শিশুকে বুঝিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি

দেখিবেন যে হয়ত শিশুর অনভিজ্ঞতার জন্যই সে শিখিতে পারিতেছে না। বিমূর্ত্ত চিন্তায় সে এখনও অভ্যস্থ হয় নাই, সেজন্য সে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া বা শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ফলে সে কিছু শিখিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহাকে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিখিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে তাহার মানে বুঝিবে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—নদীর উৎপত্তি, প্রবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে ছয় বৎসরের শিশু শুধু কথা বলার দ্বারা তেমন বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে যদি নদীর মডেল তৈয়ারী করে এবং জল ঢালিয়া দেখে বা অন্য দৃশ্য শিক্ষা সহায় (Visual aid) তাহাকে দেখান হয়, তাহা হইলে বিষয় বস্তু তাহার কাছে স্পষ্ট হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়। সুতরাং যে শিক্ষক শিশুকে না বুঝিয়া তাহাকে নদী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে যান তাহার শিক্ষা ব্যর্থ হয় ও তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন। কিন্তু যে শিক্ষক ঐ বয়সের শিশুদের আগ্রহ, অনাগ্রহ এবং মানসিক বিকাশের তত্ব জানেন তিনি এমনভাবে শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করেন যাহার সহিত শিশু একাত্মতা বোধ করে এবং শিক্ষাকে করে সার্থক। আর একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। যে মেধাবী শিশু তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় শিখিবার সুযোগ পায় না, তাহার শ্রেণীর পাঠে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং আগ্রহের অভাবের জন্য পড়াশুনায় পিছাইয়া পড়ে। যে শিক্ষক তাহাকে বুঝিতে পারেন না তিনি তাহাকে অল্প মেধা সম্পন্ন মনে করেন এবং তাহার পড়াশুনার প্রগতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু যে শিক্ষক বুঝেন যে সে তাহার মেধার পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না বলিয়াই শ্রেণীর কাজে উদ্দীপ্ত হইতে পারিতেছে না, তিনি তাহার জন্য উন্নত ধরণের আকর্ষণীয় কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করেন যাহাতে সে তাহার মৌলিকতা দেখাইতে পারে ও স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে ও সৃজনাত্মক কাজ করিতে পারে। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প ও প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষা-পরিস্থিতি রচনা করা হয়। ইহাতে সকল রকম বুদ্ধির ছাত্র-ছাত্রী তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিতে ও শিখিতে পারে।

কোন জিনিস ভালভাবে বুঝিতে পারিলে তাহা নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যাও করা যায়। যে শিক্ষক শিশুদের বুঝেন তিনি জানেন যে শিশুরা যত বড় হইতে থাকে ততই তাহারা সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ, বিধি-বিধানকে তাহাদের আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া তুলে। সুতরাং তাহাদের আচরণের ব্যাখ্যা তিনি করিতে পারিবেন। আবার শিশুদের মধ্যে সাধারণ-ভাবে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেকটি শিশু অন্যদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সকল জিনিস শিখিবার ক্ষমতা সব শিশুর মধ্যে সমানভাবে থাকে না। কেহ হয়ত ভাষা তাড়াতাড়ি আগ্রহভরে শিখিতে পারে কিন্তু অঙ্কে তেমন দ্রুত করিতে পারে না এবং অঙ্ক শিখিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ দানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ নানা রকমের ছেলেমেয়েদের দেখেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া নানা ধারণা গঠন করেন। এইসব তথ্য ও ধারণা প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর আচরণকে নিজের কাছে এবং প্রয়োজন হইলে অপরের কাছে ব্যাখ্যা করিবার কাজে সাহায্য করে। এইসব তথ্য সংগ্রহ ও ধারণা গঠনের কাজে শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যা শিক্ষককে প্রভূত সাহায্য করে।

শিশুদের বুঝিতে পারিলে তাহাদের আচরণের কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় তাহার বোধও জন্মে। যেমন বাড়িয়া উঠিবার সময় শিশুদের মধ্যে কিছুকালের জন্য আঙ্গুল চোষা, ক্রোধে অধীর হওয়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদি আচরণ সমস্যা দেখা যায়। শিশু সমীক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষক জানেন যে এইগুলিতে ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। স্বাভাবিকভাবেই ইহাদের আবির্ভাব হয় এবং কালক্রমে ইহারা আপনিই চলিয়া যায়। অপরপক্ষে কোন শিশুকে যদি দেখা যায় সে সব সময় চুপচাপ থাকে, সঙ্গী-সাথী থেকে দূরে থাকিতে চায়, সব বিষয়ে নিস্পৃহতার ভাব দেখায় তাহা হইলে তাহার লক্ষণগুলি যদিও কোন অপ্রীতিকর প্রভাব উৎপাদন করে না এবং কদাচিৎ অন্যের লক্ষ্যগোচর হয় এবং লক্ষ্য গোচর হইলেও তাহা ভাল লক্ষণ বলিয়াই গৃহীত হয় কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষক ইহার অস্বাভাবিকত্ব বুঝিতে পারেন এবং

শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে ইহার অশুভ পরিণাম উপলব্ধি করিয়া অনতিবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন।

এইরূপ যাহা প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ তাহা উপলব্ধি করা ভাল শিক্ষক হইবার পক্ষে একান্তভাবে দরকার। কোন কোন শিক্ষকের স্বাভাবিকভাবে এই অন্তর্দৃষ্টি থাকে তবে তাঁহারা যদি উপযুক্ত পুস্তক পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের উপলব্ধি আরও গভীর হয় এবং তাঁহাদের দক্ষতাও বাড়িয়া যায়। আবার অনেক শিক্ষক আছেন যাঁহারা সত্যই কি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে বড় করিয়া তুলেন। এইরূপ ভুলপথে চলিবার ফলেই তাঁহারা তাঁহাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সহযোগিতা পান না।

সফল শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া শিশুদের বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের আচরণের কারণ নির্ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের কারণ নির্ণয় অনেক সময় সঠিক হয় কিন্তু কিভাবে তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আসেন তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন না। অবশ্য জীবনের অনেক জিনিসই কথায় বর্ণনা করা যায় না অথচ অনুভব করা যায়। তবে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাদানে যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখাইতে পারেন না তাঁহারাও শিশুদের সম্বন্ধে তাঁহাদের উপলব্ধি বেশ জোরের সহিতই ব্যক্ত করেন এবং পূর্বের উদাহরণের মেধাবী শিশুর পাঠে অরুচি দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে অনগ্রসর শিশু বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শিশুর সম্বন্ধে তাঁহাদের উপলব্ধি বা বিচার সত্য হয় না।

এই দিক থেকে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে শিশুকে যদি সত্যই বোঝা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আচরণ কি হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যাইবে। একথা বলা যায় যে অসফল শিক্ষক অপেক্ষা সফল শিক্ষকের আন্দাজ বা অনুমান সত্য হয়। কিন্তু আমরা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না। কার্য-কারণ সম্বন্ধের সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পাইতে চাই এবং সেইজন্য শিক্ষক-শিক্ষণের মধ্যে শিক্ষা-

মনোবিদ্যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। শিক্ষা কি কি কারণে সফল হয় ও কি কি কারণে ব্যর্থ হয় তাহা জানিবার জন্য মনোবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা বহু বৎসর ধরিয়া শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষার পদ্ধতি লইয়া কত গবেষণা হইয়াছে। সেইরূপ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, পরিপক্কতা, বংশগতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রেষণা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি বহু বিষয় লইয়া তাঁহারা অধ্যয়নে রত আছেন। শিক্ষার সাফল্য বা অসাফল্য এইসব বিষয় বা কারণগুলির উপরই নির্ভর করে। যদিও শিখন প্রক্রিয়া ও কিরূপ অবস্থার মধ্যে ইহা ঘটে এসম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবার আছে তবে এ পর্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহা বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে শিখন কিভাবে ঘটে তাহা বুঝিবার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে সহায়ক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে শিখিবার ক্ষমতা বা বুদ্ধি ছাত্র-ছাত্রীদের কি পরিমাণ আছে তাহা আর আন্দাজ বা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুপরীক্ষিত অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর বুদ্ধি সঠিকভাবে মাপা আজ সম্ভব হইয়াছে। বুদ্ধির সাফল্যাঙ্ক দেখিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা কতদূর লেখা-পড়ায় অগ্রসর হইতে পারিবে তাহা বলা যাইতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় অভীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধিকে বুঝিয়া তাহারা লেখাপড়ারূপ আচরণ কিরূপ করিবে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এই জিনিসটি যথার্থ বোঝার বা উপলব্ধি করার কষ্টিপাথর। শিশুকে যদি যথার্থ বোঝা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আচরণ কিরূপ হইবে তাহা বলাও সম্ভব হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী করিয়া যে পাঠ্যসূচী তৈয়ার করা হয় তাহা শিশুদের বিকাশকে বুঝিবার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম প্রথম শ্রেণীর শিশুদের আয়ত্ত করিতে বলিলে একথা পূর্বাহ্নেই বলা যায় যে তাহারা সফল হইবে না অথচ তাহারা চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলে সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। গবেষণার ফলে শিশু-জীবনের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া উপরের দুইটি উদাহরণের মত মনোবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা শিশুদের আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিতে পারেন।

শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এইরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করাইতে পারে।

শিশুদের ঠিকমত না বুঝিবার ফলে তাহাদের দিক থেকে তাহাদের আচরণকে বিচার শিক্ষক করিতে পারেন না। তাহাদের আচরণের প্রভাব তাঁহার উপর যেমন পড়ে তিনি সেই দৃষ্টিতেই তাহার মূল্যায়ণ করেন। ছোট ছোট শিশুরা তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বা কাজ সম্বন্ধে তত যত্ন লইতে পারে না, খানিকটা খেয়ালখুশী মত চলে—ইহাতে শিক্ষক বিরক্ত হন অথবা তাহাদের আচরণ তাঁহাকে বিরক্ত করে এবং এই বিরক্তির ফলে তিনি তাহাদের আচরণকে নিন্দনীয় মনে করেন। কিন্তু শিশুদের পক্ষে যে অত অল্প বয়সে সামাজিক আদব-কায়দায় দুরস্ত হওয়া সম্ভব নয়, তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখনও ততটা বিকশিত হয় নাই, তাহারা এখনও তাহাদের প্রবৃত্তিবশেই যে এখনও চলিতে চায় এবং উত্তম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থাকিলে স্বভাবিকভাবেই তাহারা অভিপ্রেত আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, ইহার জন্য তাহাদের দেহ মনের তৈয়ারী হইতে যথেষ্ট সময়, পরিপক্বতা ও শিক্ষার দরকার এবং জোর করিতে গেলে নানা আচরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে ইত্যাদি বিষয় যে শিক্ষকের শিশুদের সম্বন্ধে উপলব্ধি নাই তিনি না ভাবিয়া অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হন। বিদ্যালয়ের ও গৃহের কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের ঔদাসীন্য শিক্ষককে পীড়িত করে। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ও কাজকর্মের যে গুরুত্ব শিক্ষক অনুভব করেন ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা করে না, ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারূপ বিরোধ-বিসম্বাদ ঘটে। কিন্তু যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বোঝেন, তিনি জানেন যে শিক্ষার্থী যদি কাজে আনন্দ না পায়, কেন কাজটি করিবে তাহা অনুভব না করে এবং শিখিবার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিতে পারে তাহা হইলে সে কার্যকরীভাবে কিছু শিখিতে পারে না। এইসব না জানিবার ফলে শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না এবং ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের শিখিবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা পায় না এবং উদাসীন ও অমনযোগী হইয়া পড়ে। সুতরাং শিশুদের সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার উপরই শিক্ষার সাফল্য

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং এই বুঝিবার কাজে সাহায্য করে শিশুসমীক্ষা ও মনোবিদ্যা।

শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যা পাঠে শিক্ষক-শিক্ষিকা এখন যে তথ্যগুলি জানিতে পারেন সেগুলি বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রের মূল্যবান অবদান। পূর্বে প্রয়োগশালায় (laboratory) যে গবেষণা করা হইত তাহাই শিক্ষা মনোবিদ্যার উপাদান ছিল। প্রয়োগশালায় আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে শ্রেণীতে শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু দেখা গেল প্রয়োগশালার নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির মত শ্রেণীর পরিস্থিতি অত সরল ও সহজ বোধ্য নহে এবং কেবল প্রয়োগশালায় আবিষ্কৃত সত্যের সাহায্যে না পারা যায় সম্পূর্ণরূপে শেখার কাজকে ব্যাখ্যা করিতে, না পারা যায় তাহাকে আশানুরূপ সার্থকভাবে কাজে লাগাইতে। কিন্তু এখন অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষণার ফলে শেখার কাজকে আরও গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে জানা গিয়াছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের, মনোরোগ বিদ্যার ক্ষেত্রে, সমাজ কর্মের ক্ষেত্রের এবং আরও অনেক ক্ষেত্রের গবেষণা শিশু-প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়াছে। প্রক্ষোভের অসঙ্গতিহেতু আচরণ সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে সব সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে সেগুলির সাহায্যে শুধু যে শিশুদের বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয় তাহা নয়—পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বুঝিতে পারা যায়। মানুষের মূল চাহিদাগুলি কি কি এবং এইগুলির তৃপ্তি ও অতৃপ্তির ফলে কি পরিণাম হয় এই সম্বন্ধের জ্ঞান শিক্ষা-মনোবিদ্যা এইসব ক্ষেত্রের অনুসন্ধান হইতেই জানিয়াছে।

তবে প্রয়োগশালায় যে জ্ঞান জমিয়াছে তাহার মূল্যও কম নয়। শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এখনও আমরা থর্ণডাইকের শিখন সূত্র, প্যাডলাভের কনডিসনিং এবং গেষ্টাল্ট মনোবিদ্‌দের মতবাদের সাহায্য লই। ইহার কারণ এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে চিরন্তন সত্য আছে এবং সেইজন্য প্রায়োগিক মনোবিদ্যার (experimental psychology) মুখের দিকে শিক্ষা মনোবিদকে বরাবরই চাহিয়া থাকিতে হইবে। তবে শ্রেণী ও

বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় এবং শিশুর শেখার কাজে অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রভাব আসিয়া পড়ায় প্রয়োগশালার আবিষ্কৃত জ্ঞান যথেষ্ট এবং অনেক সময় উপযুক্ত হয় না। নির্ভুলতার উপর জোর দিলেও প্রায়োগিক মনোবিদ্যা মানুষের আচরণকে ব্যাপকতা দিতে পারে না। শিক্ষক সেইজন্য প্রায়োগিক মনোবিদ্যা এবং শিশু সমীক্ষা বিশেষ করিয়া চিকিৎসামূলক শিশু সমীক্ষার আশ্রয় লইবেন এবং ইহার ফলে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে উপলব্ধি একদিকে যেমন ব্যাপক হইবে অন্যদিকে তেমনি নির্ভুল হইবে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যায় মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার অবদান আছে। প্রায়োগিক মনোবিদ্যা ও রোগি পরীক্ষা মনোবিদ্যর (clinical psychology) কথা আলোচনা করা হইল। ইহা ছাড়া মানসিক অভীক্ষা ও মাপনা (measurement) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাদের সাহায্যে শিক্ষার কোন কোন দিকের সংখ্যাগত মূল্যায়ণ করাও সম্ভব হইয়াছে। এই সব অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষা গ্রহণে কি সুবিধা অসুবিধা বোধ করিতেছে, শিক্ষার পরিমাণের মূল্যায়ণ এবং শিক্ষার প্রগতি কতদূর হইতে পারে এইসব সম্বন্ধে জানা যায়। সমাজ মনোবিদ্যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ ও দলগত আচরণের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। ইহা শিক্ষার বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে বিপ্লব আনিয়াছে। পূর্বে শিক্ষক শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা শিষ্টভাবে বসিয়া শুনিত বা দেখিত। কিন্তু এখন বোঝা গিয়াছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষা ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে তাহা হইলে শিক্ষা কার্যকরী হয় না। সেজন্য এখন শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পরস্পরের সহিত সামাজিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়া শিক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়। এই দলগত জীবনে শিক্ষকও একজন সদস্য থাকেন। দলীয় জীবনে এমন সব শক্তির আবির্ভাব হয় যাহা একা ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। শ্রেণীতে যতক্ষণ শিক্ষক নিজেই শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নেন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখেন তখন শিশুরা একত্রে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে দলের ধর্ম আসে না। যখন তাহারা সকলেই সক্রিয় হইয়া শিক্ষণীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ

করে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয় তখনই শিক্ষা হইয়া উঠে প্রাণবন্ত ও সার্থক। নৃ-তত্ত্ববিদেরাও শিক্ষা-মনোবিদ্যায় উহাদের অবদান দিতেছেন।

আদিবাসীদের শিশুপালন, অভ্যাসগঠন, শিশুদের শিক্ষার প্রণালী, মাতা-পিতা ও শিশুর সম্পর্ক, কৈশোর কালের অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান, শিশুর বিকাশ ও শিক্ষার ধারণায় নানা পরিবর্তন আনিয়াছে।

দর্শন ও শিক্ষাতত্ত্বের অবদানও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গীত ও চারুকলা আসিয়াছে, গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন শিক্ষাদানের মাধ্যম করিয়াছে শিল্পকে ও সেবা, অহিংসাকে ও সহযোগীতাকে করিয়াছে শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি।

অবশ্য সবচেয়ে বড় অবদান শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই করিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারাই নানা সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় নানা গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কোন পদ্ধতি কার্যকরী না হইলে তাঁহারাই তাহার উপযোগীতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। নানা শিক্ষা-সরঞ্জাম লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ইহার ফলে নানারূপ পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের কাজ হইয়াছে এবং ইহার ফলে শিখন সম্বন্ধে অনেক উপকারী তথ্য জানা গিয়াছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও সমাজ বিজ্ঞান সমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিদ্যা এক অপূর্ব গভীরতা ও ব্যাপ্তি পাইয়াছে। পূর্বে গতানুগতিকভাবে শ্রেণী পাঠনের কাজকে সফল ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার দিকেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশ শুধু শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার বিকাশ ও শিক্ষার উপর গৃহ ও পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রভাবও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাহার বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিদ্যালয়ের বাহিরের প্রভাবের উপর। ক্রমেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার পরিসর এত বাড়িয়া যাইতেছে যে ইহার সহিত শিক্ষার আর কোন প্রভেদ থাকিতেছে না অর্থাৎ শিক্ষা ও শিক্ষা-মনোবিদ্যা অভিন্ন প্রতীত হইতেছে।

শিক্ষা-মনোবিদ এখন দেখিতেছেন যে শেখার কাজকে সফল ও কার্যকরী করিয়া তোলা ও শিক্ষার মূল্যায়ণ করিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হয় না। তাঁহাকে এখন মানসিক স্বাস্থ্য, দলীয় সম্পর্ক, শ্রেণীতে ভাবের আদান-প্রদান এবং শিক্ষক ও পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগীতার দিকেও তাঁহাকে মন দিতে হইতেছে। ইহাতে যদিও জটিলতা বাড়িয়াছে কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীই বেশী সহায়ক কারণ ইহার দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীকে, তাহার সমাজকে, তাহার শিখনকে এবং ইহাদের সহিত অপরের সম্বন্ধকে বুঝিতে পারিতেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে কি করা সম্ভব বা অসম্ভব তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পারে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার মধ্যে যাহা সত্য তাহাকে ইহা প্রমাণিত করে। সেইজন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলা যাইতে পারে। শিক্ষা-দর্শন শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্য স্থির করে কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব কিনা তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যা দেখাইয়া দেয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহার ফলে শিক্ষা-দর্শনকে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। পূর্বে সুশৃঙ্খলভাবে (logical) একের পর এক উচ্চতর শ্রেণীর জন্য পাঠ্যক্রম রচিত হইত এবং শিশুরা বিধিবদ্ধভাবে পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহাই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দেখা গেল এইরূপ ব্যবস্থায় শিশুরা শিক্ষনীয় বিষয়ের অর্থ বোঝে না এবং যে প্রাণময় সক্রিয়তা ও সংবেদন থাকিলে শিক্ষা সম্ভব হয় তাহা এই যান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাহার স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত গতি ও স্বাভাবিক প্রেরণা পায় না। ফলে শিক্ষাদর্শন পরিবর্তিত হইল এবং স্বাধীনভাবে খেলাচ্ছলে স্বাভাবিক শিক্ষার গতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। শিক্ষাদর্শনে বয়স্কদের দ্বারা স্থিরীকৃত যুক্তিযুক্ততা স্থান ছাড়িয়া দিল শিশু মনের স্বাভাবিক শিক্ষা প্রবণতাকে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা তাহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বলে শিক্ষাদর্শনকে অনেকবার পাল্টাইয়া দিয়াছে এবং সত্য দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছে। তবে শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণালব্ধ সত্যকে শিক্ষার ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্বে শিক্ষাদর্শনের সিদ্ধান্ত দরকার হয়। সেইজন্য শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা-মনোবিদ্যার একের সহিত অপরের সহযোগীতার উপর।

তবে শিক্ষা-মনোবিদ্যা যাহা আবিষ্কার করিয়াছে এবং শিখনের যে-সব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছে তাহা যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের শেখার কাজে প্রয়োগ না করেন তাহা হইলে শিক্ষা-মনোবিদ্যার পরিশ্রম তাহা যতই মূল্যবান হউক ব্যর্থ হইয়া যায়। সেইজন্য শিক্ষকতা-কার্যে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষা-মনোবিৎ হইতে হইবে এবং এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই শিক্ষা-মনোবিদ্যা পাঠ করিতে হইবে শুধু শিক্ষক শিক্ষণ পরীক্ষা পাস করিবার জন্য নহে। শিক্ষণ শেষে তাঁহাদের শ্রেণী পাঠনের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজে লাগাইতে হইবে। ইহাতে যেমন তাঁহাদের শেখানোর কাজ হইয়া উঠিবে সফল তেমনি শিক্ষকের বৃত্তিতেও তাঁহারা হইয়া উঠিবেন সমৃদ্ধ। শিক্ষকতাকে আমরা মহান ব্রত বলি। শিক্ষক যদি শিক্ষা-মনোবিদ্যার পথ নির্দেশে তাঁহার শেখানোর কাজ পরিচালনা করেন তাহা হইলে সত্যই এই ব্রত মহান ও সার্থক হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতি

ভুলে যাওয়া—মনে রাখা

আধুনিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে এই পদ্ধতিতে শিশুরা না বুঝিয়া শুধু পাঠ মুখস্থ করে—যুক্তি বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মায় না, জীবনের ক্ষেত্রে অধীত জ্ঞানকে প্রয়োগ করিতে পারে না বা পূর্ব জ্ঞানের দ্বারা সম্বন্ধিত নূতন তথ্যকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না কেবলমাত্র স্মৃতির উপরই ভরসা রাখিয়া চলে এবং পরীক্ষার শেষে সমস্তই ভুলিয়া যায়। শিক্ষার এইরূপ চিত্র অবশ্যই অনুমোদন করা যায় না। স্মৃতিশক্তিকে এইভাবে ব্যবহার করায় আধুনিক শিক্ষাব্রতীদের চক্ষে ইহার কদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু একথাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে স্মৃতিশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারাই যে-কোন প্রকার জ্ঞানার্জন সম্ভব। যাহা অর্জন করা হইবে তাহা যদি রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে সবই বৃথা। চিন্তা-যুক্তিও নির্ভর করে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার উপর। সুতরাং কি করিলে স্মৃতি কার্যকরী হয় তাহা শিক্ষক-শিক্ষিকার জানা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই আমরা ভুলিয়া যাই। অবশ্য অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর জিনিষ ভুলিয়া যাওয়াই ভাল কিন্তু যাহা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি তাহাও ভুলিয়া যাইতে হয়। পরীক্ষার আগে যে পরিমাণ বিষয় বস্তু মনে স্তূপীকৃত হইয়া থাকে তাহা বরাবর মনে থাকিলে কি ভালই হইত? কিন্তু দেখা যায় পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা না করিলে পরীক্ষার আগে যাহা মনে জলজল করিত পরীক্ষার পর দ্রুত তাহা বিস্মৃত হইয়া আসিতে থাকে। কত ছড়া, কবিতা বাল্যকালে আমরা মুখস্থ করি কিন্তু তাহার কতটুকু আমরা মনে রাখিতে পারি। তবে যে-সব কবিতা বা

পদ্যাংশ আমরা বক্তৃতায় বা অন্যভাবে বারবার অভ্যাস করি সেগুলি মনে থাকে। বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে কত হাজার হাজার খুঁটি-নাটি জিনিস শিখি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও ছাত্র-ছাত্রীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কত পরিশ্রম করে কিন্তু তাহার অধিকাংশই কি আমরা ভুলিয়া যাই না? একবার কোন কিছু শিখিয়া পুনরভ্যাস না করিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইবার সম্ভবনাই বেশী। অবশ্য মনে রাখিবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়—কাহারও স্মৃতিশক্তি বেশী, কাহারও কম। কবিতা, উদ্ধৃতি, তারিখ, নাম ও ফরমূলা এই জাতীয় জিনিস কালক্রমে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। আবার যে-সব জিনিস যেগুলি সাধারণ হউক বা ব্যক্তিগত হউক যাহাদের সহিত আমাদের আবেগ-অনুভূতি জড়াইয়া থাকে সেগুলি আমরা সহজে ভুলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতি লিখিতে গিয়া এই সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি আবেগ-অনুভূতিগুলিকে বিভিন্ন রঙ বলিয়া এবং ঐ রঙে রাঙান স্মৃতিকে চিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহারই কথায়, "কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি, জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে,—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে……।" বাল্যকালেপড়া গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের অনেক জিনিসই ভুলিয়া যাওয়া যায় কিন্তু বাল্যকালের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ বা ভয়-বিস্ময় মাখানো কোন কোন ঘটনা জীবনে ভোলা যায় না।

ভুলিয়া যাওয়ার একটি নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে। কোন কিছু শিখিবার পর ভুলের গতি প্রথমে দ্রুত থাকে পরে মন্থর হইয়া আসে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে অর্থহীন বাক্যাংশ বা (syllable) বা কবিতা মুখস্থ করিবার পর কয়েক ঘণ্টা বাদে প্রায় অর্ধেক ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রথম দিনে স্মৃতির অবনতি যে পরিমাণে হয় পরে তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। পনের দিন বাদেও দেখা

গিয়াছে এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক বিষয়বস্তু স্মরণে থাকে। একমাস বাদে এক চতুর্থাংশ স্মৃতিতে অবশিষ্ট থাকে। সাধারণভাবে স্মৃতিক্ষয়ের এই গতি সত্য হইলেও ব্যক্তিগত পার্থক্যও বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

তবে অর্থহীন বিষয়ের মত অর্থযুক্ত বিষয়ের স্মৃতিক্ষয় অত তাড়াতাড়ি হয় না। অর্থহীন বিষয় যেন আল্‌গা, উহাকে ধরিয়া রাখিবার মত কোন আকর্ষণ মনে থাকে না। কিন্তু অর্থযুক্ত বিষয় পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থযুক্ত হইয়া উঠে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহাকে চেনা জিনিসের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত করিয়া ধরিয়া রাখা যায়। এই সম্পর্ক নানা-প্রকারের হইতে পারে, যেমন—কার্য-কারণ, সময়ের ক্রম, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিবরণ, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, শব্দের অর্থ ইত্যাদি বিষয় বেশী মনে থাকে, কারণ এইসব বিষয়ের সহিত পূর্ব-অভিজ্ঞতার আনুষঙ্গিক বিষয়ের যোগ থাকে। কোন বিষয় এই সম্পর্কযুক্ত হইয়া মনে থাকিলে বিষয়ের কোন অংশ মনে পড়িলে অবশিষ্ট অংশ আপনিই মনে পড়িয়া যায়। এইজন্য অর্থযুক্ত বাক্য, সূত্র, মতবাদ, গল্প এবং যাহা কিছু সসংবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ তাহাদের স্মৃতি বেশী স্থায়ী হয়।

শারীরিক কৌশল বা নিপুণতাগুলি একবার ভাল করিয়া শিখিলে আমরা আর ভুলিয়া যাই না। সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া, ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালান, সার্কাস দেখান এগুলি একবার শিখিলে আর ভুলিতে হয় না। সেজন্য বলা হয় যে, মাংসপেশীর স্মৃতি মনের স্মৃতির থেকে বেশী এবং অধিকতর স্থায়ী। তবে একথাও ঠিক যে, দৈহিক কৌশলগুলির আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত অভ্যাস করি এবং অর্থযুক্ত বিষয়বস্তুরও যদি এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস রাখিতে পারি তাহা হইলে তাহাও বেশ কার্যকরী হইতে থাকে। তবে দৈহিক কৌশলের স্মৃতি মানসিক স্মৃতির থেকে বেশী থাকে, এ-কথা অনেকেই বলেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ের অধীত জ্ঞান যে আস্তে আস্তে কিরূপে ভুলিয়া যাওয়া যায় তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের ভুলিয়া যাওয়ার বিভিন্ন গতি আছে।

আবার একই বিষয়ের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ভুলিয়া যাওয়ার গতি বিভিন্ন। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অপেক্ষা বিষয়ের জ্ঞান বেশী তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়, আবার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে তাড়াতাড়ি ভুলে। তবে সর্বক্ষেত্রেই ভুলিয়া যাওয়ার গতি প্রকৃতিটি একই—অর্থাৎ প্রথমে বিষয় বস্তুর স্মৃতিক্ষয় বেশী পরিমাণে হয় এবং পরে ধীরে ধীরে হয়। পরীক্ষার সময় এমন সব খুঁটিনাটি বিষয় মনে রাখিতে হয় যেগুলি পরে স্মরণ রাখিবার আর বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। তাহাছাড়া পরীক্ষার পূর্বমূহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীরা যে পরিমাণ বিদ্যা তাহাদের মস্তিষ্কে ঠাসিয়া লইয়া যায় তাহা স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা তাহাদের স্মৃতিশক্তির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেই কারণে প্রথমটা খুব তাড়াতাড়ি স্মৃতিলোপ হইতে থাকে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যতই আসিতে থাকে ততই স্মৃতিক্ষয়ও কমিয়া আসে। কোন বিষয় শিখিবার এক বৎসর পর বিষয়ের এক চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেক স্মরণ থাকে, দুই বৎসর পর বিষয়ের স্মৃতি আরও কমিতে দেখা যায়—এসময়ও স্মৃতিক্ষয় চলিতে থাকে বলিয়া মনে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা তাহাদের পাঠ্যসূচী বেশী স্মরণ রাখিতে পারে বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ পাঠ্য বিষয়গুলির বারবার অভ্যাস তাহাদের করিতে হয়। পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর অনেকগুলি শ্রেণীতেই তাহাদের পড়িতে হয়। সাক্ষাৎভাবে এবং প্রসঙ্গক্রমে বৎসরের পর বৎসর একই বিষয় পড়িবার ফলে ঐ বিষয়ের অর্জিত বিদ্যার স্মৃতিক্ষয় বিশেষ কিছুই হয় না। যেটুকু ক্ষয় হয় তাহা আবার পূরণ হইয়া যাইতে থাকে। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির একটি কি দুইটি কোর্স লয় এবং ঐ বিষয়ের পড়া সাঙ্গ হইয়া গেলে তাহার আর কোন অভ্যাস তাহারা করে না, ফলে স্মৃতিক্ষয়ও সমধিক হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে শিশুরা যখন পড়াশুনা করে তখন তাহাদের বাড়িয়া উঠিবার সময়। এই সময় বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে

তাহাদের মানসিক বিকাশ খুব তাড়াতাড়ি হইতে থাকে। মানসিক শক্তির বৃদ্ধি স্মৃতিশক্তিকেও বাড়াইতে থাকে, ফলে এই উন্মেষশীল স্মৃতি ভুলিয়া যাওয়া ঘটিতে দেয় না। বিদ্যালয়ের শিশুদের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তিও বাড়িতে থাকে কিন্তু কলেজের ছাত্র-ছাত্রী বা বয়স্ক লোকেদের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি আর বাড়ে না।

কোন্ কোন্ অবস্থায় শিখন ও ধৃতি ভালভাবে ঘটে

ভুলিয়া যাওয়া এবং স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা অনেক কারণেই ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, কোন কিছু শিখিবার অব্যবহিত পরে শিক্ষার্থী কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে বা কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহার উপর ঐ বিষয়ের স্মৃতি নির্ভর করে।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখিবার ও অধীত বিষয় ধারণ করিবার ক্ষমতার পার্থক্য আছে। যে বেশী শিখিতে পারে সে মনেও রাখে বেশী। যে কম শিখিতে পারে সে মনেও রাখে কম।

গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে দীর্ঘকাল ছাত্র-ছাত্রীরা অবকাশ পায় তাহার ফলে বিষয়ের স্মৃতি কিছুটা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিরূপ উপাদান শেখা হইতেছে তাহার উপরও স্মরণ কতটা থাকিবে তাহা নির্ভর করে।

কোন জিনিস শিখিবার পর যদি মনে মনে পুনরাবৃত্তি করা যায়, তাহা হইলে সেই জিনিসের স্মৃতিকে মনের মধ্যে গুছিয়ে ও স্পষ্টভাবে রাখা যায় এবং তাহার স্মৃতিও স্থায়ী হয়।

শিখিবার বিষয় যদি অর্থপূর্ণ হয়, শিক্ষার্থী ইহা কেন শিখিতেছে তাহার কারণ বুঝিতে পারে তাহা হইলে সেই বিষয়ের ধৃতি (retention) ভালভাবে হয়।

কোন বিষয় সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পর যদি সেই বিষয়টিকে বারবার অধ্যয়ন করা যায় তাহা হইলে তাহার উপর পূর্ণ অধিকার আসে এবং তাহার ধৃতি সারা জীবনেই থাকে।

এখন আমরা স্মৃতির যে কারণগুলি উল্লিখিত হইল সেইগুলি সম্বন্ধে কিছু বিশদ আলোচনা করিব।

শিখনের পরবর্তী অভীজ্ঞতা এবং স্মৃতির উপর তাহার প্রভাব

কোন বিষয় শিখিবার পর শিক্ষার্থী যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে বা যেরূপ অবস্থায় পড়ে তাহার উপর নির্ভর করে সে সেই বিষয়টির কতটা মনে রাখিতে পারিবে। কিছু শিখিবার পরই যদি একটু ঘুমাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে অধীত বিষয়ের ছাপটি মনে পাকাপাকি ভাবে পড়িতে পারে এবং তাহার স্মৃতিও স্পষ্ট থাকে। কিন্তু এক বিষয় পড়িবার পরই যদি অন্য বিষয়ের পাঠে মনকে কর্মরত রাখা হয় তাহা হইলে পূর্বের বিষয়ের ছাপটি মনে ভালভাবে পড়িতে পারে না। নূতন জিনিস তাহার উপর পড়িয়া তাহার স্মৃতিকে অস্পষ্ট করিয়া দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস যে—ভোর বেলায় পড়াশুনা করিলে স্মরণ রাখা যায়। কিন্তু দিনের নানারকাম কাজকর্মে মন নিয়ত ব্যস্ত থাকে এবং ভোরের পড়া মনে থিতইবার কোন সময় বা সুযোগ পায় না। বিশ্রামের সূত্র অনুযায়ী বলিতে হয় রাত্রের পড়াশুনাই মনে রাখিবার বেশী সম্ভাবনা কারণ ইহার পর মনের আর কোন কাজ থাকে না। রাত্রে সুদীর্ঘ নিদ্রার অবসরে অধীত বিদ্যা মনে ভালভাবে বসিয়া যাইবার সুযোগ পায়। মোট কথা এই, কোন বিষয় শিখিবার পর মন সেই বিষয়ের স্মৃতিকে স্থিরতা দিবার জন্য কিছুটা সময় চায় এবং তাহার মধ্যে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে প্রথম বিষয়ের স্মৃতিছাপের মধ্যে গোলমাল আসিয়া যায়।

তবে যদি দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে একটি শিখিবার পর আর একটি শিখিলে প্রথমটির স্মৃতি দুর্বল না হইয়া বরং শক্তিশালীই হইয়া উঠে। বীজ গণিতের পর যদি ত্রিকোণমিতি শেখান হয়, তাহা হইলে বীজ গণিতের বিষয়-বস্তুর ভুল বেশী হইতে পারে বটে কিন্তু সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য বাড়িয়াই যায়। কেন না বীজ গণিতে সমস্যা সমাধানের যে কৌশল আয়ত্ত করা হয়, ত্রিকোণমিতিতেও অনুরূপ কৌশলের প্রয়োজন হয়; ফলে একই ধরণের

কৌশল দুই বিষয়েই অনুশীলিত হয়। কাজেই সমস্যা সমাধানের স্মৃতি বাড়িয়াই যায়।

একটির পর একটি একই রকমের বিষয়ে মনোযোগ দিতে গেলে আগেরটি তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাইতে হয়। ভূগোল ও পাটীগণিত দুই-ই বৌদ্ধিক বিষয়। পর পর ইহাদের পাঠদান দিলে নূতন বিষয়টি পুরাতন বিষয়টিকে তাড়াতাড়ি ভুলাইয়া দেয়। কিন্তু একই বৌদ্ধিক বিষয় থেকে মনোযোগ যদি গান গাওয়া বা শারীর শিক্ষণ-মূলক খেলাধূলায় ছাড়া পায়, তাহা হইলে পূর্ব অধীত বৌদ্ধিক বিষয়ের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ গান গাওয়া, ছবি আকা, খেলা করায় মন যে ভাবে ব্যস্ত থাকে তাহার সহিত বৌদ্ধিক বিষয়ের অধ্যয়নের সম্পর্ক নাই। কাজে কাজেই বৌদ্ধিক বিষয়ের ছাপটি মনে গাঁথিয়া যাইবার সময় পায়। সেইজন্য শিখিবার দুইটি বিষয় পালাক্রমে এমন হইতে হইবে যাহাতে মন দেওয়া দুই ধরণের হইবে এবং তাহার ফলে অর্জিত জ্ঞানের মন হইতে মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা কমিয়া আসিবে।

তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে একটির পর একটি বৌদ্ধিক বিষয় পড়াইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যে মাঝে কিছু সময় বিরতি থাকে এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে সপ্তাহের মধ্যে দুই একটি চিত্রাঙ্কণের শ্রেণী থাকে। কিন্তু ইহা সত্বেও সময় সূচীতে পর পর বৌদ্ধিক বিষয়ের সমাবেশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা অধীত জ্ঞানের ভুলিয়া যাওয়ার পথকেই সুগম করিয়া দেয়। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সময় সূচীতে কিন্তু অন্য রকমের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয়। একেত এইরূপ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে বৌদ্ধিক বিষয় ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, আলোচনা সভা ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনকারী নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা আছে তাহাছাড়া বৌদ্ধিক বিষয়ের জ্ঞানও অনেকাংশে শিল্প, প্রকৃতি ও সমাজকে আশ্রয় করিয়া অর্জিত হয়। ফলে শিক্ষার্থী তাহার হাত, মাথা ও হৃদয় একই সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবে জ্ঞানার্জনের পথে ব্যবহার করিতে পারে, বিদ্যালয় জীবনের কার্যক্রমে তাহার মনোযোগ শুধু যে ভিন্ন ধরণের বিষয় বা ব্যাপারে দিতে পারে তাহাই

নহে, ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকায় একের স্মৃতি অপরের স্মৃতিকে শক্তিশালী ও স্থায়ীতর করিয়া তোলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত চরকার গানটি গাহিতে শিখিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকের মুখে ঐ গানের ব্যাখ্যা শুনিল এবং পরে সূত্রযজ্ঞে গানটি গাহিতে গাইতে চরকা কাটিল। সম্পূর্ণ তিন ধরণের কাজ সে করিল আবার প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কার্যকরীভাবে বিদ্যালাভ ও তাহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার ইহা হইতে আর কি প্রকৃষ্ট পন্থা হইতে পারে? সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নাই। আছে শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের অনাবশ্যক স্তূপ যাহা না গিলিলে পরীক্ষায় পাস করা যাইবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয় পড়া হইল তাহা সেই অবস্থায় ছাড়িয়া না দিয়া তাহার পুনরালোচনা করিয়া অস্পষ্ট দিকগুলিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে এবং বিভিন্ন বিদ্যার টুকরাগুলিকে যুক্তির সূত্রে গাঁথিয়া একটি অর্থপূর্ণ ঐক্য ও সংহতি দিতে পারেন। এইরূপ করিলে অধীত বিষয় ভুলিয়া যাওয়া অনেকটা নিবারিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ একথা বিশ্বাস করা হয় যে—কোন বিষয় শিখিবার পর যদি অভ্যাস না করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিষয়ের স্মৃতি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার এখন একথা বলা হইতেছে যে স্মৃতিক্ষয়ের কারণ পরবর্তী নূতন নূতন শিক্ষার ফলেই হয়। নূতন বিষয় পুরাতন বিষয়ের স্মৃতির উপর ছাপ ফেলিয়া তাহাকে ঝাপসা করিয়া দেয়। এই মতে আমরা পুরান বিষয়ের পুনরালোচনা বা পুনরভ্যাস করি না বলিয়া স্মৃতিক্ষয় ততটা হয় না যতটা হয় নূতন বিষয় শিক্ষার ফলে। নূতন বিষয়ের স্মরণ-কার্য যেন পিছু হটিয়া পুরাতন স্মৃতিকে রোধ করিয়া দেয়। ইংরাজিতে ইহাকে Retroactive inhibition বলা হয়। বাংলায় ইহাকে 'প্রতীক সক্রিয় নিরোধ' বলা যাইতে পারে। মনের এই কার্য সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকার জানিয়া রাখা বিশেষ দরকার।

তবে এই মতবাদ সব রকম শিখনের কার্যেই প্রযোজ্য কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে অর্থহীন শব্দ বা শব্দাংশের (Syllable) একটি তালিকা মুখস্থ করিবার পর যদি অনুরূপ আর একটি তালিকা মুখস্থ করা হয় তাহা হইলে প্রথম তালিকার অনেক শব্দ ভুলিয়া যাইতে হয়।

এইরূপ অর্থহীন বিষয় ছাড়িয়া যদি আমরা অর্থপূর্ণ বিষয় ধরি তাহা হইলেও কি পুরান বিষয়ের স্মৃতি নূতন বিষয় শিক্ষার ফলে নষ্ট হইয়া যাইবে? যদি এইরূপই ঘটিত, তাহা হইলে কিছুই শিখিয়া রাখা যাইত না। এই মতে আমরা যতই শিখিব ততই ভুলিয়া যাইব। ধরা যাউক কবিতা মুখস্থ করিবার কথা। প্রথম স্তবক মুখস্থ করিবার পর যদি দ্বিতীয় স্তবক মুখস্থ করিতে আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে কি দ্বিতীয় স্তবক মুখস্থ করা শেষ হইতে হইতে প্রথম স্তবক ভুলিয়া যাইতে হইবে, আবার তৃতীয় স্তবক মুখস্থ করিবার পর কি দেখা যাইবে দ্বিতীয় স্তবকের স্মৃতি লোপ পাইয়াছে! বাস্তবিক এরূপ ঘটে না। ইহার কারণ কি? তবে কি প্রতীপ সক্রিয় নিরোধ সত্য নয়? প্রতীপ সক্রিয় নিরোধ সত্য, তবে কবিতার মধ্যে এমন একটি জিনিষ আছে যাহার ফলে পুরান স্মৃতির নিরোধ হয় না তাহা মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক থাকে। ইহা হইতেছে কবিতার অর্থ। সারা কবিতার মধ্যে আছে একটি ভাবের ঐক্য যাহা তাহার প্রত্যেক স্তবকটিকে অপর স্তবকগুলির সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে এবং অর্থসঙ্গতি দান করিয়াছে। এই অর্থসঙ্গতিই পুরান ও নূতন স্মৃতিকে যুক্ত করিয়া রাখে এবং ভুলিতে দেয় না। খাপছাড়া বা বিচ্ছিন্ন জিনিসই স্মৃতি হইতে খসিয়া খসিয়া পড়ে কিন্তু অর্থপূর্ণ হইলে তাহারা মালার মত মনের মধ্যে বিরাজ করে—একই সূত্র সকল স্মৃতিখণ্ডগুলিকে ধরিয়া রাখে।

কবিতা মুখস্থর মত ক্ষুদ্র জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি দেখি কিরূপে শিক্ষার্থী একটি সমগ্র বিদ্যার ক্ষেত্রকে আয়ত্ত করে, তাহা হইলে সেস্থলেও দেখিব যে অংশগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত আছে। কৃষিবিদ্যার শিক্ষার্থীকে রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও অর্থশাস্ত্র শিখিতে হয়। শিক্ষার্থী

দেখে যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বুঝিবার জন্য এই সকল বিষয়ের সমন্বয় এক বিশিষ্ট অর্থসঙ্গতি লাভ করিয়াছে। সেইরূপ শিক্ষণ কার্যকে যে পেশারূপে গ্রহণ করিতে চলিয়াছে তাহাকে শিক্ষাদর্শন, শিশু সমীক্ষা, মনোবিদ্যা, শিক্ষার ইতিহাস, পদ্ধতি ও বিদ্যালয় সংগঠন ও প্রশাসন বিষয়ে শিখিতে হয়। সে দেখে এই বিষয়গুলি পরস্পরের পরিপূরক—বিষয়গুলি একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হইয়াছে।

এইসব বিদ্যার ক্ষেত্রে যাহারা অগ্রসর হইতেছে তাহাদের একের পর এক বিষয় শিখিতে হইতেছে কিন্তু নূতন নূতন তথ্য ও সূত্র জানিবার ফলে কোন জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে না এবং শেখার কাজে কোন বিঘ্নও আসিতেছে না। নূতন জিনিস শিখিবার ফলে পুরান বিষয়কে স্মরণে রাখা কঠিন ত হয়ই না বরং নূতন জিনিস পুরানর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহাকে স্পষ্টতর করিয়া তোলে। আগের শেখা জিনিষ আরও অর্থসম্পদে সমৃদ্ধশালী হয় এবং নূতন পুরাতনকে বিনাশ করিবার বদলে তাহাকে আরও শক্তিশালী করে ও আরও স্পষ্টভাবে জাগরূক রাখে।

একথা এখন স্বীকৃত হইয়াছে যে বিদ্যার মধ্যে মূলত একটি ঐক্য বন্ধন আছে। সেইজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন জিনিষ শিখাইবার সময় দেখিতে হইবে তাহা যেন শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই দৃষ্টি দিয়াই বিদ্যাকে দেখা হয় এবং শিশুদের কাছে অর্থহীন ও যান্ত্রিক পুস্তক-কেন্দ্রিক পাঠদানের পরিবর্তে প্রকৃতি, সমাজ ও শিল্পাশ্রয়ী সাঙ্গীকৃত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যার নানা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহা এইরূপ পাঠদানে শিশুদের কাছে স্বতঃ প্রকাশিত হয় এবং তথ্য ও সূত্রের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে সেগুলি মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। এইরূপ সাঙ্গীকৃত পাঠে শিক্ষক এক বিষয়ের জ্ঞানের সহিত অন্য বিষয়ের জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিতে সাহায্য করেন এবং পরবর্তী শিখন পূর্ববর্তী শিখনকে মুছিয়া ফেলে না, তাহাকে আরও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। সেইজন্য প্রতীপ সক্রিয় নিরোধ

মুখস্থ ও অর্থহীন উপাদানের ক্ষেত্রেই খাটে এবং ঐক্যবদ্ধ বিদ্যার ক্ষেত্রে ইহার উল্টাটাই বরং সত্য অর্থাৎ পুরান শিক্ষা নূতন শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালীই হয়, দুর্বল হয় না।

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও স্মৃতি

অন্যান্য শক্তির মত স্মৃতিশক্তিও সকলের সমানভাবে থাকে না। যাহারা যত বেশী পরিমাণে শিখিতে পারে তাহারা তত কম ভোলে। ইহার কারণ কয়েক প্রকারের হইতে পারে। যাহারা বেশী শিখিতে পারে তাহাদের মানসিক সামর্থ্যও বেশী। তাহাদের অধীত বিষয় সম্বন্ধে ভাল অর্থবোধ থাকে এবং সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা হয় বেশ পাকাপাকিভাবে। অধীত বিষয়ের উপর বেশী অধিকার থাকায় সে সম্বন্ধে স্মৃতিও তাহাদের বেশী থাকে।

তাহাছাড়া যাহাদের সামর্থ্য বেশী তাহাদের অনেক জিনিসে আগ্রহ থাকে এবং নানারূপ বৌদ্ধিক কাজে তাহারা তৎপর থাকে এবং অনেক বেশী পড়াশুনা করে। ইহার ফলে অনেক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত জিনিস তাহারা শিখিতে পারে এবং ইহাতে অধীত বিষয়কে ভুলিতে দেয় না। এইরূপ লোকদেরই আমরা বেশী শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করি।

দীর্ঘ অবকাশ ও ভুলিয়া যাওয়া

আমাদের দেশে দুইটি দীর্ঘ ছুটি দেওয়া হয়, শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবং গ্রীষ্মের সময়। গ্রীষ্মের ছুটি দীর্ঘতর। ছুটিগুলির যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পড়াশুনা বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক জিনিস এবং নৈপুণ্য ভুলিয়া যায়। বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করিতে বেশ কয়েক সপ্তাহ চলিয়া যায়। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই অবকাশের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

ছুটিতে যে সমস্ত বিষয়েরই লোকসান হয় তাহা নয়। পড়িবার ও বিচার করিবার শক্তি যথাপূর্ব থাকে তবে ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের অনেক কথা ছুটির মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলিয়া যায়। অঙ্ক কষিতে যে যুক্তির

প্রয়োজন হয় সে যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে তবে অনেক নিয়ম ও কৌশলের স্মৃতি থাকে না—ছুটির পর আবার তাহাদের ঝালাইয়া লইতে হয়। ছুটির মধ্যেও ছেলেমেয়েরা নানারকম গল্প-বই পড়ে ও নানা কাজে তাহাদের চিন্তা-যুক্তিরও ব্যবহার করে সেইজন্য এইসব সামর্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু স্কুলের নিছক পাঠ্য বিষয়গুলির চর্চার অভাবে ভুলিয়া যায়।

তবে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ছুটির মধ্যেও পড়াশুনার চর্চা রাখে তাহা হইলে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞান কমিবার স্থলে বাড়িতেও পারে। অবশ্য উপরের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ায়, পাঠাভ্যাস রাখিতে যত্নশীল হয় কিন্তু নীচের শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় পড়াশুনা করিতে কোন উৎসাহ পায় না। তবে অঙ্ক কষিবার অনেক যান্ত্রিক দিকগুলি দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে প্রায় সকলেই ভুলিয়া যায়।

অবশ্য ছুটির মধ্যে যদিও কিছু লোকসান হয় তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই। শিশুরা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে সুতরাং ছুটির পর তাহারা দেহে-মনে কিঞ্চিৎ বাড়িয়া আসে এবং বিদ্যালয়ের বাহিরের জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসে। যেটুকু ক্ষতি ছুটিতে হয় তাহা তাহারা খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করিয়া লয় এবং নূতন জিনিস শিখিবার পক্ষে বেশী উপযুক্ত হয়। বস্তুতঃ ছুটি মানুষের বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে একঘেয়েমী কাটিয়া যায় এবং নব উদ্যম ও নব প্রেরণায় আবার কাজ আরম্ভ করা যায়।

দেখা গিয়াছে যাহাদের বৌদ্ধিক সামর্থ্য খুব বেশী ছুটিতে তাহাদের স্মৃতিক্ষয় সবচেয়ে কম হয় আর যাহাদের বৌদ্ধিক সামর্থ্য খুব কম ছুটিতে তাহাদের স্মৃতিক্ষয় সবচেয়ে বেশী হয়। যাহারা বেশী জানে তাহারা স্মরণও বেশী রাখে আর যাহারা কম জানে তাহারা স্মরণও কম রাখে।

একদিন না একদিন স্কুল ও কলেজের পড়া সাঙ্গ করিতেই হয়। শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে যে সব বিষয় দস্তুর মত পড়াশুনা করে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সব বিষয়ের সহিত হয়ত তাহার আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে

অবশ্যম্ভাবীরূপে বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই সে ভুলিয়া যায়। তবে আশা করা যায় যে, ছাত্রজীবনে নানা বিষয় পড়াশুনা করিবার সময় ছেলেমেয়েরা যুক্তি ও বিচার করিতে, নানা তথ্য পরীক্ষা ও সমালোচনার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসিতে এবং নানা জিনিসের বা ঘটনার সাধারণ সূত্র বা ঐক্য আবিষ্কার করিতে শিখিবে। বিষয়-বস্তুর খুঁটিনাটি ভুলিয়া গেলেও ঐ বিষয়ের পঠন ও আলোচনার দ্বারা যে মূল সিদ্ধান্তগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আসিতে পারিয়াছে তাহা তাহারা সারা-জীবনেও ভুলে না। বিজ্ঞান পড়িবার পর কেহ বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও সূত্র ভুলিয়া যাইতে পারে কিন্তু নৈসর্গিক ঘটনাগুলি যেমন—চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি কোন দৈব শক্তিতে ঘটে না, বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ঘটে এই সিদ্ধান্ত সে ভুলিয়া যায় না। রাহুর চন্দ্রকে গ্রাস, বাসুকীর ফণা হেলিবার জন্য ভূমিকম্প, এইসব কুসংস্কারের প্রভাব তাহার উপর আর থাকে না। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার করিতে হয়। অনুমাণ বা কল্পনা করিয়া সত্যলাভ হয় না এ সিদ্ধান্ত চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জীবনের সব ব্যাপারেই তাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে—সব কিছুই সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে আরম্ভ করে, শুধু মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। ধর্ম, সামাজিক প্রথা, শিক্ষা ব্যবস্থা—এ সকলের মধ্যে সে সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিতে চায়। বিষয়-বস্তুর অনুশীলন না করিলে তাহা ভুলিয়া যাইতে হয় বটে কিন্তু উহা অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলে যে মনোভাব, সিদ্ধান্ত ও সাধারণ জ্ঞান গড়িয়া উঠে তাহা জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষোপাদানের স্মৃতির তারতম্য

ব্যাকরণ, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদিতে অনেক শব্দ ও তাহাদের সংজ্ঞা শিখিতে হয়। নিছক এইগুলি শুষ্কভাবে মুখস্থ রাখা শক্ত। তাড়াতাড়ি ইহাদের স্মৃতিহানি হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি তাহার অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে সেই সামর্থ্য সে সহজে ভুলিয়া যায় না। ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারাই বিদ্যা প্রাণধর্মী হইয়া উঠে এবং স্মৃতিতে চিরদিন

বাঁচিয়া থাকে। সেইজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা তথ্য ও সূত্রগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের বার বার মুখস্থ না করাইয়া এইগুলি জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সেইজন্য বিদ্যাকে নিছক বিদ্যা হিসাবে না পড়াইয়া জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য কি এবং ছেলেমেয়েদের অন্তর্নিহিত চাহিদা ইহা কিভাবে মেটায় ইহার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং ছেলেমেয়েরা নানা কর্ম, শিল্প ও ভ্রমণের মাধ্যমে বিদ্যার অর্থ বুঝিতে পারে, শিখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও পুরা দায়িত্ব লইয়া বিদ্যাকে রীতিমত আয়ত্ত করে এবং জীবনে ফলাইয়া তুলে। যে বিদ্যা জীবনে ওতপ্রোত হইয়া যায় তাহার কখনও স্মৃতি ভ্রংশ হইতে পারে না।

যে জিনিসকে ভাল করিয়া বোঝা যায় না তাহাকে কঠিন বলিয়া মনে হয়। ইহা স্বাভাবিক যে কঠিন জিনিসের স্মৃতিও দুর্বল হয়। সহজ জিনিস বোঝা যায় বলিয়াই তাহার স্মৃতিও থাকে ভাল।

পুনরাবৃত্তি ও স্মৃতি

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা কোন বিষয় শুধু পড়িয়াই যায়। এইভাবে একটানা শুধু পড়িয়া না গিয়া পড়িবার সময় যেটুকু পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ যদি যাহা পড়া হইল তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে বা কথায় পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহা হইলে তাহার স্মৃতি বেশী থাকে ও স্পষ্টতর হয়। অর্ধেক সময় পাঠ পড়িয়া আর অর্ধেক সময় যদি এইরূপ পুনঃ স্মরণ ও পুনরাবৃত্তি করা যায় তাহা হইলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ পড়িবার সময়ের একচতুর্থাংশ সময় এইভাবে ব্যবহার করা উচিত।

শ্রেণীতে এইরূপ অধীত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিবার প্রসঙ্গে বিষয়ের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় এবং পাঠের বিষয়বস্তুকে রীতিমত অধিগত করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মন তৈয়ারী হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা

তাহাদের পাঠ পড়িবার সময় নিজেরাই এইরূপ পুনঃ স্মরণ ও বিধিবদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন শিক্ষিকের সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ করিতে গেলে মনকে সক্রিয়ভাবে বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দিতে হয় এবং শিখিবার জন্য একটি ইচ্ছা বর্তমান থাকে। কিন্তু শুধু পড়িয়া গেলে মনের দুইটি কার্য বর্তমান থাকে না।

অর্থপূর্ণ বিষয় ও স্মৃতি

দেখা গিয়াছে অর্থহীন বিচ্ছিন্ন বিষয় লোকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায় কিন্তু বিষয় যদি অর্থপূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার স্মৃতি দীর্ঘ স্থায়ী হয়। মনোবিদ্যার প্রয়োগশালায় অর্থহীন বাক্যাংশ (syllable) লইয়া বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ও স্মৃতি সম্বন্ধে বহু কথা জানা গিয়াছে। এইরূপ অর্থহীন বাক্যাংশ লইবার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি এইগুলি মুখস্থ করিবে তাহার কাছে এইগুলি একেবারেই নূতন—ইহাদের সহিত তাহার জানা বিষয়ের কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকে না। ফলে মুখস্থর কাজে সে কোনরূপ ইঙ্গিত বা সাহায্য পায় না—তাহাকে নিছক স্মরণ রাখিবার কাজই করিতে হয় এবং স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাই দরকার। ইংরাজীতে এইরূপ অর্থহীন বাক্যাংশের নমুনা, যেমন—kig, laj, Pyj, Tik ইত্যাদি। ইহাদের তালিকা পরীক্ষা গ্রহণকারীকে মুখস্থ করিতে হয়। যাহা হউক এইরূপ অর্থহীন বিচ্ছিন্ন বিষয় মুখস্থ হইবার পর ভুলিয়া যাইতেও বেশ সময় লাগে না। এইরূপ অর্থহীন বাক্যাংশ ছাড়াও যে সব শব্দ, ভাব বা তথ্য কাহারও কাছে অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেগুলিও সে তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। অপর পক্ষে অর্থপূর্ণ বিষয়ের সহিত পূর্ব অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ থাকে এবং মনের মধ্যে যে মানসিক অভিজ্ঞতার সংগঠন (organization) থাকে তাহার মধ্যে তাহা তাহার স্থান করিয়া লইয়া এক নব সংগঠন সৃষ্টি করে এবং তাহাও এক নব অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। যেমন, ধরা যাউক—কোন ছাত্র-ছাত্রীরদল পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আপন কক্ষপথে

প্রদক্ষিণ করিবে একথা জানে—তাহাদের মানসিক ধারণা এইরকম ছিল। পরে তাহাদের এই বিষয় শিখান হইল যে—পৃথিবী যে শুধু সূর্যের চারদিকে ঘুরিতেছে তাহাই নহে, সূর্যও তাহার সৌরমণ্ডলকে লইয়া মহাকাশে খুব সম্ভব কোন মহাসূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্যের গতির ফলে পৃথিবী একই কক্ষপথে ঘুরিতেছে না—তাহার পথ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে। পরীক্ষা করিবার জন্য একজন ছাত্র সূর্য হইয়া মেঝের উপর দিয়া চলিতে থাকিবে এবং আর একজন ছাত্র তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতে থাকিবে। সূর্য-শিশু চকে আকা একটি সরল রেখার উপর দিয়া চলিবে এবং পৃথিবী-শিশু সূর্য-শিশুকে যেমন যেমন প্রদক্ষিণ করিয়া চলিবে আর একজন ছাত্র সেই প্রদক্ষিণ পথ চক দিয়া আঁকিয়া যাইবে। ইহার ফলে তাহারা জানিবে পৃথিবী নিত্য নূতন কক্ষপথে চলিয়াছে এবং যে পথ দিয়া পৃথিবী আসিয়াছে সে-পথে আর ফিরিয়া যায় না। এই নূতন তথ্যটি তাহাদের আগের জানা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতায় ইহা সন্নিবেশিত হওয়ায় মানসিক সংগঠন বা ধারণ এক নূতন রূপ পাইল অর্থাৎ পৃথিবী যে একই কক্ষপথে বার বার ঘুরিয়া আসিতেছে তাহা নহে সূর্যের গতির ফলে ইহা নিয়ত নূতন পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সেইজন্য শিক্ষা দেওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের এমন স্পষ্টভাবে বুঝাইতে হইবে যাহাতে তাহারা বিষয়বস্তু ভুলিয়া না যায়। অর্থপূর্ণ স্পষ্ট ধারণা স্মৃতিতে স্থায়ীত্ব লাভ করে।

শিখিবার ইচ্ছা

কোন কিছু শিখিবার জন্য ও তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য যদি আন্তরিক তাগিদ থাকে তাহা হইলে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হওয়া যায়। কোন বিষয়ে যদি আগ্রহ না থাকে তাহা হইলে শিক্ষার্থী সেই বিষয়ে ভাল করিয়া মনোযোগ দেয় না এবং তাহার পুনরভ্যাসও করে যেমন-তেমন করিয়া, স্মরণ রাখিবার ইচ্ছাও তেমন থাকে না। ফলে সেই বিষয়ের শিক্ষাও ভাল করিয়া হয় না এবং

তাহার স্মৃতিও ক্ষীণ হয়। সেজন্য যান্ত্রিকভাবে পড়া ও অনুশীলনে শেখা ও স্মরণ রাখা কোনটাই আশানুরূপভাবে সাধিত হয় না। আগ্রহ ও মনের প্রস্তুতি না থাকিলে কোন বিষয় ধারণ করিয়া রাখা যায় না।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের নানা তাত্ত্বিক বিষয় শিখিতে হয় যাহার পরিসমাপ্তি হয় পরীক্ষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব বিষয় বাধ্য হইয়া পড়িতে হয়। এইগুলি শিখিবার ও স্মরণ রাখিবার জন্য তাহারা কোন আন্তরিক প্রেরণা বোধ করে না বরং পরীক্ষার পরে ইহাদের ভুলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের মন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পরীক্ষা শেষে হাফ ছাড়িয়া বাঁচে এবং শেখা জিনিস মনে রাখিবার কোন চেষ্টা করে না। সেইজন্য ভুলিয়া যাওয়া দ্রুতগতিতে চলে এবং তাহারাও তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা করে না।

এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিখ্যাত শিক্ষা-দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতীরা নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহারা যাহা শিখিবে তাহা তাহাদের কাছে কিজন্য প্রয়োজন তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝিবে এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইবে। তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলেই আজ প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রচলন হইয়াছে।

বিষয়ের উপর পূর্ণ অধিকার কিরূপে হয়

কেহ তাহার অভিনয়ের 'পার্ট' মুখস্থ করিয়া সবে একবার নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল বা শিবাজীর ইতিহাস সবে আয়ত্ত করিয়াছে বা নূতন শেখা গানের সুর বা তাল সতর্কভাবে থাকিয়া একবার ঠিক রাখিল বা মাছের কালিয়ার রন্ধন প্রণালী শিখিয়া সবে একবার ঠিকমত রাঁধিতে পারিল—তাহার শেখার এই অবস্থায় সে যদি পুনরভ্যাস ছাড়িয়া দেয় তবে এইসব বিষয় সে দ্রুত ভুলিতে থাকিবে। সবে একবার ঠিকমত আবৃত্তি বা স্মরণ করিতে পারিলেই কোন বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায় না। সবে শেখা জিনিষ কাঁচা থাকে। এই শেখার উপরও সেই বিষয়ে বারবার দস্তুর মত শিখিতে ও পুনরভ্যাস করিতে থাকিলে তবে সেই শিক্ষা স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং

একবার পারিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে চলিবে না। একই জিনিস অনেকবার অনুশীলন করিয়া তাহাকে করতলগত করিতে হইবে। প্রথম সঠিক শিক্ষার পরও শিখিবার কাজ চালাইয়া গেলে শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুর তথ্য ও ভাবগুলি পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।

কথায় আছে 'অধিকন্তু ন দোষায়', যাহা সবে সঠিকভাবে শেখা হইয়াছে তাহার উপর পূর্ণ অধিকার পাওয়ার জন্য যদি আরও কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করা হয় তাহা হইলে দেখা গিয়াছে ভুলিয়া যাওয়া যে পরিমাণে রোধ হয় তাহাতে ঐ সময় ব্যয় খুবই সদ্ব্যয় বলিয়া গণ্য করা উচিত। ইংরাজি শব্দ, একটি কবিতা বা কয়েকটি তথ্য শিখিতে যদি আধ ঘণ্টা সময় লাগে তাহা হইলে একঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের বার বার করিয়া শিখিলে খুব উপকার হয়। এরূপ সাময়িক ব্যাপার ছাড়াও কোন বিদ্যার ক্ষেত্র সম্বন্ধেও একথা খাটে। কেহ যদি মনোবিদ্যায় এম. এ. পাস করিয়া ২০ বৎসর ধরিয়া তাহার আর কোন চর্চা না করে তাহা হইলে এম, এ, পাস করিবার সময় তাহার মনোবিদ্যার জ্ঞান যতই থাকুক না কেন ২০ বৎসর পর মনোবিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি সাধারণ ধারণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু পাস করিবার পরও যদি সে চর্চা রাখিয়া দেয় এবং যাহা সে তাহার কোর্সে পড়িয়াছিল তাহা বার বার পড়ে তাহা হইলে বিষয়টি স্মৃতিতে গাঁথিয়া যায় এবং এইভাবে চলিলে ইহার স্মৃতি জীবনভোর থাকে। শেখা জিনিষকে আরও শেখাই তাহাকে স্মৃতিতে অক্ষয় করিয়া রাখিবার উপায়।

এই প্রসঙ্গে পুনরালোচনা ও অভ্যাস কি রীতিতে করিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় তাহা জানিয়া রাখা দরকার। একথা মানিয়া লওয়াই ভাল যে, যে সমস্ত তথ্য, ব্যক্তি ও স্থানের নাম, ঘটনা ইত্যাদি শেখা হয় তাহার অনেক কিছুই আমরা ভুলিয়া যাই। জন্মের পর হইতে মানুষ যাহা কিছু শিখিয়াছে সবই স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় আছে বলিয়া জানা নাই। কাহারও কাহারও স্মৃতি শক্তি অন্যদের চেয়ে বেশী থাকিতে পারে বটে কিন্তু সকলেই জীবনের অনেক কথাই ভুলিয়া যায়—একথা অনস্বীকার্য। কেহই এমন স্মৃতিধর

নয় যে জন্মাবধি যাহা শিখিয়াছেন সবই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। যে বিদ্যা আমাদের প্রয়োজনে আসে না সেদিকে আমরা মনোযোগ দিই না এবং সে বিদ্যার অনুশীলনও করি না, ফলে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু যদি অতীতে শেখা কোন বিদ্যার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহা আবার আমরা পুনরায় শিখিবার চেষ্টা করি এবং দ্বিতীয়বারের শেখা প্রথমবারের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।

অঙ্ক কষিবার কৌশল, নানা প্রকারের কবিতা, সংস্কৃত শ্লোক, বিখ্যাত লেখকদিগের উদ্ধৃতি, নানা পেশাগত শব্দ, সাহিত্যিক শব্দ, মাতৃভাষা ও বিদেশী ভাষা, ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ঘটনা—এই ধরণের বিষয় আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি ও স্মরণ রাখিতে চাই। যখন একবার কোন বিষয় অর্থবোধের সহিত শেখা হইয়া যায় তখন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনরালোচনা ও অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে স্মৃতিতে জীয়াইয়া রাখিতে পারা যায়। একটি বিষয় শিখিবার পর অল্প কিছুকাল পরেই তাহার পুনর্বীক্ষণ (review) হওয়া প্রয়োজন। কোন বিষয় শিখিবার পর তাহার পরের দিনেই উহার পুনর্বীক্ষণ হইলে ভাল হয়। প্রথম পুনর্বীক্ষণের পর পরবর্তী পুনর্বীক্ষণগুলি ক্রমশঃ বেশী সময়ের ব্যবধানে করা যাইতে পারে। শেখার পর প্রথম পুনর্বীক্ষণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইবে প্রথম পুনর্বীক্ষণ হইতে দ্বিতীয় পুনর্বীক্ষণ তাহার দ্বিগুণ সময়, তৃতীয় আবার দ্বিতীয়র দ্বিগুণ সময় এইভাবে পরবর্তী পুনর্বীক্ষণের সময়ের ব্যবধান বাড়াইয়া দিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। সময়ের ব্যবধান যদি খুব বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থী এত বেশী জিনিষ ভুলিয়া যায় যে তাহাকে আবার পূর্ব অধীত বিষয়কে নূতন করিয়া পুনরায় শিখিতে হয়। সুতরাং সময়ের ব্যবধান এমন রাখিতে হইবে যাহাতে না আবার দ্বিতীয়বার শিখিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সময়ের ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়াইয়া যাইলে শিক্ষার্থীর পরিশ্রমের দিক থেকে সাশ্রয় হয়। একই জিনিষ একটানা অনেকক্ষণ না শিখিয়া ঐ সময়কে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করিয়া লওয়া যায় এবং কিছু সময় অন্তর অন্তর অনুশীলন বা অভ্যাস করা যায়; তাহাতে বিষয়টি পাকাপাকিভাবে বসিবার

সময় পায়। তবে অভ্যাসের সময়কে যথারীতি পূর্ব পদ্ধতি মত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভাগ করিতে হইবে, তাহা না হইলে দীর্ঘ সময় চলিয়া গেলে শেখা জিনিস শিক্ষার্থী ভুলিয়া যায়। অভ্যাসের মাঝে মাঝে সময় দিবার প্রয়োজন এইজন্য হয় যে অধীত বিষয় স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইতে সময় পায় (Consolidation)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী তাত্ত্বিক বিষয় বস্তুকে নিছক বিষয় বস্তু হিসাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের শেখান হয় এবং সেই বিষয়েরই পুনরালোচনা বা পুনরভ্যাস করা হয়। যেমন নূতন শব্দের একটি তালিকা বা সংস্কৃতের শব্দরূপ বা ধাতুরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়া মুখস্থ করাইয়া লওয়া হয় এবং পরে আবার তাহার পুনরভ্যাস করান হয়। ইহাতে বিষয়ের ধৃতি বাড়ে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইতেছে যে শিক্ষার্থীর চাহিদা বা জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় এইরূপ পাঠ ও পুনরভ্যাস অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে না এবং সেইজন্য শিক্ষার্থীর সত্তার সহিত একাত্ম হইয়া চিরস্থায়ী হয় না। সব সময়ই তাহা যেন বাহিরের জিনিস হইয়া থাকে।

কিন্তু বেশীর ভাগ জিনিসইত ছেলেমেয়েরা প্রসঙ্গক্রমে শেখে। জীবনের নানা কাজকর্ম ও প্রয়োজনের প্রসঙ্গে যে জিনিস আসিয়া পড়ে তাহার অর্থ থাকে, প্রাণ থাকে। শব্দজ্ঞান বাড়াইবার জন্য পূর্বপরিকল্পিত কৃত্রিম উপায়ের কোন প্রয়োজন হয় না। ছেলেমেয়েরা নানা শব্দ অন্যদের মুখে শোনে, সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায় ও পুস্তকে নানা শব্দের সহিত পরিচিত হয়। অভিধান দেখিয়া নূতন শব্দের মানে বাহির করে অথবা যে জানে এমন লোকের কাছে মানে জানিয়া লয়। এইসব নূতন শব্দ অর্থপূর্ণ বাক্যের মধ্যে থাকে সেইজন্য তাহাদের মানের জ্ঞান তৎসংলগ্ন হইয়া তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠে। একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং শিক্ষা হয় ক্রিয়াশীল ও জীবনধর্মী। নানাভাবে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার কিভাবে হয় তাহা শুনিয়া ও পড়িয়া জানিতে হয় তবেই তাহাদের ধৃতি হয় চিরস্থায়ী। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রমই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলা হয়। প্রার্থনা সভায়

সংবাদ পড়া হয়। ছাত্র পরিষদের মন্ত্রীরা তাহাদের কাজের বিবরণী লিখিয়া পরিষদের সভায় পাঠ করে, আবহাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ের বুলেটিন পড়ে, আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা এবং বিচিত্র অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাহারা নানা শব্দ শেখে এবং চিন্তা ও ভাবনাকে আহরিত ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া শব্দ ও ভাষা হইয়া উঠে অর্থপূর্ণ ও সার্থক।

চিঠি বা রচনা লিখিবার বিধি এবং শৈলী সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অভ্যাস করাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্য শিক্ষার্থীকে তাহা স্মরণ রাখিতে সাহায্য করা হয়। কিন্তু এই চিঠি ও রচনা লিখিবার কোন আন্তরিক তাগিদ বা প্রেরণা শিক্ষার্থীর থাকে না। কারণ এইসব চিঠি ও রচনা সবই বানানো, তাহার জীবনের সহিত কোন যোগ নাই। কিন্তু প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজ, প্রকল্প, ভ্রমণ, বা উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যকার লোকেদের নিকট প্রয়োজনের জন্য বা সৌজন্যের জন্য চিঠি লিখিতে হয়, কাহিনী, বৃত্তান্ত, বিবরণী বা রচনা সত্যকার ঘটনা বা অভিজ্ঞতা লইয়াই রচিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এইসব কাজ করে এবং যেহেতু চিঠি এবং রচনা অন্যরা শুনিবে ও পড়িবে, সেজন্য সেগুলি যাহাতে সুরুচিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীরা বোঝে যে এইসব লেখার সামাজিক মূল্য আছে, শুধু শেখার জন্য শেখে নয়—ইহা জীবনের প্রয়োজন মেটায়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের নিজেদের লেখা লইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে পারে এবং শিক্ষক যাহার যেটি ভাল তাহা দেখাইয়া দিবেন এবং আরও কি করিলে উন্নতি করা যায় তাহারও নির্দেশ দিবেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাহারা সানন্দে ও সাগ্রহে শিক্ষকের নির্দেশ মানিয়া লইবে, কারণ তাহাদের লেখা যাহাতে আরও ভাল হয় তাহাই যে তাহারা চায়। এইভাবে সত্যকার লেখা লিখিতে লিখিতে লিখিবার নিয়ম ও শৈলীও জানা হইয়া যায়। শুধু শুদ্ধভাবে মুখস্থ না করিয়া এইভাবে অভ্যাস অনুশীলনের পথে যাহা শেখা হয় তাহার ধৃতি স্থায়ী

হয় ও পুনস্মরণ অনায়াস হয়। কৃত্রিম উপায় অপেক্ষা সত্যকার জীবনে যাহা শেখা যায় তাহা জীবনের অনেক বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে বলিয়া নানা সূত্রে তাহা স্মরণ করা সহজ হয়।

অবশ্য যাহা কিছু আমরা শিখি সব জিনিসেরই নিয়মিত পুনর্বীক্ষণ চালান অসম্ভব। কারণ বৎসরের পর বৎসর আমরা ক্রমাগত নূতন বিষয় শিখিতেছি এবং সব জিনিসের পুনর্বীক্ষণ করিতে গেলে এমন এক সময় আসিবে যখন সব সময়টাই পুনর্বীক্ষণের কাজে লাগাইতে হইবে, নূতন জিনিষ শিখিবার আর সময় থাকিবে না। কোন বিশেষ বিদ্যার অধ্যয়নে যদি লাগিয়া থাকা যায় তাহা হইলে অর্জিত সামর্থ্য ও যোগ্যতা আপনিই বজায় থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন যোগ্যতাও অর্জিত হইতে থাকে। বিদ্যার ক্ষেত্রে নানা বিষয় এক অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেইজন্য কোন এক বিষয় অন্য অন্য বিষয়ের অধ্যয়নকালে প্রসঙ্গক্রমে আপনিই পুনরালোচিত ও পুর্নব্যাখ্যাত হইয়া যায়।

স্মৃতিশক্তি কি বাড়ান যায়?

শৈশবে ও প্রথম যৌবনে শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি বাড়িতে থাকে। স্মৃতি মানসিক শক্তিরই একটি দিক। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির মত স্মৃতিশক্তিরও বিকাশের একটি সীমা আছে। তবে বুদ্ধির মত স্মৃতিকেও কাজে লাগাইবার প্রকৃষ্টতর প্রণালী থাকিতে পারে যদ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। নাম, তথ্য, ঘটনা ইত্যাদি অনেক জিনিসই আমরা স্মরণ রাখিতে ইচ্ছা করি এবং ইচ্ছানুরূপ স্মরণ রাখিতে পারি না বলিয়া ক্ষুব্ধ হই। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীকে বহু জিনিষ মনে রাখিতে হয় এবং কি করিলে স্মৃতিশক্তিকে বাড়ান যায় তাহা জানিতে উৎসুক থাকে।

স্মৃতি ভাল করিতে হইলে যে জিনিস শিখিতে হইবে তাহার উপর ভাল করিয়া অধিকার স্থাপন করিতে হইবে। যে জিনিস স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে তাহা যেন বেশ স্পষ্টভাবে ও উপলব্ধির সহিত মনে গৃহীত

হয়। ক্রমাগত বিদ্যার্জন এবং তাহা রক্ষা করিবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই স্মৃতির উত্তম অনুশীলন হয়।

সেইজন্য প্রথমে জানিতে হইবে কিভাবে বিদ্যা বা কোন জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে যাহার স্মৃতিকে আমরা দীর্ঘস্থায়ী রিয়া রাখিতে চাই।

প্রথমতঃ শিখিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকা চাই। আগ্রহ ও প্রেষণা থাকিলে মন শিখিবার জন্য উন্মুখ হয়।

যাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে তাহাতে গভীর মনোযোগ দিতে হইবে। অবশ্য আগ্রহ থাকিলে মনঃসংযোগ স্বাভাবিকভাবেই হয়।

স্মরণীয় বিষয়ের উপলব্ধি স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে হওয়া দরকার। বিষয়ের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। মনোযোগ দিলে সাধারণতঃ বিষয়ও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

যাহা বুঝা যাইতেছে না তাহা প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

এইভাবে কোন বিষয় পূর্ণ-উপলব্ধির সহিত শিখিবার পর তাহাকে স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং ভুলিয়া যাওয়া যতদূর সম্ভব নিবারণ করিতে হইবে।

ইহা করিতে হইলে প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে শেখা বিষয়ের পুনরভ্যাস করিতে হইবে।

বিষয়ের স্মৃতিকে জাগরূক রাখিবার জন্য সে বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে এবং সুযোগ পাইলে সেই প্রসঙ্গে মৌখিক কথাবার্তা বা আলোচনা করিতে হইবে।

পূর্বে যাহা শেষ হইয়াছে তাহার সহিত নূতন শিক্ষাকে সম্ভব স্থলে সম্বন্ধিত করিতে হইবে।

বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট অংশে মনে না রাখিয়া সামগ্রিকভাবে মনে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনা

মানুষের কাছে চিন্তা করিতে পারা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চিন্তা করিতে পারে না এমন মানুষ নাই। জন্তুরা কি চিন্তা করিতে পারে? ইহার উত্তরে সোজাসুজি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলা যায় না। সকলেই বিশ্বাস করেন যে মানুষ চিন্তা করিতে পারে বলিয়াই সে এত উন্নত, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হইতে পারিয়াছে। চিন্তা যে একটি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা স্থূল বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে যে একেবারে স্বতন্ত্র—অতি সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া ইহা ভাবা ভুল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই চিন্তার মালমসলা আসে।

চিন্তা প্রত্যক্ষর (perception) উপর নির্ভরশীল। যাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত বেশী তাহার চিন্তার খোরাকও তত বেশী। বাহিরের বস্তুর জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়দ্বার পথেই পাইয়া থাকি। চোখ দিয়া দেখি, কাণ দিয়া শুনি, নাক দিয়া আঘ্রাণ লই, জিব দিয়া আস্বাদ গ্রহণ করি ও ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভূতি পাই। অবশ্য এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আমরা আমাদের দেহের বাহিরের ও ভিতরের জ্ঞান পাইয়া থাকি। চামড়ায় এমন ইন্দ্রিয়-স্থান আছে যাহাদের সাহায্যে আমরা ঠাণ্ডা ও গরমের অনুভূতি পাই। চামড়ার তলায় ইন্দ্রিয়-স্থানের সাহায্যে চাপের অনুভূতি পাই। কণ্ডরার (দুইটি হাড়ের সংযোজক তন্তু) মধ্যে যে ইন্দ্রিয়স্থান আছে তাহাতে আমরা আমাদের অঙ্গ-সংস্থান বুঝিতে পারি। একটা জিনিস মাটি থেকে লইতে গেলে কতটা ঝুঁকিতে হইবে, কোন ফাঁকের মধ্য দিয়া দেহকে কতটা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এগুলির অনুভব আমরা এইসকল ইন্দ্রিয়স্থানের সাহায্যে পাই। ইহাদিগকে চেষ্টা বেদন অনুভূতি বলা হয়। ইহা ছাড়া দেহের অভ্যন্তরে লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী ইত্যাদি দেহাঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়স্থান আছে তাহা হইতে আমরা সুস্থতা বা অসুস্থতার অনুভূতি পাই।

ইন্দ্রিয়-স্থান হইতে যে অনুভূতিগুলি আমরা পাই সেগুলিকে সংবেদন (Sensation) বলা হয়। অবশ্য সংবেদনকে ঐরূপেই আমরা বুঝিতে পারি না। সদ্যজাত শিশুর চোখের সামনে যে মার মুখ সে দেখে তাহার মানে সে তখন বোঝে না ; কিন্তু যখন এই মুখ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাতৃস্তন্য পান করে, উষ্ণ কোমল কোলে শুইয়া আরাম অনুভব করে, মলমূত্র ত্যাগের অস্বস্তিকর সংস্রব থেকে মুক্ত হইতে পারে তখন এই সমস্ত অনুভূতি মায়ের মুখদর্শনের সহিত জড়িত হইয়া গিয়া তাহাকে করে অর্থপূর্ণ এবং সে বুঝে মা তাহার জীবনে অপরিহার্য। তাই ত সে এখন মায়ের মুখ দেখিলে হাসে, তাহার কচি কচি হাত দুটি বাড়াইয়া দেয়, মায়ের অনুপস্থিতি পছন্দ করে না। পরে যখন সে অন্য মানুষকে দেখে তখন তাহার মার চেহারার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাহাকে মায়েরই সমজাতীয় বলিয়া চিনাইয়া দেয়।

সেইজন্য সংবেদনকে ঐ আকারেই আমরা পাই না। সংবেদনাগুলি অর্থপূর্ণ হইয়া আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। গাছকে গাছ বলিয়া দেখি, একটি লম্বা জিনিস ছোট ছোট গোল বস্তু ধারণ করিয়া আছে এভাবে দেখি না। মাংস রান্নার গন্ধকে মাংস রান্না হইতেছে বলিয়াই বুঝি। নাসিকা ঝিল্লির উপর ইহার অর্থনিরপেক্ষ কি প্রভাব পড়িতেছে তাহা অনুভব করি না। সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলে পূর্ব অভিজ্ঞতা যাহা মনে থাকে প্রতিরূপ (image) রূপে। যখন গাছ দেখি তখন ঐ বস্তুর যে নাম কাণে শুনা হইয়াছে অর্থাৎ গাছ এবং সম্ভবতঃ যে প্রকার গাছ যেমন আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি সেই পূর্ব শ্রুত নামের প্রতিরূপ বৃক্ষদর্শনের সহিত উদয় হইবে। এইভাবে গাছের কাণ্ডের ও পত্রের স্পর্শ, গাছের ফলের স্বাদ ও গাছের ফুল ফলের গন্ধের প্রতিরূপগুলি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে উপস্থিত হইবে। তাহা ছাড়া গাছ সম্বন্ধে যদি কোন প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বিক্ষোভ পূর্বে উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও প্রতিরূপ মনে জাগিবে। অর্থাৎ বৃক্ষের সহিত জড়িত সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি বৃক্ষদর্শনের সহিত অখণ্ডভাবে জাগিয়া উঠিয়া বৃক্ষ-দর্শনকে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ইহাকেই প্রত্যক্ষ (perception) বলা

হয়। আমরা প্রত্যক্ষই উপলব্ধি করিতে পারি। সংবেদন প্রত্যক্ষের বিশ্লেষিত উপাদান যাহা ঐ আকারে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সাধারণতঃ আসে না। গাছ দেখা এইরূপ অর্থপূর্ণ হইলে যে কোন অপরিচিত গাছ পৃথিবীর যে কোন স্থানে দেখিলেই তাহা অন্ততঃ গাছ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। নূতন জিনিসের নূতনত্বের সহিত তাহার একটি চেনা দিকও থাকে যাহার দ্বারা তাহাকে বোঝা যায়। একতলা দু'তলা বাড়ীতে যাহারা বাস করিয়াছে তাহারা নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী প্রাসাদ দেখিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে পারে কিন্তু ইহাও যে গৃহেরই এক বিশাল মূর্তি তাহা বুঝিতে পারিবে।

এখানে আর একটি জিনিস ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বাহিরের যে বস্তু সংবেদনরূপে মনে আসিল তাহা কিন্তু বাহিরের বস্তু নয়—তাহার মানসমূর্তি। এই মানসমূর্তিকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলাকে প্রাথমিক স্তরের বা প্রত্যক্ষমূলক চিন্তনের কাজ বলা যাইতে পারে। শৈশবে যখন শিশু নূতন নূতন জিনিসের সহিত পরিচিত হইতে থাকে তখন এই ধরণের প্রত্যক্ষ ভিত্তিক চিন্তনের কাজই সে বেশী করে।

প্রত্যক্ষর ফলে বাহিরের বস্তুর যে মূর্তি মনের মধ্যে উপলব্ধ হয় তাহা বাহিরের বস্তুর সোজাসুজি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ছাড়াও প্রতিরূপ রূপে মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। তুবড়ির আলোকের ঝরণা দেখিতে দেখিতে চোখ বুজিয়াও তাহার প্রতিরূপ আমরা দেখিতে পাই। অনেক বৎসর পূর্বেকার দেখা তাজমহলকে স্মরণ করিলে তাহার প্রতিরূপ আমাদের মনে তাহার মহিমা বিস্তার করিয়া জাগিয়া উঠে। অবশ্য চোখের সামনে তাজমহলকে দেখিলে তাহাকে যেরূপ দেখায় তাহার প্রতিরূপের মধ্যে সে স্পষ্টতা ও বাস্তবতা থাকে না। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার যে প্রতিরূপগুলি আমরা স্মরণ করি এবং প্রত্যক্ষর ফলেই প্রতিরূপের জন্ম হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এমন কি প্রত্যক্ষর উপাদান না পাইলে স্মরণ কার্যের কোন প্রয়োজনই হইত না।

এই প্রতিরূপগুলিই চিন্তা বা কল্পনার মালমশলা। বাহিরের বস্তুর অনুপস্থিতিতেও চিন্তা ও কল্পনারূপ মানস কার্য চলিতে থাকে। পূর্বে যে প্রত্যক্ষ ভিত্তিক চিন্তনের কথা বলা হইয়াছে ইহা ছাড়া অন্য সব রকমের চিন্তনকেই কল্পনার অন্তর্গত করা যায় কেননা এই প্রকারের চিন্তনে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয় না শুধু প্রতিরূপ লইয়াই চিন্তন চলিতে থাকে। পশুপক্ষীদের ভিতর প্রত্যক্ষভিত্তিক চিন্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় কেননা তাহাদের আচরণ হইতে বোঝা যায় কোন বস্তুর কি অর্থ তাহা তাহারা বুঝিতে পারে কিন্তু বাহিরের বস্তুর প্রতিরূপ লইয়া তাহারা চিন্তন বা কল্পন করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শিম্পাঞ্জীর মত বানর জাতীয় উচ্চশ্রেণীর জীবদের মধ্যে এই শক্তির কিছু উন্মেষ দেখা যায়। দু'টি কাঠি জোড়া দিয়া কলাটিকে খাঁচার মধ্যে টানিয়া আনিবার প্রতিরূপটি বোধহয় কোয়েহলারের সুলতান নামক শিম্পাঞ্জীটির মনে উদয় হইয়াছিল যাহাকে তিনি অন্তদৃষ্টির ঝলক বলিয়াছেন। যাহাই হউক আমরা এখন প্রত্যক্ষ, স্মরণ, চিন্তন ও কল্পনের মূলগত সম্বন্ধটি জানিলাম।

প্রত্যক্ষর পর তাহার যথাযথ যে প্রতিরূপটি মনে থাকিয়া যায় তাহাকে মৌলিক স্মৃতি প্রতিরূপ (primary memory image) বলা হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই এই স্মৃতি প্রতিরূপ ঘটিতে পারে। গোলাপ ফুল দেখিয়া চোখ বুজিলে গোলাপের চাক্ষুষ প্রতিরূপ (visual image) আমরা দেখি। সেই-ভাবে গোলাপের সুগন্ধের প্রতিরূপও পরে আমরা উপভোগ করিতে পারি। তাহার কোমল পাঁপড়ির স্পর্শের প্রতিরূপও ইচ্ছা করিলে পাইতে পারি। সেইরূপ পূর্বশ্রুত গানের সুরের প্রতিরূপ আমরা শুনিতে পাই। সেইরূপ ল্যাংড়া আমের সুস্বাদের প্রতিরূপ, গরম ও যন্ত্রনা অনুভূতির প্রতিরূপ, ক্ষুধা, অসুস্থতা ও সুস্থতাবোধের প্রতিরূপ, খেলার সময় অঙ্গ সঞ্চালনের সুখের প্রতিরূপ—এ সমস্ত প্রকারের প্রতিরূপই ঘটিয়া থকে ; তবে সকলের ভিতর সমানভাবে সমস্ত রকমের প্রতিরূপগুলি উপলব্ধ হয় না, ব্যক্তি বিশেষে এক একটি প্রতিরূপের প্রাধান্য বেশী থাকে। মানুষ চোখ ও কানের ব্যবহারই বেশী করে ; সেইজন্য

চাক্ষুষ ও শ্রাব্য প্রতিরূপগুলিরই প্রাধান্য বেশী থাকে। বেশীর ভাগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিরূপগুলিই বেশী দেখে।

যখন আমরা কোন প্রতিরূপ অনুভব করিতে চাই তখন আসল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় শরীর মনের যেরূপ স্থিতি ছিল সেইরূপ অবস্থায় আসিয়া প্রতিরূপ পাইবার সংকেতের (cue) অনুসন্ধান করি। স্পষ্ট চাক্ষুষ প্রতিরূপ পাইবার চেষ্টায় চোখের মাংসপেশীগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, স্বাদের প্রতিরূপ পাইবার চেষ্টায় মুখ লালাসিক্ত হইয়া উঠে এবং চেষ্ট বেদনের প্রতিরূপ পাইবার চেষ্টায় দেহ উন্মুখ হইয়া উঠে। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে শরীরের ক্রিয়ার ফলেই প্রতিরূপ সংঘটিত হয়। বাহিরের বস্তুর পরিবর্তে যে জিনিস আমরা মনে পাই তাহাই প্রতিরূপ—তবে বাহিরের বস্তুর মতন তাহার ঐ পরিমাণ বাস্তবতা, স্পষ্টতা, স্থিরতা ও সবিশেষতা থাকে না।

বাহিরের বস্তুর যে মানসিক প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ আমাদের স্মৃতিতে থাকে চিন্তন কার্যের সেইগুলিই মৌলিক উপাদান। তবে মানুষের এই চিন্তন এই বিশেষ বিশেষ প্রতিরূপের সাহায্যে চলিতে পারে না। মানুষের চিন্তনে একটি সাধারণ বা সার্বজনীন ভাব থাকে যাহা বিশেষ প্রতিরূপগুলিকে অবলম্বন করিয়া ঘটিলেও তাহাদের বিশেষতাকে অতিক্রম করিয়া যায়। আমরা যখন মানুষের কথা চিন্তা করি তখন কোন বিশেষ মানুষের প্রতিরূপ আমাদের মনে জাগে না। যত রকমের বিশেষ মানুষ আমরা জানি তাহার প্রতিভূ হিসাবে এক নির্বিশেষ মানুষের প্রতিরূপ আমাদের মনের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এই নির্বিশেষ মানুষের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণভাবে আছে, যেমন হাত, পা, মাথা, বুক ইত্যাদি।

বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে তাহাদের সাধারণ গুণগুলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পুনরায় সেগুলিকে সংশ্লেষিত করিয়া তাহাদের একটি নির্বিশেষ প্রতিরূপ গড়িয়া তোলা উন্নত চিন্তনের কার্য। ইয়ুং (Jung) এর মত মনোবিদরা বিশ্বাস করেন যে মানুষ জানিতে পারা বা বুঝিতে পারার সহজাত

স্বভাব (cognitive disposition) লইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং প্রথম হইতেই তাহার জাগতিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ, বা ব্যাখ্যা করিতে পারে এই মতে মানুষের চিন্তনের এই শক্তি যে তাহার জীবনকালের মধ্যেই অর্জিত হয় তাহা নয়—পূর্ব পুরুষ এমন কি মানুষের সুদূর পূর্বপুরুষ বানর জাতীয় (Ape) জীবদের হইতে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানের ও কালের (space & time) বোধ এইভাবে মনুষ্য স্বভাবেই নিহিত থাকে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

যাহাই হউক মানুষের মনে একজাতীয় বস্তুসমূহের একটি সাধারণ ধারণা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে। এই সাধারণ ধারণা নির্বিশেষ হইলেও প্রত্যক্ষের বিশেষত্বের বৈচিত্রও ইহার মধ্যে অন্তর্লীন থাকে। 'মানুষ' এই সাধারণ ধারণার মধ্যে যে শুধু হাত-পা, মুখ-চোক, নাক ইত্যাদি সমন্বিত মূর্তির প্রতিরূপ থাকে তাহা নহে। জাপানী, ইংরাজ, ফরাসী, ভারতীয় লোক ও তাহাদের বর্ণ, চেহারার বৈশিষ্ট্য এমন কি সাজ-পোষকও এই সাধারণ ধারণার মধ্যে থাকে বৈকি। তবে এইগুলি স্পষ্টভাবে চেতনায় প্রতিভাত নাও হইতে পারে, চেতনার পশ্চাদপটে তাহারা মিলাইয়া থাকে এবং মানুষ ইচ্ছা করিলে সাধারণ ধারণার যে কোন বৈশিষ্ট্যকে তাহার কল্পনার মধ্যে আনিতে পারে।

ধারণার (concept) সমৃদ্ধি ও ব্যাপকতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। এক বস্তু ও অন্য বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেটি বিশ্লেষিত করিয়া যে সমানীকরণ (generalization) করিবার শক্তি সকলের সমান থাকে না। চন্দ্র ও মুখের সৌন্দর্যের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে তাহা কবি প্রকৃতি কেবল উপলব্ধি করিতে পারে। সাধাবণ লোক চাঁদকে চাঁদ হিসাবেই দেখে আর মুখকে মুখ হিসাবেই দেখে। তাহাদের মিলাইয়া একটি সাধারণ ধারণা গঠন করিতে পারে না। অবশ্য চন্দ্রমুখ শুনিতে শুনিতে আমরা অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু—

বক্র জীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মত। —রবীন্দ্রনাথ

শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যান মগ্ন মহা শান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। —রবীন্দ্রনাথ

এইরূপ ধারণার সৃজন কবি-চিত্তে হওয়াই সম্ভব অবশ্য এই ধরনের চিন্তনই কল্পনের মধ্যে পড়ে, যাহার সম্বন্ধে আমরা শীঘ্রই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যাহা হউক বস্তসমূহের খণ্ড খণ্ড বিশেষত্ব হইতে নির্বিশেষত্বে আসা উচ্চতর চিন্তনের কাজ। এই কাজ যে ঠিক কিভাবে সাধিত হয় সে বিষয়ে মত বিরোধ আছে, তবে প্রধানতঃ সংশ্লেষন ও বিশ্লেষণের দ্বারাই একটি সাধারণ ধারণায় মানুষ পৌছায় এবং সম্ভবতঃ তাহার সহজাত জ্ঞানধর্মী স্বভাবও (Cognitive disposition) তাহাকে এই কার্যে অজ্ঞাতে সাহায্য করে। শিক্ষকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গভীরতর দার্শনিক তত্ত্বে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

একথা বলা হইয়াছে যে প্রতিরূপগুলি লইয়া তাহাদের নানারূপ বিন্যাস ও সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তনের কাজ চলে। কিন্তু চিন্তার দ্রুততা, জটিলা, সূক্ষ্মতা এবং আদান-প্রদান যোগ্যতা এতদূর উন্নত হইতে পারিত না যদি না ভাষার উৎপত্তি হইত। প্রতিরূপগুলির নাম বা চিহ্ন হইতেছে ভাষা। পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে আধুনিক বর্ণমালার বর্ণগুলি পূর্বে এক একটি জিনিসের চিত্র ছিল এবং পর পর চিত্র সাজাইয়া প্রাচীনকালের লোক মনের ভাব ব্যক্ত করিত। ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মন এখনও এই প্রাচীন পন্থাতেই চিন্তা করে এবং স্বপ্ন হইতেছে নির্জ্ঞানের চিন্তা। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া নির্জ্ঞান কি জানাইতে চায় তাহা বুঝিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাহাই হউক চিত্রদ্বারা বা দৈহিক সংকেতের দ্বারা চিন্তা করিলে তাহা খুব সূক্ষ্ম ও সাবলীল হইতে পারে না এবং ইহার প্রকাশ ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ থাকে, কেননা ইহাতে স্থূল মূর্তির চিহ্নকে অবলম্বন করিয়া চিন্তন কার্য চলে। কিন্তু ভাষাকে অবলম্বন করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বিমূর্ত হইয়া যায়, তখন ইহা স্থূলত্ব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে।

অবশ্য মানুষের ভাষা টেলিগ্রাফের মর্সকোড বা সর্টহ্যাণ্ডের লিপির মত অতটা কৃত্রিম নয়, কেননা মানুষের জীবনাচরণ ও নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ চেষ্টার মধ্য দিয়াই ভাষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। অনেক সময় বাহিরের বস্তু বা কার্যের যে শব্দ উত্থিত হয় তাহারই অনুকরণ ভাষায় হয়, যেমন নানারকম পশু পক্ষীর ডাক, 'ঘেউ ঘেউ' 'প্যাক প্যাক' অথবা জলের যেমন আওয়াজ হয় 'ঝর ঝর' 'ঝপাং ঝপাং'। কতকগুলি কথা আছে যাহার ধ্বনির মধ্যে ঐ কথাটি যাহা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহা অভিব্যক্ত হয়, যেমন 'থর থর'—ইহাতে কাঁপিবার ভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, আবার 'ঝাঁ ঝাঁ'—ইহাতে রৌদ্রের তীব্রতা প্রকাশ পায়। 'হুমড়ি খাওয়া' ও 'গড়াইয়া যাওয়া' এই শ্রেণীরই উদাহরণ। এইগুলি শব্দের নকল নয় কিন্তু কার্যের যে অনুভূতি মনে জাগায় তাহারই যেনঅলঙ্কারসূচক শব্দ। আবার কতকগুলি কথা আছে যাহাতে কোমলতা ও নমনীয়তা প্রকাশ পায়, যেমন 'লাবণ্য', 'ললিতা', 'মা', 'লতা', ইত্যাদি। ল, ম, ব—এই ধরণের কোমল বর্ণ দিয়া যে শব্দগুলি যেগুলির উচ্চারণে কোনরূপ রূঢ়তা প্রকাশ পায় না সেগুলি কোমলভাব প্রকাশ করে।

প্রাচীন কালে সমস্ত দেহের ইঙ্গিতে অনেক মনের ভাব প্রকাশ পাইত। এমন অনেক কথা আছে যেগুলি এইরূপ স্থূল দৈহিক ইঙ্গিতেরই সূক্ষ্ম ভাষারূপ পাইয়াছে, যেমন 'না' বলিবার সময় আমরা অধরোষ্ঠ বাহিরের দিকে উৎক্ষেপ করি কিন্তু 'হ্যাঁ' বলিবার সময় অধরোষ্ঠকে ভিতরের দিকে টানিয়া লই। প্রথমে হয়ত যাহা কিছু মানুষ চাহিত না তাহা সমস্ত দেহ দিয়াই সরাইয়া দিত এবং যাহা স্বীকার করিয়া লইত তাহা সারা দেহের মধ্যেই

টানিয়া লইত। এইরূপ 'বিশাল', 'ভয়াবহ', 'অনেক'—এই সব কথা বলিবার সময় মুখ বেশী ফাঁক করিতে হয় এবং মনে হয় বড় বড় আঙ্গিক ইঙ্গিতের এগুলি অবশিষ্টাংশ। এখনও কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ইঙ্গিত বা মুদ্রাও প্রদর্শন করিয়া থাকি। 'হ্যাঁ' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টি কাত করিয়া দিলে, 'করিতেই হইবে' বলিয়া টেবিলে মুষ্টাঘাত করিলে, 'কেমন সুন্দর' বলিয়া হাতটি ঘুরাইয়া দিলে যেন মনের ভাবটি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। গান গাহিবার সময়ও সুরুচিপূর্ণ মুদ্রার প্রয়োগে গানের মাধুর্য বাড়িয়া যায়। নৃত্য ত সম্পূর্ণভাবেই মুদ্রা-নির্ভর। যাহা হউক দৈহিক অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিতের সহিত যে ভাষার সম্পর্ক আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এতক্ষণ ধরিয়া এইসব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই প্রতিপন্ন করা যে ভাষা চিন্তার নিছক কৃত্রিম প্রতীক নয়—জীবনাচরণের সহিত বা অর্থপূর্ণ প্রাণময় প্রকাশ ভঙ্গীর সহিত ইহার আকার প্রকার বা ধ্বনিগত সাদৃশ্য বা সঙ্গতি আছে। ভাষার উৎপত্তি হওয়ায় মানুষ বিমূর্ত চিন্তনের অধিকারী হইয়াছে। যেমন কোন বন্ধুকে নির্দেশ করিতে হইলে সে কিরূপ লম্বা, মোটা বা রোগা, কাল বা ফর্সা এবং অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিয়া শুধু তাহার নাম বলিলেই বন্ধুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য লইয়া সামগ্রিক ভাবেই বুঝিয়া থাকি তেমনি সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু ও কার্যকে ভাষা নামাঙ্কিত করে। আসল জিনিস ও তাহার নাম মনের মধ্যে থাকিতে থাকিতে তাহারা এত অভিন্ন হইয়া পড়ে যে শুধু নামও আসল জিনিস বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমাদের নাম আমরা যাহাকে তাহাকে বা যখন তখন বলি না। অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে শিশুরা তাহাদের নাম বলিতে চায় না। নাম যেন বস্তুরূপ বা ব্যক্তিসত্ত্বার স্থান গ্রহণ করে। সেজন্য ভাষা আপাত দৃষ্টিতে কৃত্রিম ঠেকিলেও ইহা যাহা বহুকাল ধরিয়া প্রকাশ করে তাহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়া মনের কাছে তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠে। এইজন্য সৌজন্যপূর্ণ ভাষণ বা কথাবার্তার মধ্যে অনেক অশিষ্ট বা অশ্লীল কথার ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিরক্তিকর অথবা মহান জিনিষেরও নাম আমরা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া উল্লেখ করি।

অনেকের মধ্যে কেহ যদি কোন ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকে তাহা হইলে সে তাহাকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। নামহীনভাবে তাহাকে নির্দেশ করিলে সে অনেকটা উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকা মাত্র সে যেন তাহার প্রভাবে পড়িয়া যায়। নামের উপর অধিকার যেন ব্যক্তির উপরই অধিকার। লেখক অনেক দিন আগে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (এখন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী) বই লইতে গিয়া দেখেন যে অফিসে খুব বেশী ভীড় এবং কর্মচারী খুব ধীরে ধীরে পুস্তক গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। ইত্যবসরে এক ভদ্রলোক আসিয়া "অমুকদা আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।" উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সচেতন হইয়া গেলেন এবং উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া পূর্ব আগত সকলকে উপেক্ষা করিয়া সেই ব্যক্তির বন্দোবস্ত আগে করিয়া দিলেন। এই ব্যক্তি কর্মচারীটির পূর্ব পরিচিত নহেন। তিনি কোনক্রমে কর্মচারীটির নাম সংগ্রহ করিয়াছিল এবং নাম বলিয়া তাঁহাকে বশ করিয়া আপন কার্যোদ্ধার করিলেন। নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য কর্মচারীটি অপেক্ষারত ব্যক্তিদের শুনাইয়া বলিলেন যে ঐ ব্যক্তির নিশ্চয় "বায়ুর রোগ" আছে।

প্রত্যেক শিক্ষকও এ বিষয়ে নিশ্চয় অবহিত আছেন যে শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর নাম না জানিলে তাহাদের উপর সত্যকার অধিকার স্থাপন করা যায় না। সেজন্য শিক্ষকতা বৃত্তিতে নবাগত প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের নাম জানিয়া লওয়া।

সাধারণ ভাষা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিমূর্ত প্রতীকের সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। গণিতে সংখ্যা দ্বারা, রসায়ণ শাস্ত্রে ফরমুলার সাহায্যে, সঙ্গীতে স্বরলিপি ও তাল লিপির সাহায্যে চিন্তন কার্য চলে। এই সবরকম ভাষা ও প্রতীকের সাহায্যে আমাদের ধারণাগুলিকে মনে রাখিয়া দিতে পারি এবং পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারি। সুতরাং চিন্তার বাহন ভাষা বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির প্রতিরূপগুলির ঐ হিসাবেই প্রয়োজন হয় বা তাহাদের যে ভাষার রূপ বা ভাষাগত প্রতিরূপ সেইগুলিই চিন্তনের মালমসলা হয়। তবেভাষার একটি অসুবিধা এই যে আমরা এখন কোন জিনিসকে একটি নাম

দিয়া মনে করি তাহাকে বুঝিয়া লইলাম। আমরা এখন সব সময় নামের আশ্রয় খুঁজি। সেইজন্য অনেক সময় সত্যবস্তুকে পাইতে হইলে তাহার নাম বা উপাধিকে বাদ দিয়া তাহার সত্যস্বরূপকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। ভারতীয় যোগদর্শনবেত্তরা বলেন, নামের মায়াজালে পড়িয়া আমরা সত্যকে হারাইয়াছি এবং সেইজন্য বস্তুর নাম উপাধিকে ত্যাগ করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপকে বুঝিতে হইবে। তা'ছাড়া সমস্ত জ্ঞান বা অনুভূতিকে এখনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক এ পর্যন্ত আমরা চিন্তার মালমশলা—যেমন সংবেদন, প্রতিরূপ এবং সার্বজনীন ধারণা এইগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছি। এই সকল মালমশলা লইয়া চিন্তন-রূপ ক্রিয়াটি কিভাবে সাধিত হয় এবং ইহা বিচার বা যুক্তির রূপ কখন ধরে এবং কখন বা কল্পনার রূপ ধরে তাহা এইবার দেখা যাউক।

দুইটি বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করা চিন্তার কাজ। দিন ও রাত্রির মধ্যে যে বিপরীত সম্বন্ধ আছে, তাহাই চিন্তনের দ্বারা প্রতিভাত হয়। দিন ও রাত্রি দুইটিই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্য কিন্তু এই দুই তথ্যের মধ্য হইতে মূল্যগত সম্বন্ধটি আবিষ্কার করাই চিন্তার কাজ। আবার দুই বা ততোধিক তথ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজ করিতেছে অনুরূপ সম্বন্ধ অন্য তথ্যসমূহের মধ্যে আছে কিনা আবিষ্কার করাও চিন্তনের ক্রিয়া। ঘড়ির সঙ্গে সময়ের যে সম্বন্ধ চিঠির সহিত খবরের সেই সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাদের মূলগত সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধসমূহের ঐক্য ও অনৈক্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণজনিত ক্রিয়াই চিন্তন।

প্রথম প্রকারের প্রক্রিয়ায় আমরা এইভাবে চিন্তা করি যে দিন ও রাত্রি দুইটি প্রাকৃতিক অবস্থা—একটিতে আছে আলো ও অন্যটিতে অন্ধকার, আলোতে সব প্রকাশিত হয় আমরা সব জিনিষ দেখিতে পারি, কিন্তু অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যায়, আমরা কিছু দেখিতে পাই না, সুতরাং ইহারা বিপরীত গুণসম্পন্ন। দ্বিতীয় প্রকারের প্রক্রিয়ায় আমরা চিন্তা করি যে ঘড়ি কত

সময় হইল জানায়, আবার চিঠি আমাদের খবর জানায়। সময় জানিবার কারণ ঘড়ি এবং খবর জানিবার কারণ চিঠি। দুইটি জিনিসই কিছু জানাইতেছে এবং জানাইবার কারণ হইয়া আছে। সুতরাং তাহাদের উভয়ের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

চিন্তনের কাজ মূলতঃ এইভাবে চলিতে থাকে কিন্তু চিন্তনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হইতে পারে। যেমন কল্পনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পথে যে প্রত্যক্ষগুলি আসিল তাহাদের প্রতিরূপকগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বা সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা আমরা চিন্তা করিয়া এমন এক মানসমূর্তির স্বষ্টি করি যাহা অভিনব, যাহা বাস্তবিক নয়। মৎস্য ও মানব কন্যা দুইই আমরা প্রত্যক্ষ করি—কল্পনায় ইহাদের সমন্বয় করিয়া দিয়া মৎস্য কন্যারূপে নূতন জিনিস স্বজন করি ও উপভোগ করি। নিজের দারিদ্র্য ও অপরের ঐশ্বর্য কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহারা বাস্তবিক। কিন্তু কল্পনায় দারিদ্র্য হইতে নিজের চেষ্টায় বা দৈব অনুগ্রহে ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠা কল্পনার কাজ। পৃথিবী, অন্য গ্রহ এবং বিমান যান বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষের মধ্যে। তাহাদের প্রতিরূপগুলি লইয়া বা ভাষা চিহ্ন লইয়া তিনি কল্পনা করিলেন পৃথিবী হইতে অন্য গ্রহে যাত্রা। সুতরাং দেখা যাইতেছে কল্পনায় যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই মালমসলা সংগ্রহ হয় কিন্তু কল্পনার স্বষ্টিটি হয় নূতন যাহা বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ গোচর নয়। কল্পনার পিছনে থাকে মানব মনের অতৃপ্ত চাহিদা। যেমনকার তেমন বাস্তবিকতার মধ্যে মন তৃপ্ত হইতে পারে না তাই সে আপনার মধ্যে যে স্বজনশক্তি আছে তাহারই সাহায্যে রচনা করে নিজের মনের মত জগৎ যেখানে সে স্বস্তি ও তৃপ্তি পায়।

চিন্তন, বিচার ও কল্পনের পার্থক্য স্থির করা কঠিন কেননা একটি কখন আর একটি হইয়া যায় তাহা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। বিচার ও কল্পন চিন্তনেরই বিভিন্ন ভঙ্গী। বিচারমূলক চিন্তনে আমরা প্রতিষ্ঠিত বিধি ও নিয়ম পালন করিয়া চলি এবং ইহার লক্ষ্য হয় কোন বিষয়কে উপলব্ধি করা বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কোন কাজ করা। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা দেশের অবস্থার

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করেন। দেশের উৎপাদন শক্তি, কাঁচা মালের যোগান, শ্রম শক্তি, দক্ষ কারিগরের সংখ্যা, বেকারের সংখ্যা, শিক্ষার অবস্থা, রাজস্ব, কর, জনস্বাস্থ্য, লোকসংখ্যা ইত্যাদি সমুদায় প্রয়োজনীয় তথ্যের ভিত্তিতে তাঁহারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেন অথবা অন্য কথায় বলা যায় এইসব তথ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে এবং তথ্যে তথ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা অন্য তথ্যে তথ্যে আছে কিনা বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ পাঁচ বৎসরে দেশের ধনোৎপাদন, শিক্ষার অবস্থা, কর্ম সংস্থান ইত্যাদি কিরূপ হইবে তাহার কল্পনা করেন। ইহাও সৃজনাত্মক কল্পনা সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা যুক্তির দ্বারা বাঁধা। অর্থশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারীং, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান বিজ্ঞানের নিয়ম ও সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই এইরূপ গঠনাত্মক কল্পনা করা হয়। সেইজন্য ইহাকে কল্পনা না বলিয়া যুক্তি বা বিচার বলা হয়।

কল্পনা কেবল সেইরূপ চিন্তনকেই বলা হয় যখন কোন বাঁধা ধরা নিয়মকে মানিতে হয় না এবং নিছক বাস্তবতাকে অনুসরণ করিতে হয় না। সেক্সপীয়র ম্যাকবেথে যে ডাইনীদের ও অতি প্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, মুকুন্দরামের অরণ্যের জন্তুজানোয়ার যেরূপ মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছে, রামায়ণ মহাভারতে যেসব আধিদৈবিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কালিদাস মেঘদূতের এবং রবীন্দ্রনাথ তাজমহল বা উর্বশীর যে কাব্য চিত্র রচনা করিয়াছেন সেগুলি স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাবেগের ফল। বাস্তবিকতার সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া এগুলি কল্পিত হয় নাই। তবে এই সব কল্পনা সৃষ্টির মধ্যে যে কোন রীতি-নীতির প্রভাব নাই তাহা নহে। কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি থাকিলে তবে তাহা হইয়া উঠে রস ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ও তাহা না হইলে তাহা এক উৎকট কিম্ভূত-কিমাকার রূপ ধারণ করে। তবে কল্পনার এই সংযম আমরা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লই। এই স্বীকৃতি অন্তরৈষণা থেকেই আসে—বাহিরের বাস্তবতার মানদণ্ড বিচারের দ্বারা নয়।

আমরা সৃজনাত্মক চিন্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিলাম যে চিন্তন বাস্তবাশ্রয়ী হইতে পারে এবং ইহার লক্ষ্য থাকে যুক্তি বিচারের সাহায্যে জাগতিক

ব্যাপারকে বোঝা বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কার্যে লিপ্ত হওয়া। প্ল্যানিং কমিশনের কাজ একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ পার্থিব উদ্দেশ্য না লইয়া যে মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ চিন্তন ঘটে যাহার ফলে মনে নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হয় যাহা পৃথিবীতে সেই আকারে দেখা যায় না তাহাকেই কল্পনা বলা হয়। এইরূপ কল্পনা রুচিবোধ ও সহজাত সংযমের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে রস ও সৌন্দর্যের দ্যোতক হইয়া উঠে এবং বল্গাহীন মাত্রাহীন বেরসিকভাবে প্রকাশিত হইলে তাহা উদ্ভট হইয়া উঠে। বাস্তব জীবনে ফললাভ করা যুক্তি ও বিচারের প্রেরণা কিন্তু কল্পনার প্রেরণা মনের আরও গভীরে থাকে এমন কি নির্জ্ঞানেও থাকিতে পারে।

তবে যাহা আজ যুক্তি ও বিচার বিহীন কল্পনা বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই কাল যুক্তি ও বিচারকে অবলম্বন করিয়াই সার্থক হইয়া উঠে—যেমন রকেট ও অন্য গ্রহে যাত্রা, এডিসনের গ্রামোফোন আবিষ্কার, হিটলারের ডিক্টেটরসিপ লাভ, ফোর্ড সাহেবের ধন কুবের হওয়া ইত্যাদি। আবার প্ল্যানিং কমিশনের অত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনাও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় অবাস্তব কল্পনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সত্য প্রতিফলিত হইয়া উঠে নাই কি ?

আমরা যাহাকে যুক্তি (reason) বলি তাহার প্রধান কার্য সমস্যা সমাধান করা (problem solving)। যুক্তি করা মানে কল্পনায় একটি পরীক্ষা করা। কিন্তু এই পরীক্ষা বাস্তব ভিত্তিক হওয়া চাই। জন্তু-জানোয়ার ও ছোট ছোট শিশুরা যুক্তি করিতে পারে না বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু লইয়া পরীক্ষা করে এবং ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া বার বার চেষ্টা করিয়া সমাধানের দিকে যায়। কিন্তু বয়স্করা এত সময় ও শক্তি ব্যয় না করিয়া মনে মনে যুক্তি প্রয়োগেই সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলে। বাস্তব পরীক্ষা করিতে যে মানসিক ক্রিয়া চলে তাহা মূলতঃ যুক্তি হইতে পৃথক নয় কেবল প্রথমোক্তটি প্রত্যক্ষভাবে বিষয়-বস্তু লইয়া কাজ করে আর যুক্তির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিরূপ ও ভাষা দিয়াই কাজ চলে। দুই কার্যের প্রকার এক তবে সূক্ষ্মতার স্তর আলাদা।

একটি সহজ যুক্তির ক্রিয়া এইভাবে দেওয়া যায়—রাধরাণী রমেশের থেকে লম্বা, রমেশ কানাইয়ের থেকে লম্বা, মালতী রমেশের থেকে বেঁটে। কোন্ বালিকাটি বেশী লম্বা? এখানে আমরা রাধারাণী ও রমেশের সম্বন্ধ এবং রমেশ ও মালতীর সম্বন্ধকে একত্রে দেখিতে চেষ্টা করি এবং তাহা করিবার ফলে রাধারাণী ও মালতীর সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়। আর একটি উদাহরণ—মনে কর তুমি দক্ষিণ দিকে যাইতেছ। এখন বাম দিকে ঘুরিয়া পুনরায় বামদিকে ঘুরিলে, তোমার গতি এখন কোন্ দিকে? কল্পনায় আমরা দক্ষিণ দিকে যাইতে থাকি, তারপর বামদিকে ঘুরিয়া পুনরায় বামদিকে ঘুরিয়া কল্পনানেত্রে দেখি কোন দিকে চলিয়াছি। প্রতিরূপ বা ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না এরূপ নির্বোধ লোকের পক্ষে মালতীকে রাধারাণীর পাশে দাঁড় করাইতে হইত বা সত্যসত্যই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইত সে শেষে কোন দিকে যাইতেছে। সমস্যার সমাধান প্রতিরূপ ও ভাষার সাহায্যে কল্পনাতেই সাধারণতঃ আমরা করিয়া থাকি। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত বেশী ও বিচিত্র হয় ততই যুক্তির কার্যকারীতাও বাড়ে। উদাহরণে খুব সহজ সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ডাক্তার কঠিন রোগ সারাইতে, ইঞ্জিনীয়ার জটিল বাঁধ নির্মাণ করিতে, সমাজকর্মী অস্পৃশ্যতা দূর করিতে, দরিদ্র সম্পদ বাড়াইতে, উকিল আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রয়োগ করিতে এই একই রকমের যুক্তির আশ্রয় নেন তবে এইসব যুক্তি খুব জটিল, গভীর ও সুদূর প্রসারী হয়। যেহেতু যুক্তির একটি বাস্তব উদ্দেশ্য থাকে সেইহেতু যুক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ও হয় বাস্তব ভিত্তিক।

উপরে চিন্তন ও কল্পনের আলোচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে ইহাদের বিকাশ সাধনের কিছু কিছু পথ-নির্দেশ পাই। প্রথম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র থাকাটা চিন্তন ও কল্পনের পক্ষে মৌলিকভাবে প্রয়োজন। মণ্টেসরীয় শিক্ষায় বস্তুর আকার, ওজন, বর্ণ ইত্যাদি শিখাইবার জন্য শিশুদের শিক্ষাপ্রদ দ্রব্য-সামগ্রী (didactic apparatus) দেওয়া হয়। মণ্টেসরী বিশ্বাস করিতেন যে ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা যদি পূর্ণাঙ্গ না হয় তাহা হইলে বিমূর্ত চিন্তন ও বুদ্ধির কাজও খর্ব হইবে। ভাল করিয়া সব জিনিষ প্রতক্ষ করা, তাহাদের ভেদাভেদ লক্ষ্য করা, যাহা দেখা-

শুনা, স্পর্শ করা, আস্বাদ করা, আঘ্রান করা যাইতেছে তাহার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা ইহার উপরই নির্ভর করিবে ভবিষ্যতে ইহাদের প্রতিরূপ বা প্রতীকের সাহায্যে বিমূর্ত চিন্তন, যুক্তি ও কল্পনার সমৃদ্ধি ও শক্তি। এই কারণে ছোট শিশুদের ইন্দ্রিয় স্থানগুলি সম্পূর্ণ সুস্থ ও কার্যক্ষম আছে কিনা তাহার নিয়মিত পরীক্ষা এবং প্রয়োজন স্থলে চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত।

দেখা যায় সহরের ছেলে-মেয়েদের গ্রামের এবং গ্রামের ছেলেমেয়েদের সহরের অনেক জিনিষের অভিজ্ঞতা নাই। গ্রামের নানা রকম ফুল ও ফলের গাছ, পশু-পাখী এবং নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বন্ধে সহরের শিশুরা অজ্ঞ থাকে আবার গ্রামের শিশুরা সহরের অনেক প্রকারের যান-বাহন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতী ও বিনোদন ব্যবস্থার সম্বন্ধে অবহিত না থাকিতে পারে। সেইজন্য পড়াশুনা আরম্ভ করিবার আগে শিক্ষকের দেখা উচিত ছাত্রছাত্রীরা কিরূপ অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার লইয়া অসিয়াছে। এমন বিষয় লইয়া যদি শিখনের কাজ আরম্ভ হয় যে সম্বন্ধে শিশুদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই তাহা হইলে সে শিখন প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাড়ীতে বসিয়া লেখাপড়া না শিখাইয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতামাতার গ্রামের ও সহরের পরিবেশে শিশুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই অভিজ্ঞতার আলোতে তাহারা পরে লেখাপড়ার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই জন্যই কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নানা রকম হাতের কাজ, শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় দর্শন, প্রকল্প কাজ ও উৎসব পালনের বন্দোবস্ত রাখা হয়। এই সকল কাজকর্ম, খেলাধূলার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে ও আনন্দের সঙ্গে নানা জিনিসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রত্যক্ষতার স্তরে (perceptual level) তাহারা যে চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনা করে তাহাই তাহাদের ভবিষ্যতের বিমূর্ত (abstract) চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনার বুনিয়াদ রচনা করিয়া নেয়।

ম্যাডাম মন্তেসরী শিশুদের পরী, দৈত্য, রাক্ষস খোক্কস অধ্যুষিত কল্পলোকে বিহার করিতে দিতে রাজী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে এইরূপ অপার্থিব

ও অতি মানবিক কল্পনায় অভ্যস্থ হইলে শিশুরা বাস্তব বুদ্ধি হারাইবে এবং দৈব যোগে অনেক জিনিষ ঘটিবার আশা করিবে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইবে; নিজের আত্ম প্রত্যয়, বাস্তব চিন্তা ও যুক্তির শক্তি হারাইবে। তাঁহার মতের মধ্যে সত্যতা থাকিলেও তিনি একটি জিনিস বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। শিশুদের বিকাশের এক পর্যায়ে পরীর গল্প, জীবজন্তুর গল্প ইত্যাদির স্থান স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। শিশুরা খেলা করে বলিয়া পরিণত জীবনে তাহারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবে না তাহা আমরা মনে করি না। বরং খেলার মধ্য দিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বেশী সক্ষম ও সমর্থ হইয়া উঠে এবং শৈশবে খেলিতে না পারিলে দেহ ও মনে পঙ্গু হইয়া থাকে। সেইরূপ মনের জগতেও শিশুরা খেলা ভালবাসে কিন্তু কল্পলোক সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুকে তাহারা উপভোগ করে বলিয়া যে তাহারা বাস্তব বুদ্ধি হারায় তাহা তাহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের প্রধান সৃষ্টি কাব্য-উপন্যাস, গল্প-নাটক এগুলিকে সবই বাস্তব সত্যের কষ্টিপাথরে অসত্য ও অমূলক বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইসব কল্পনার সৃষ্টি মানুষ বরাবর উপভোগ করিয়া আসিতেছে। মন যে আদর্শ দেখিতে চায়, যে ইচ্ছার পূরণ করিতে চায় অথচ বাস্তব জগতে করিতে পারে না তাহা কল্পনার এইসব সৃজনের মধ্যে অবাধে ও আশ মিটাইয়া পূরণ করিয়া লয়। মনোসমীক্ষকদের মতে মানুষের অবদমিত বাসনা, কামনাও কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। সেইজন্য ইহারা আপাত দৃষ্টিতে অলীক বা মিথ্যা মনে হইলেও মনোজগতের দিক হইতে ইহারা সত্য ও সার্থক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ইহারা ক্ষতি অপেক্ষা উপকারই করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে শিশুদের বিকাশশীল কল্পনা রূপকথা ও পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে উদ্দীপিত হয়, প্রসারিত হয় এবং শিশু ইহার মধ্যে নিজের জীবন ও পরিবেশকে প্রতিফলিত দেখে। সাধারণতঃ যে মানসিক তৃপ্তিটুকু কল্পনার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাতে শিশু বা বয়স্কলোক বাস্তব বিমুখ হইয়া পড়ে না, বাস্তব সম্বন্ধে সচেতনতা পুরাপুরিই থাকে এবং প্রয়োজন হইলেই

বাস্তবের মুখামুখী দাঁড়াইতে পারে। সকলেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্র অত বড় রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিক হইয়াও দৈনিক জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতে হইত; রবীন্দ্রনাথ কাব্য সাগরে ভাসিতে থাকিলেও তাঁহাকে বিশাল জমিদারী দেখিতে হইত। অবশ্য একথা ঠিক যে যদি বর্তমান বাস্তব পরিবেশ ক্রমাগত ও গুরুতরভাবে ব্যর্থতাবোধ ও আত্মধিক্কারের সৃষ্টি করে তাহা হইলে শিশু ও বয়স্ক লোকেরা জীবনের পূর্বের অবস্থায় যাইতে চায় যেখানে কোন সঙ্ঘর্ষ নাই অথবা মনঃ সৃষ্টিতে (fantasy) মগ্ন হইতে চায়। এইরূপ মানসিক অবস্থা অবশ্যই অভিপ্রেত নয়। তবে গল্প-উপন্যাস, রূপকথা পড়িবার ফলে এই অবস্থা হয় না—হয় অন্য পরিবেশ ও সমাজগত কারণে। সেজন্য রূপকথায় যদি সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রাখিয়া কল্পলোকের বিস্তার করা হয় এবং নিতান্ত উদ্ভট, ভীতিপ্রদ ও অস্বাভাবিক কিছু না থাকে তাহা হইলে রূপকথা শিশুমনের উপভোগেরই বস্তু হইয়া উঠে, মানসিক দুর্বলতার কারণ হয় না। মঙ্গল কাব্যগুলিতে ও রামায়ণ মহাভারতে অনেক অতি প্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা আছে। যতক্ষণ সাহিত্য রস গ্রহণের জন্য আমরা তাহা পড়ি ততক্ষণ আমরা তাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই বটে কিন্তু অভিভূত হই না অর্থাৎ নিজের আত্মবিশ্বাস ও বাস্তব বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়া দৈবের নিকট আত্মসমর্পন করি না। এই অবস্থা আসে ধর্ম বিশ্বাসের ফলে। অবশ্য প্রাচীন কালে সাহিত্য ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইত। সেই কারণে ধর্মের দৃষ্টি দিয়াই পাঠ করা হইত এবং আদ্যোপান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। ধারণা ছিল যে সমস্ত কাব্যটি পড়িলে পাঠকের সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে বা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবে ইত্যাদি। এইসব বিশ্বাস অবশ্য বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী ও আত্মবল ও আত্মশক্তির রোধ কারক। শিশুদের এইরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত করে এমন রূপকথা বা কাহিনী পড়িতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের রূপকথায় থাকিবে কল্পনার বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও অবাধ প্রসার কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নয়।

কল্পনা যে শুধু উপন্যাস, নাটক ও রূপকথাতেই লাগে তাহা নয়, বিজ্ঞানে

রাষ্ট্র ও সমাজ রচনায়, অর্থনীতিতে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় সর্বত্র কল্পনার স্থান আছে। এমন কি একথা অনায়াসে বলা যায় যে কল্পনা না থাকিলে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিই হইত না। সেদিক থেকে শিশুদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। কোন বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই প্রকারের কল্পনার দরকার হয়। এই প্রকার কল্পনার বৃদ্ধি শিশুদের মধ্যে ঘটাইতে গেলে আমাদের কি করিতে হইবে?

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় পথে বাস্তব জিনিসপত্রকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে যে চিন্তনের কার্য হয় এবং যে চিন্তা প্রতীক বা প্রতিরূপ লইয়া চলে তাহাদের প্রক্রিয়ার মূল প্রকৃতি একই কেবল সূক্ষ্মতার ও জটিলতার-স্তর ভেদে তাহারা বিভিন্ন। দুইটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুইটি কোণ সমান হইলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যদি চেষ্টণ কাঠি দিয়া তৈয়ারী দুইটি ত্রিভুজের মধ্যে একটি আর একটির উপর স্থাপন করিয়া কেহ তাহাদের সর্বসমত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সে ভুলভ্রান্তির মধ্যে বারবার চেষ্টা করিতে করিতে সমস্যা সমাধানের জন্য যে মানসিক প্রক্রিয়া করে তাহা ত্রিভুজ দুইটির সর্বসমত্ব প্রমাণ করিবার বিমূর্ত চিন্তনেরই সমতুল্য তবে অনেক স্থূল ও নিম্নস্তরের। অন্ততঃ একটি জিনিসের উপর আর একটি জিনিসকে চাপাইবার পূর্ব অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকা চাই তাহা না হইলে ত্রিকোণমিতির একটি ত্রিভুজকে আর একটি ত্রিভূজের উপর চাপানর কল্পনা কখনও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং হাতে-নাতে কিছু করাও একধরণের চিন্তন এবং উন্নত বিমূর্ত চিন্তন ও কল্পনের ইহাই হয় বুনিয়াদ। যেহেতু কল্পন হাতে-নাতে কাজ করা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে সেইজন্য ইহাও কাল্পনিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যুক্তিকে আমরা বলিতে পারি কাল্পনিক পরীক্ষার কার্য। সেইজন্য বুদ্ধিজীবীদেব পক্ষে হাতের কাজ যে অযোগ্য এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হাতের কাজ করা এবং হাতে-নাতে পরীক্ষা করা বিমূর্ত চিন্তনের বিকাশকে বাধা দেওয়ার কথাই উঠে না বরং বিমূর্ত চিন্তনের বিকাশের জন্য হাতে নাতে কাজ ও পরীক্ষা অপরিহার্য। সেই জন্য প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী

শিক্ষায় কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। "কাজ করিতে করিতে শেখো" এই নীতির উপরই প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নির্ভর করে।

কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও অর্থ বোধের কোন সুযোগ থাকে না বলিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ গণিতে আগ্রহ জন্মায় না। সেইরূপ প্রয়োগশালায় হাতে-নাতে পরীক্ষার কাজ করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যর্থ হয়—ছাত্র-ছাত্রীরা কতকগুলি নিরর্থক প্রতীক মুখস্থ রাখে। বিজ্ঞানে এরূপভাবে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাড়ীর ইলেকট্রিক ষ্টোভটি বা রেড়িওটির সামান্যতম মেরামতের কাজও করিতে পারে না। সমস্ত বিষয়েই হাতে-নাতে কাজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। সাহিত্য উপলব্ধির মধ্যেও কাজ করিবার উপাদান আছে এবং নৈতিক শিক্ষা পাইতে গেলেও উপযুক্ত অবস্থায় আচার-ব্যবহারের শিক্ষা লইতে হয়। সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের যে বিমূর্ত চিন্তন উন্নত পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার বুনিয়াদ হইতেছে হাতে-নাতে কাজ ও পরীক্ষা। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ জীবন্ত প্রতিরূপ ও প্রতীকের উপর ভর করিয়াই তাহাদের সূক্ষ্ম ও বিমূর্ত মহিমা আজ বিরাজমান হইয়া আছে।

প্রাকবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের কল্পনামূলক খেলা ও স্বপ্ন

শিশুরা প্রধানতঃ খেলার মাধ্যমেই তাহাদের জগতের ও নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। কল্পনায় ও নাটকীয় খেলাধূলায় তাহারা অপরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে। তাহারা মা, মাষ্টার মহাশয়, ডাক্তার, পুলিশ, কচি শিশু, গোয়ালা ইত্যাদির ভূমিকায় নামিয়া খেলা করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি হইলে কিরূপ মনে হয় তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ খেলিয়া তাহারা তাহাদের সাধ পুরাইয়া লয় কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে ঐসব লোকেদের সহিত ব্যবহার করিয়া সাধ মেটে না। অর্থাৎ মা খুশীমত কত কাজ করিতে পারে, সন্তানকে যেমন সুখ দেন তেমনি সন্তানকে সংযত করেন—তাঁহার কত শক্তি। সুতরাং

কল্পনায় মা হইয়া তাহারা বড়দের মত শক্তিশালী ও স্নেহ-কৃপা দান করিবার অধিকারী হইবার বাসনা তৃপ্ত হয়। মা হইয়া পুতুলকে খাওয়ায়-দাওয়ায়, বকে-ঝকে ও উপদেশ দেয় আবার মাষ্টার মহাশয় হইয়া অপর শিশুদের পড়া ধরে ও শাসন করে ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করিবার জিনিস এই যে এই বয়সে কল্পনা খেলা-রূপ কার্যের মধ্য দিয়া বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই ঘটে।

শিশুদের এই সব কাল্পনিক খেলাধূলার মধ্যে তাহাদের সামাজিক প্রক্ষোভিক জীবনের সম্বন্ধে অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। বাড়ীতে স্নেহ বা অবহেলার সম্পর্ক, বাড়ীর বড়দের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং তাহাদের সামাজিক ও প্রক্ষোভিক অভিযোজন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। পুতুল খেলিতে খেলিতে শিশু তাহার ছোট ভাইটির প্রতি ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার মা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এবং মা তাহার কাছ হইতে কি মনের ভাব গোপন রাখে তাহা সে সঠিক ভাবে খেলার মধ্যে প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য যে সে এইসব মনোভাব ও ব্যবহার মা-পুতুল, ছেলে-পুতুল ইহাদের মধ্যে সেই প্রকাশ করে।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কেহ ইচ্ছা করিলেই শিশুদের কাল্পনিক খেলার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। এ বিষয়ে দস্তুর মত শিক্ষণ প্রাপ্ত না হইলে ব্যাখ্যা নির্ভুল না হইতেও পারে। যাহা হউক খেলার মধ্য দিয়া শিশুরা যেমন একদিকে সত্যকার জীবনকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং কিভাবে তাহার সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিতে হইবে তাহা শিখে তেমনি অন্যদিকে খেলার মধ্যে তাহারা নির্বিবাদে তাহাদের আক্রোশের ভাব, ভয় ও নিজেদের অভাব-বোধকে প্রকাশ করিতে পারে। অবশ্য অত্যধিক উৎকণ্ঠা থাকিলে শিশু গঠনমূলক কোন খেলা খেলিতে পারে না।

পাঁচ বৎসর বয়সের আগে শিশুদের খেলা খুবই কাল্পনিক থাকে। ট্রেণ দেখিয়া আসিয়া তাহারা সারিবদ্ধভাবে পরস্পরকে ধরিয়া রেলগাড়ী খেলা করে। পিচবোর্ডের বাক্সকে খানিকটা হারমোনিয়মের মত রূপ দিয়া বেলো টানিতে টানিতে রিড টিপিয়া কাল্পনিক বাদ্য সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করে।

অভিনয় করিতে গিয়া সাজসরঞ্জামের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কল্পনাই জুগাইয়া দেয়। এই সব কাল্পনিক অভিযানে বড়রা যোগ দিলে তাহারা খুব খুশী হয়। বাহিরের জগতের যে ছাপ তাহাদের মনে পড়ে তাহা তাহারা যেভাবে অনুভব করিয়াছে তাহা কাল্পনিক খেলা বা অভিনয়ের মধ্যে প্রকাশ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। তাহাদের এই স্বাভাবিক প্রকাশ করিবার প্রবণতাকে উৎসাহ দিলে ভবিষ্যতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, রাষ্ট্রশাসন, শিল্প ও ললিতকলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। পাঁচ হইতে সাত বৎসর বয়সের শিশুদের কাছে জগৎ আর অপরিচিত বা ভীতিপ্রদ থাকে না তবে তখনও জগৎ তাহার চোখে একেবারে বাস্তবিক হইয়া উঠে নাই সেইজন্যই রূপকথা কল্পনা প্রিয় শিশুদের এখনও আনন্দের খোরাক যোগাইতে পারে।

তিন বৎসরের বা তাহার চেয়ে বেশী বয়সের সময় কাল্পনিক সঙ্গী শিশুদের কাছে সত্যিকারের হইয়া উঠে। তবে সব শিশুদেরই এরূপ কাল্পনিক সঙ্গী থাকিতে দেখা যায় না। কাল্পনিক সাথীরা বিভিন্ন শিশুদের বিভিন্ন সাধ মেটায়। যে শিশুকে একলা নির্জনে থাকিতে হয় তাহাকে কাল্পনিক সাথীই সঙ্গদান করে। অন্যরা তাহাদের অভিমান আসল লোকেদের নিকট করিতে না পারিয়া কাল্পনিক সাথীকে অবলম্বন করিয়া মনের ভাব লাঘব করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক সাথীই আসে শাসনের দণ্ড লইয়া এবং শিশুর মনে অপরাধ ও ভয়ের ভাব বাড়াইয়া তোলে। কাল্পনিক সাথীরা সব সময়ই যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আসে তাহা নহে। এমনিই শিশু-কল্পনায় তাহাদের আবির্ভাব হয় আবার কল্পলোকের খেলা সাঙ্গ হইলে নাটকীয়ভাবে মিলাইয়া যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বিশেষ কল্পনাপ্রবণ হইতে দেখা যায় এবং এই সময় রূপকথা ও পৌরানিক গল্প তাহাদের মনের চাহিদা মেটায়। তবে এই সব ছাড়াও তাহাদের মত ছোট ছোট শিশুদের গল্প, পশুপক্ষীর গল্প, অভিযানের গল্প এবং অনুরূপ তাহাদের জানা-শোনা জিনিসের গল্পও তাহারা

পছন্দ করে। এই সময় হইতেই সত্য ও কল্পনার পার্থক্য তাহারা ক্রমেই বেশী করিয়া বুঝিতে পারে। তবে এ সময়েও তাহারা ইন্দ্রজালিক বিষয় উপভোগ করে। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই তাহাদের মাথায় যে পরিকল্পনা থাকে তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কল্পনা বা যুক্তির আশ্রয় লয় অথবা কল্পনায় নিজেদের অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করে অথবা প্রত্যক্ষর মধ্যে যাহা নাই এমন সব জিনিসের কল্পনা করে।

শিশুদের দিবাস্বপ্ন বা মনঃসৃষ্টি তাহাদের চিন্তা ও কার্যের ধারা ধরিয়াই চলে। এইরূপ কল্পনাময় জীবন তাহাদের বিকাশের একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং ইহা দেখিয়া বড়রা বুঝিতে পারে যে বহিরাবরণের তলায় কি চলিতেছে। শিশুদের প্রবল প্রবৃত্তিগুলি যখন সত্যিকারের জগতে তৃপ্তি পায় না তখন কল্পনায় তাহারা সেগুলির তৃপ্তি খুঁজে। এই সময় মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে এরূপ কল্পনাবিলাস প্রয়োজনীয়। তবে দেখিতে হইবে যে দেহ ও মনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সামর্থ্যের ফলে শিশু যেন সত্য ও কল্পনার পার্থক্য ক্রমশঃ বুঝিতে পারে।

স্বপ্ন

প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে স্বপ্ন সত্য ঘটনা। আদিবাসীদের মধ্যেও এইরূপ মনোভাব দেখা যায়। তাহাদের কল্পনা ও স্বপ্নের জগতের সহিত তাহাদের বাস্তব জগতের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। এই সময় তাহারা ঘন ঘন স্বপ্ন দেখে। প্রায়ই তাহারা দুঃস্বপ্নও দেখে।

স্বপ্নকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। একমতে বলা হয় যে, দিনের মধ্যে বিশেষ করিয়া শুইতে যাইবার পূর্বে যে উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয় তাহা লইয়াই স্বপ্ন সৃষ্ট হয়। দিবসের অভিজ্ঞতার কোন কোন অংশ স্বপ্নে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহারও বৈশিষ্ট্য অন্যরকম হইয়া যায়, যেমন যে চেনা লোকটির সহিত দেখা হইয়াছিল তাহাকে স্বপ্নে অপরিচিত ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়। মনোচিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বপ্ন শিশুদের ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম। স্বপ্নের মধ্যে

শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহাদের আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীতি, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাহিদা, আক্রোশ ও বিফলতা প্রকাশ করে। এই দিক দিয়া স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সক্রিয় গতিময় স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়।

শিশুদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিবার সময় কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে, যেমন শিশুরা তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত স্বপ্নকে গুলাইয়া ফেলে। যেখানে যেখানে স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যায় সেগুলি কল্পনার সাহায্যে পূরণ করে, তাহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার বিপরীত ঘটনাগুলি বলে না এবং শব্দ জ্ঞান যথেষ্ট না থাকায় স্বপ্নের সম্পূর্ণ বা যথাযথ বিবরণ দিতে পারে না।

দেখা যায় স্বপ্নের পৌণ-পৌণিকতা ও বিষয়বস্তু নির্ভর করে শিশুর বয়স, ব্যক্তিত্ব গঠন, সামাজিক-আর্থিক অবস্থা, বুদ্ধি, দৈহিক স্বাস্থ্য এবং দিবসের অভিজ্ঞতার উপর। প্রকৃত ভয়ের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ভয়ের কল্পনা থেকেই দুঃস্বপ্নের বেশী উদ্ভব হয়। যাহারা বেশী উৎকণ্ঠিত অবস্থায় থাকে তাহারাই সাধারণতঃ বার বার স্বপ্ন দেখে।

একই শয্যায় কয়েকজন শিশু শুইলে তাহারা যে শিশু শয্যায় একলা শোয় তাহার অপেক্ষা বেশী দুঃস্বপ্ন দেখে। দরিদ্র ও নিকৃষ্ট পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুরা স্বচ্ছন্দ অবস্থার সংস্কৃতিবান শিশুদের থেকে বেশী স্বপ্ন দেখে। দিবসে যে বিঘ্ন-বিপত্তিগুলি ইচ্ছা পূরণের বাধা হইয়াছিল স্বপ্নে সেই বাধা অপসারিত হইয়া যায় বা প্রতিরোধক শক্তি পরাভূত হয়। ১২০ উপর যাহাদের বুদ্ধাঙ্ক তাহারা তাহাদের অপেক্ষা নিম্নবুদ্ধির ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম স্বপ্ন দেখে এবং তাহাদের দুঃস্বপ্নের সংখ্যাও কম।

চতুর্থ অধ্যায়

সংঘ মন

(১) শিক্ষার্থী ও তাহার পরিবার

একথা সকলেই জানেন যে মানুষ যখন একা থাকে তাহার আচরণ সে যখন কোন সামাজিক দলে থাকে তাহার তখনকার আচরণ হইতে ভিন্ন হয়। এমন কি দলেরও প্রকৃতি অনুযায়ী আচরণ বদলায়, যেমন বাড়ীতে আমরা যে রকম করি ও কথা বলি কোন সভা-সমিতিতে গিয়া সেরকম করি না। বন্ধুদের দলে যেরকম আচরণ ও কথাবার্তা হয় অপরিচিত ব্যক্তিদের দলে নিশ্চয়ই সেরূপ হয় না। সুতরাং আমরা সকলেই অনুভব করি দলের প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রেণী তথা বিদ্যালয়ও একটি দল এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে শিশুরা সেখানে দলগত আচরণই বেশী করে। তাহাদের নিজেদের যে প্রয়োজন, চাহিদা বা প্রেষণা থাকে সেগুলি তাহার দলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই প্রকাশিত হয়। সেজন্য শিশুর মধ্যে তাহার চাহিদা, প্রেষণা ইত্যাদি যে শক্তিগুলি কাজ করিতেছে তাহা জানিলে তাহার আচরণের প্রকৃতি খানিকটা জানা যায় বটে কিন্তু সবটা জানা যায় না। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে তাহার সহিত অন্যদের বিশেষ করিয়া তাহার নিজের পরিবারের লোকজনের এবং তাহার সমবয়সী সঙ্গী-সাথীদের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহা জানিতে হইবে। দেখা গিয়াছে এই সব সম্পর্ক তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও আচরণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এবং এইসব সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাহারা অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে।

শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তাহারা অনেক জিনিসই শিখিয়া আসে এবং শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়াও অনেক জিনিস শিখিতে থাকে, যেহেতু এই জিনিসগুলি ইংরাজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোলের মত তাত্ত্বিক বিষয় নহে সেইহেতু শিশুদের

শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রগুলির কথা আমরা ভুলিয়া যাই। বিদ্যালয়ের মধ্যে ও বাহিরের সমাজের যে বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু অনবরত অংশ গ্রহণ করে তাহা জানা থাকিলে শিশুকে ও তাহার আচরণকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সুতরাং শুধু শিশুর ভিতরের প্রকৃতিকে জানিলেই হইবে না তাহার বাহিরের সমাজ তাহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাও জানিতে হইবে। দেখা গিয়াছে শিক্ষাকার্যকে সত্যই সফল করিতে হইলে এই জ্ঞান শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে অপরিহার্য।

শিক্ষাকার্যে পরিবারের অবদান

শিশু তাহার নিজের পরিবারের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা তাত্ত্বিক শিক্ষা না হইতে পারে কিন্তু ইহা জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা। প্রথম শৈশব হইতেই পিতামাতা শিশুকে নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি নানা জিনিস শিখাইতে আরম্ভ করেন। অনেক সময় এমন হয় যে পিতামাতা শিশুকে সজ্ঞানে যাহা শিখাইতে চাহেন তাহা অপেক্ষা শিশু এমন সব জিনিস শেখে যাহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না।

অনেক সময় দেখা যায় নাওয়া-খাওয়া, শোওয়া, মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে নিয়মিত অভ্যাস গঠন করাইবার জন্য মা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন। যেমন মলমূত্র ত্যাগ নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে করিবার জন্য শিশুকে তিনি শিক্ষা দিতে থাকেন এবং কাপড়, জামা, বিছানা নষ্ট করিলে রুষ্ট হন। মলমূত্র ত্যাগ করাইবার জন্য তিনি তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে মলপাত্রের কাছে বসান এবং দেখেন ক্রমশঃ শিশু এইসব নিয়ম পালনে অভ্যস্থ হইতেছে এবং তিনি ভাবেন শিশুকে তিনি ভাল শিক্ষা দিয়াছেন আসলে কিন্তু তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা অনেকাংশেই নিরর্থক কেননা পরিপক্কতার একটি স্তরে না আসিলে শিশুরা মলমূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারে না। দেড় বৎসর বয়স না হইলে মল ত্যাগের বেগ এবং দুই বৎসর বয়স না হইলে মূত্র ত্যাগের বেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হাজার শিক্ষা

দিলেও আসে না। সেজন্য মায়েরা যে শিশুকে তাঁহাদের চেষ্টার ফলে মলমূত্র ত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহা ভিত্তিহীন। এক বৎসর বয়সের মধ্যে শিশু নির্দিষ্ট স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে শেখে না। আসলে মা-ই শেখেন শিশু কোন্ কোন্ সময় মল ও মূত্র ত্যাগ করে এবং সেই অনুযায়ী তিনি শিশুকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান।

তবে শিশু যে কিছুই শেখে না তাহা নয়। সে হয়ত শেখে যে তাহার মলমূত্র ত্যাগের কার্য লইয়া মা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সে মায়ের আদর্শমত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না বলিয়া মা হয়ত তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন এই বোধ সম্ভবত তাহার মনে জন্মায় অথবা সে হয়ত মনে করে মা তাহাকে সর্বক্ষণ ব্যাকুলভাবে চোখে চোখে রাখিতে চায় এবং তাহার উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার নিকটে নিকটে অপেক্ষা করে। মা অবশ্য তাহার নিজের মনোভাব ও আচরণ সম্বন্ধে এইসব শিক্ষা শিশুকে দিতে চান নাই কিন্তু তিনি চাহেন বা না চাহেন শিশু এইসব জিনিস শিখিয়া লয়। মা যে তাহার মলমূত্র ত্যাগের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে শিশু তাহা মায়ের অজ্ঞাতসারেই শিখিয়া লয়।

এইরূপ শিক্ষা যাহা জ্ঞাতসারে শিশুদের শেখান হয় না তাহারা বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে সব সময়ই শিখিতে থাকে। সেই জন্য বড়রা যখন শিশুদের কোন কিছু শিখাইতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহারা দুই রকমের শিক্ষা শিশুদের দেন। সজ্ঞানে তাঁহারা একপ্রকার শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে আর এক প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা দিয়া থাকেন। জ্ঞাতসারে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে কিন্তু অজ্ঞাতসারে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সাধারণতঃ স্থায়ীত্ব লাভ করে। আমরা যদি চতুর্থ শ্রেণীতে যখন পড়াশুনা করিতাম সেই সময়কার কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে তখন কি বই পড়িয়াছিলাম বা তাত্ত্বিক জ্ঞান কি লাভ করিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িবে না, যে শিক্ষকরা পড়াইতেন তাঁহারা কি প্রকৃতির ছিলেন বা

আমাদের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব বা তাঁহাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কি ছিল তাহা স্মরণ করিতে পারিব।

পরিবারের মধ্যে এই রকমের শিক্ষাই চলিতে থাকে। বড়দের সম্বন্ধে শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করে। দেহাকৃতিতে বড় ও শক্তিশালী বয়স্ক লোকেরা কিরূপ আচরণ করে এবং কি কাজ করে এবং তাহাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কি করিয়া চলিতে হয় এই সব ধারণা ও শিক্ষাই শিশুরা পরিবারে থাকিয়া মুখ্যত লাভ করে। বড়দের সম্বন্ধে যে ধারণা ও মনোভাব এই বয়সে গড়িয়া উঠে সারা জীবনেই তাহার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমরা চিরকালই শৈশবে গঠিত ধারণা ও মনোভাব অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারেই পোষণ করি।

একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। যদি কোন শিশু এইরূপ ধারণা করিতে শেখে যে পিতামাতা তাঁহাদের নিজেদের ব্যাপার অপেক্ষা তাহার ব্যাপারেই সব সময়েই একান্তভাবে আগ্রহশীল তাহা হইলে সে এই বিশ্বাস লইয়া বড় হইয়া উঠিতে থাকে যে শিক্ষক-শিক্ষিকা, তাহার মনিব এবং অন্য কর্তৃস্থানীয় লোকেরা তাহার সমস্যা লইয়াই সব সময় মাথা ঘামাইবে। সে আশা করে যে সব সময় তাঁহাদের সনির্বন্ধ মনোযোগ তাহার প্রাপ্য এবং কদাপি তাহা না পাইলেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোক হিসাবে সে হয়ত কিছুটা অনুভব করে যে তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে উপরওয়ালারা একটা আগ্রহ সর্বদা দেখাইবে এই ধারণা হাস্যকর কিন্তু কিছুতেই সে ঐ ধারণার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। উহা যেন তাহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। ইহার ফলে উপরওয়ালাদের সহিত ও সহকর্মীদের সহিত ভাল সম্পর্ক সে স্থাপন করিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায় কেহ কেহ এমন সব বিষয় ভাবে বা অনুভব করে যাহার সত্যিকার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। এইগুলির অন্তরশায়ী হইয়া থাকে শৈশবের শেখা অনুভূতি ও মনোভাব। শৈশবোচিত এইরকম মনোভাব ও অনুভূতির ফলে আমরা অনেক সময় জীবনে ইচ্ছানুরূপ সুখী হইতে ব

সফলতা লাভ করিতে পারি না। শৈশবের শেখা জিনিষগুলি মন হইতে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলা খুবই কঠিন।

পরিবারের মধ্যেই শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের গোড়া পত্তন হইয়া থাকে। পরিবারে থাকিয়া শিশু শুধু যে বয়স্কদের বুঝিতে ও শিখিতে আরম্ভ করে তাহাই নহে অপরের চোখে সে কি ভাবে প্রতিভাত হয় তাহারও প্রাথমিক জ্ঞান তাহার জন্মাইতে থাকে এবং এইরূপ জ্ঞানই আত্মবোধের প্রাথমিক উপাদান। অন্যেরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে সেই ধারণা থেকেই ক্রমে ক্রমে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। পারিবারিক জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই শিশু তাহার চাহিদা কিভাবে মিটাইতে হয় ও যাহা পাওয়ার নয় তাহার জন্য অযথা উৎকণ্ঠিত না হইয়া যে সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি লাভ করা যাইতে পারে তাহা পাইতে শেখে। অবশ্য ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের শিক্ষা কিছু পরিবর্তন করিতে হয় কিন্তু অন্যদের সহিত সামাজিক ব্যবহারের ধরণটি ও জীবনের সমস্যা সমাধানের প্রণালীটির সহিত শৈশবের শিক্ষার মূলগত ঐক্য সারাজীবনই বর্তমান থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সব পরিবারে শিশুদের কথা বলিবার ও মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে তাহারা স্পষ্টবাদী হয়। তাহাদের মধ্যে মুখচোরামী দেখা যায় না। শ্রেণীর আলোচনায় তাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য কোন কোন বয়োজেষ্ঠ লোক এইরূপ অকুণ্ঠ স্বাধীন আচরণকে তাঁহাদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করিতে পারেন এবং যে সব শিক্ষক শুধু গতানুগতিক বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষা কার্য চালান তাঁহারা এইরূপ বালক-বালিকাদের প্রশ্ন ও যুক্তি প্রয়োগকে আপত্তিকর মনে করেন কিন্তু যে সব শিক্ষক মৌলিক চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাঁহারা ইহাদের খুব পছন্দ করেন। অবশ্য স্পষ্টবাদী হওয়া বা নিজের মতামত গোপন রাখা ব্যক্তিত্বের মাত্র একটি দিক। ব্যক্তিত্বের এইরূপ অসংখ্য দিক আছে এবং সবগুলিরই বিকাশ নির্ভর করে শৈশবে কিরূপ শিক্ষা আমরা পারিবারিক অবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া পাইয়াছি। আমাদের পরস্পরের সহিত ব্যক্তিত্বের সাম্য ও বৈষম্য আমাদের শৈশব

অভিজ্ঞতার সাম্য ও বৈষম্যের ফলস্বরূপ ; অবশ্য বংশগতিও ব্যক্তিত্ব বিকাশে কার্য করিয়া থাকে।

শিশু সমীক্ষার অন্যতম উপায় শিশুর পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করা। বিদ্যালয়ে যে প্রগতি পঞ্জী (cumulative record) রাখা হয় তাহাতে শিশুর পরিবার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন থাকে, যেমন—পরিবারে কয়টি শিশু আছে ? এই শিশুটি কোন্ ভাই বা বোন (বড়, মেজ, সেজ ইত্যাদি) ? পিতা কি চাক্‌রী করেন বা কি পেশা ? পরিবারের লোক সংখ্যা কত ? পিতা ও মাতা কতদূর শিক্ষা পাইয়াছেন ? পরিবারের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা কিরূপ ? শিশুর প্রতি পিতামাতার সম্পর্ক কিরূপ ?

শিশুর আচরণের হদিস পাইবার জন্যই বিদ্যালয় হইতে এই সকল প্রশ্ন করা হয়। আর্থিক নিরাপত্তা, গৃহের শাসন, পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা বা অবহেলা, অনাদর এ সকলই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পিতা-মাতার মনোভাব, ভয়-ভাবনা শিশুকে লইয়া না হইলেও সে সেগুলি আত্মসাৎ করে। মা যদি নিজের রোগ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহার সন্তানরাও রোগকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শেখে।

পরিবারের প্রক্ষোভময় আবহাওয়া

পরিবারের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা বা রাগ-দ্বেষাদি এবং অনুকূল ও প্রতিকূল মনোভাবের যে সাধারণ ভাব বিরাজ করে তাহাকেই পরিবারের প্রক্ষোভময় আবহাওয়া বলা যাইতে পারে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই শিশুর সহিত তাহার পিতা-মাতা ও বাড়ীর অন্য লোকজনদের সহিত তাহার সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। দাস পরিবারের লোকেরা ঝগড়াঝাটি লইয়াই থাকে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রতি বেশ আসক্ত এবং দুর্দিনে তাহারা দ্বন্দ্ব-বিবাদ ভুলিয়া একপ্রাণ একমন হইয়া কাজ করিতে পারে। দে পরিবারের লোকেদের মানসিক সংহতি ও প্রেরণা নাই। কোন

জিনিসই ঠিক মত হইয়া উঠিবে বলিয়া তাহারা ভাবিতে পারে না। পিতা তাঁহার চাক্‌রী বজায় রাখিতে পারেন না, মাতা পুরাতন হৃৎযন্ত্রের রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া অথর্ব হইয়া আছেন। ভগ্নীর কিছুতেই বিবাহ হইতেছে না। দে পরিবারের ভ্রাতারা কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবার কথা ভাবেন না। দৈবযোগে যে সুযোগ আসে তাহাকে গ্রহণ করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাতে অন্যের ক্ষতি হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। পরিবারের পরস্পরের প্রতি একটি আন্তরিক তিক্ততার ভাব সদা বর্তমান। সেন পরিবার বেশীর ভাগ সময়ই ক্ষেতের কাজে কঠোর পরিশ্রম করে। কাজ-কর্মের পরিকল্পনা করা ছাড়া তাহারা বেশী কথাই কহেন না। দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাইবার জন্য তাহাদের অধিকাংশ মনোযোগ কাজের দিকেই থাকে এবং এই লক্ষ্য সম্পাদনে সমস্ত পরিবারটিই একজোটে কাজ করে।

যে সব শিশুরা এই তিন প্রকারের পরিবার হইতে আসিবে তাহাদের মনোভাবে, অনুভূতিতে, চিন্তায় এবং সাধারণ আচার-ব্যবহারে তাহাদের বাড়ীর প্রক্ষোভময় আবহাওয়া প্রতিফলিত হইবে। বাড়ীর আবহাওয়া যত নিরুৎসাহব্যঞ্জক, শিশুদের চাহিদা পূরণে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং তাহাদের আশাভঙ্গের কারণ হইবে ততই শ্রেণীতে শিশুর আচরণ সমস্যা বাড়িতে থাকিবে।

পিতামাতা যদি আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদের সন্তানদের আচরণকে বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেন তাহা হইলে পুত্রকন্যাদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও জোরজুলুম করিবার প্রবণতা কমিয়া আসে এবং তাহারা বিনয়ী ও সহযোগী হইয়া উঠে। বাড়ীর মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়া থাকিলে বিদ্যালয়ে তাহারা আক্রোশ ও আক্রমণপরায়ণ হইয়া উঠে। পিতামাতা যদি শিশুদের উপর অত্যধিক আধিপত্য করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদের বিরক্তিকর ব্যবহারে অত্যধিক অসহিষ্ণু হন তাহা হইলে শিশুরাও সব সময় অসহিষ্ণুতার ভাব দেখায়। বাড়ীর গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে

লালিত পালিত হইলে শিশুরা এমন কি কিশোর-কিশোরীরাও পরিবারের লোকজনদের সহিত প্রীতিমধুর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। শিশুদের বাধ্য করানর উপর সব জোর না দিয়া তাহাদের দায়িত্বশীল করিয়া তোলাই পিতামাতার কর্তব্য। এইরূপ করিলে অবাধ্যতার কোন সমস্যাই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, যে সব শিশু নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহাদের পিতামাতার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ শিশুদের পিতামাতার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভিন্ন হয়। নেতৃত্ব গ্রহণকারী শিশুদের পিতামাতা তাহাদের সন্তানদের জীবনের সুখ-দুঃখকে জানিতে বুঝিতে দেন, যে সব বিঘ্ন ও সঙ্কট স্বাভাবিকভাবে জীবনে আসে সেগুলির সহিত যুঝিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে দেন অযথা তাহাদের পক্ষপুটাশ্রিত করিয়া রাখেন না। তাঁহারা পুত্র কন্যাদের দায়িত্ব পালনে দৃঢ় হইতে শেখান এবং স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হইবার পথে বাধা দেন না। সমাজে চলিতে গেলে এবং উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য স্বাবলম্বীত এবং স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়। যতটা সম্ভব তাঁহারা শিশুদের উপর কর্তৃত্ব কম করেন। বিচার-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নূতন বিষয় লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা তাহাদের দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া পরিবারের প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। তাহার অধিকার ও মতামতকে পরিবারের অন্যদের সহিত গ্রাহ্য করা হয়। অগ্রাহ্য ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব থাকে না। সকল শিশুদের পিতামাতারা শিশুদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যকে তলাইয়া বুঝিতে পারেন এবং সঠিক মূল্যায়ণ করিতে পারেন। শিশুর সার্থক বিকাশের জন্য পিতামাতার এই ক্ষমতা থাকা একান্ত কাম্য।

ব্যক্তিগত আচরণের ধরণ

সাধারণ শিশুদের কথা ধরিলে একথা বলা যায় যে বাড়ীর প্রক্ষোভময় আবহাওয়ার প্রভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এবং জীবনের

প্রতি সাধারণ মনোভাব গড়িয়া তোলে। এই জন্য বাড়ীর প্রক্ষোভময় আবহাওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ীতে যদি অস্বস্তি ও উদ্বেগের ভাব সদা বর্তমান থাকে তাহা হইলে জীবনে কোন ব্যাপারেই বেশ প্রসন্ন হইতে পারে না। সবের ভিতরই যেন অস্বস্তি কাঁটা বিঁধিতে থাকে এবং সবেতেই উদ্বিগ্ন বোধ করে, ব্যর্থতাকে এবং সম্ভাব্য বিপদকে অযথা বাড়াইয়া দেখে। যদি বাড়ীর আবহাওয়া প্রভুত্বপরায়ণতায় ভরা থাকে তাহা হইলে শিক্ষকের কাছে শিশু সঙ্কুচিত ও অনুগত থাকে বটে কিন্তু তাহার অপেক্ষা ছোট শিশুদের উপর জোর-জুলুম চালায় অথবা সে বড়দের সব রকম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। অন্য পক্ষে বাড়ীর আবহাওয়া যদি প্রীতিমধুর হয় এবং নিজের ভাব আবেগ স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ থাকে তাহা হইলে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব বিষয়ে সাড়া দেয় এবং ভাল মন্দ সব রকম অনুভূতিই পরিষ্কারভাবে জানায়। অবশ্য ইহা ভাবা ঠিক নয় যে, বাড়ীর আবহাওয়া জানিলেই খুব সহজে শিশুর আচরণের কারণ বলিয়া দেওয়া যায়। আচরণের জটিলতাকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের দ্বারা ভেদ করিতে পারিলে প্রকৃত কারণের উৎসমূলে পৌছান যায়।

পরিবার সংস্কৃতির বাহক ও ব্যাখ্যাতা

যে বৃহত্তর সামাজিক সংস্কৃতির অংশ পরিবার তাহার আবহাওয়া কিছু পরিমাণে সেই সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করে। আমাদের পরিবারে প্রতিযোগিতা, প্রগতি ও আত্ম স্বাতন্ত্রের খুব মূল্য দেওয়া হয় কেননা সমাজ ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। কিন্তু ভারতবর্ষেই যে সকল আদিবাসী এখনও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে তাহারা ব্যক্তি থেকে দলগত জীবন যাপনই পছন্দ করে। জার্মান পরিবারে ও ভারতীয় পরিবারেও ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিশ্বাস ও মতামত মানিয়া লয় কিন্তু আমেরিকার ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে তাহারা কৈশোরে উপনীত হইলে পিতামাতার সহিত তাহাদের মতের বিভিন্নতা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। জার্মান

ও ভারতীয় কালচারে পিতামাতার মতামত মানিয়া লওয়ার যে সাংস্কৃতিক মুল্য দেওয়া হয় আমেরিকার কালচারে ঠিক তাহার উল্টা—সেখানকার কালচার অনুসারে কিশোর-কিশোরীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ভারতীয় পরিবারে কামকে অপবিত্র মনে করা হয় এবং এ বিষয়ে সামাজিক মনোভাব খুবই সংরক্ষণশীল। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম করা হয় এবং কাম বিষয়ে যে যত সংযম দেখায় সামাজিক দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদা তত উচ্চে থাকে। অপরপক্ষে ইউরোপিয় ও আমেরিকান সংস্কৃতিতে কামের প্রতি এতটা রক্ষণশীল মনোভাব দেখান হয় না। আমেরিকায় কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা যদি পরস্পর মেলামেশা করা সামাজিক বিকাশের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। স্কুল ও কলেজের ছেলেমেয়েরা একত্রে যেভাবে বল ডান্স, স্কোয়ার ডান্স ও ফোক ডান্স করে তাহা ভারতীয়রা ভাবিতেই পারে না। যুবক-যুবতীর একত্রে আহার, প্রমোদ ভ্রমণ এবং প্রকাশ্য স্থলেও মুখচুম্বন, যুবতীদের অপর্য্যাপ্ত দেহাবরণ ভারতীয় সংস্কৃতির শালীনতার দৃষ্টিভঙ্গীতে কদাকার ও কুশ্রী বলিয়া প্রতিভাত হয়। যাহা হউক বিভিন্ন দেশের পরিবার এই জন্যই বৃহত্তর সমাজের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে, ব্যাখ্যা করে এবং বহন করে।

সেই জন্য শিশুর মধ্যে সংস্কৃতির সঞ্চার করিবার কাজে পরিবার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে শিশুরা আইন-শৃঙ্খলা মানিতে, অন্যদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ও অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করিতে, কুসংসর্গ ত্যাগ করিতে, পরিবার ও দেশের প্রতি অনুগত হইতে শেখে। বিদ্যালয়ও এইরূপ শিক্ষা চালাইয়া যাইবে ইহা আশা করা হয়, তবে পরিবারেই যদি এই সব শিক্ষা সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে বিদ্যালয় বিশদ ও বিস্তৃতভাবে এই সব শিক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরীভাবে দান করিতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইয়া গেলেও শিশুর নৈতিক শিক্ষার মুখ্য দায়িত্ব পরিবারের হাতেই থাকিয়া যায়।

ব্যক্তিত্ব ও আচরণ গঠনে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব

একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী থাকিতে পারে। ভারতীয় সমাজে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বুদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নানা ধর্মীয় শ্রেণী আছে। আবার জাতিভেদের দিক থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য বর্ণ আছে। তাহা ছাড়া প্রাদেশিকতার দিক থেকে বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী ইত্যাদি জাতি আছে। আর্থিক দিক থেকে ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব শ্রেণী আছে। এইভাবে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রামবাসী, সহরবাসী ইত্যাদি নানা শ্রেণী বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বাস করে। সমাজে নানা শ্রেণী থাকিলে যেমন সমাজ বিচিত্র ও সমৃদ্ধশালী হয় তেমনি নানারকম অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য ভারত সরকার সমাজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির পরিকল্পনা করিয়াছেন।

যাহাই হউক একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টীয় ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী পরিবারের ছেলেমেয়েরা অন্য ধর্মের ছেলে-মেয়েদের থেকে কিছুটা যে পৃথক তাহা অনুভব করেই। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের শিশুরা বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবিয়া বিব্রত বোধ করে বা কিছুটা সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা উপভোগের বিষয় নয়। এইরূপ কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের ফলে নিশ্চিন্ততার ও সুখশান্তির ভাব ব্যাহত হয়। ইহার ফলে বিদ্যালয়ে সমস্যারও উদ্ভব হইতে পারে। পিতামাতারাও তাহাদের বাচ্চাদের দলবহির্ভূত হইয়া থাকা বা অবজ্ঞাত বা অসম্মানিত হইয়া থাকা পছন্দ করেন না বা ইহাতে ব্যথিত হন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যাহাতে তাহারা অন্য ধর্মের ছেলে-মেয়েদের বিদ্বেষের পাত্র না হয় এবং শান্তি ও সংহতি বজায় রাখিয়া পড়াশুনা করিতে পারে। ভারতে অবশ্য অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং এইরূপ পৃথক ব্যবস্থার আর কোন প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হয় না।

অন্য সব শ্রেণী অপেক্ষা আর্থিক-সাংস্কৃতিক বা আর্থিক-সামাজিক শ্রেণী ভেদই

শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক বলিয়া আমরা এই শ্রেণীভেদ স্বীকার করিতে চাই না বটে, কিন্তু আর্থিক-সামাজিক শ্রেণীভেদের কাঠামো যে সমাজে বর্তমান তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই ধরা পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে সে এবং তাহার বন্ধুবান্ধব সমাজের কোন্ স্তরের অন্তর্গত।

সাধারণতঃ সমাজের লোকদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি, যথা—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। সাধারণতঃ শ্রেণী যত উচ্চ হয় তাহার আর্থিক অবস্থাও তত ভাল হয়। অবশ্য অর্থই শ্রেণীর একমাত্র নির্দেশক নয়। কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক উচ্চতর শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা বেশী বিত্তশালী হইতে পারে কিন্তু একমাত্র বিত্তই তাহাকে উচ্চতর শ্রেণীর পদমর্যাদা দেয় না। কোন্ ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীতে পড়ে তাহা বোধহয় সবচেয়ে ভাল করে জানা যায় এই দেখে যে সেই ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর লোকেদের সহিত সত্যই আন্তরিকতার সহিত মেলামেশা করে ও সৌহার্দ্য স্থাপন করে।

উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা, যেমন—জমিদার, মন্ত্রী, কোটিপতি ব্যবসায়ী, বড় সরকারী চাকুরীয়া ইত্যাদি সহর বা গ্রামের শ্রেষ্ঠ বাসগৃহে বাস করেন। ইহাদের সংখ্যা খুব কম। ইহরাই অভিজাত সম্প্রদায় ও সমাজের নেতৃস্থানীয়। সমাজের সব রকম কাজকর্মে ইহাদের সমর্থন ও আনুকূল্য চাওয়া হয়। সমাজে যেসব সংস্থা ও জন প্রতিষ্ঠান থাকে সেগুলিতে তাঁহারা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইহাদের ছেলেমেয়েরা সহরের মিশনারী স্কুল ও অন্য শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করে। ইহারা নিজেদের মানসম্ভ্রম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারের অতীত ইতিহাস লইয়া গর্ব বোধ করেন এবং পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের কথা বলিতে ভালবাসেন। ইহারা সৌখিন জিনিস যেমন কারুকার্যযুক্ত জিনিষপত্র কিনিতে এবং জনকল্যাণে দান করিতে ভালবাসেন।

সমাজের মধ্য শ্রেণীতে যাঁহারা থাকেন তাঁহারাই দেশের অধিকাংশ লোক এবং তাঁহাদের জীবন দর্শনই জাতীয় জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহারা অধিকতর উন্নতির জন্য পরিশ্রম, আত্মনির্ভরতা, উদ্যম, দায়িত্ব, আর্থিক নিরাপত্তা,

ব্যবসায়, পেশা ও চাকুরীতে সাফল্যলাভ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে আত্মোন্নতি এবং নানা কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করেন। এই মধ্যম শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন করা হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই মধ্যম শ্রেণীর লোক। মধ্যম শ্রেণীর লোকেদেরই আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত লোক, ব্যবসায়ীরা এবং সরকারী চাকুরীয়ারা এই শ্রেণীরই লোক। এই শ্রেণীর উপরের দিকে যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায়ই কলেজীয় শিক্ষা পাইয়া থাকেন এবং নিচের দিকের লোকেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারেন।

উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তিদের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের জীবনের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দারিদ্র্য বেশী সহিতে হয়। ইহাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন তত দৃঢ় থাকে না। ইহাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিতে দেখা যায় এবং অপরাধ প্রবণতার প্রাবল্য থাকে।

এই নিম্ন শ্রেণীর উপরের দিকে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের কঠোর পরিশ্রম করিয়া রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করিতে হয়, অভাব-অনটন সংসারে লাগিয়াই থাকে। ইহাদের অনেকেই দক্ষ অথবা অর্ধ-দক্ষ কারিগর হন এবং ইহাদের শিক্ষা সাধারণত: নিম্ন বিদ্যালয়ের উচ্চে যায় না। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল রোজগার করিতে ও সঞ্চয় করিতে পারেন তাঁহারা নিজেদের বস্তী ত্যাগ করিয়া নিম্ন-মধ্যম শ্রেণী লোকেদের সমাজে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাঁহাদেরই একজন হইয়া যান।

নিম্ন শ্রেণীতে যাঁহারা সর্বনিম্নে থাকেন তাঁহারাই কুলি-মজুর, ঝি-চাকর, মালি-দরওয়ান এই সব কাজকর্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের জীবন দারিদ্র্য, দুঃখ ও বিষাদের। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের দয়ার উপরই ইহাদের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে এবং ইহাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খাও কিছু থাকে

না—ভাগ্যের দাস হইয়া ও সমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া তাঁহাদের বাঁচিতে হয়। ইহাদেরই 'ছোট লোক' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

নিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মারামারি করিয়া তাহাদের মতবিরোধের নিষ্পত্তি করে। অভিভাবকরা ইহাতে কোন বাধা দেন না বা ভদ্র আচরণ শেখান না। মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র সমাজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যে মনোভাব গড়িয়া উঠে এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের সেরূপ কোন ধারণা জন্মাইবার সুযোগ পায় না, ফলে চুরি ও জিনিসপত্র ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। সেইজন্য ভদ্র সমাজ অপেক্ষা এই শ্রেণীর লোকেরাই আইন ভঙ্গ বেশী করে। সামাজিক শ্রেণী যত নীচু হইতে থাকে আইন ভঙ্গ ও অপরাধের সংখ্যাও তত বেশী হইতে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা তাহাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশকে তত নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে না কিন্তু ভদ্র শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের গোড়া হইতেই তাহাদের পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টির সামনে নিজেদের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি আবেগকে দমন করিতে শিখিতে হয় এবং বিধি বহির্ভূত আচরণ করিলে লোকে কি ভাবিবে এই প্রশ্ন তাহাদের মনে সদা জাগরূক থাকে।

পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদের এক বিশেষ আদর্শ অনুসারে মানুষ করিতে চায়। তাঁহাদের মনে এক আদর্শ পুত্র বা আদর্শ কন্যার কল্পনা থাকে এবং এই কাল্পনিক আদর্শ পুত্র-কন্যার সহিত তাঁহাদের নিজেদের পুত্র-কন্যাদের তুলনা করিয়া দেখেন। আর্থিক-সামাজিক স্তর ও শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুসারে এবং শিশুপালন ও শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার মনোভাব ও মতামত অনুসারে এই আদর্শের তারতম্য হয়।

পিতামাতার শিক্ষাদীক্ষা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই শিশু তাহার নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া তোলে এবং আত্মবোধের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জগতের লোকেদের সহিত ব্যবহার করে। তাহার আচরণের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় তাহার আত্ম-ধারণা। শিশুর আচরণ যদি পিতামাতার আদর্শের সহিত মেলে তাহা হইলে তাহাকে পুরস্কৃত করা হয় নহিলে তাহার ভাগ্যে জোটে তিরস্কার।

শিশুরা প্রায়ই পিতামাতার আদর্শের কাছাকাছি যাইতে পারে না তবে তাঁহারা যাহা আশা করেন অন্ততঃ সেই দিকেই তাহাদের বিকাশ ঘটিতে থাকে।

সামাজিক শ্রেণীভেদের জ্ঞান কিভাবে শিক্ষককে সাহায্য করে

পূর্বে সামাজিক শ্রেণীগুলির সবিস্তার বর্ণনা করিবার কারণ এই যে, ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে শিক্ষক শিশুদের আচরণকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে নিম্নশ্রেণীর শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ বিদ্যালয়ে থাকে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যালয়ে আসিবার পূর্বেই শিশু তাহার পরিবারে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে তদনুযায়ীই সে তাহার মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচরণ গড়িয়া তোলে। আমরা জানি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অশিক্ষিত বস্তিজীবী লোকেদের জীবনযাত্রার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের চিন্তা ও কার্যের মধ্যেও যে পার্থক্য থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। সুতরাং এই আচরণ-পার্থক্যকে বুঝিবার জন্য দুই শ্রেণীর জীবন যাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে নৈতিক বোধের অভাব দেখা যায়। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, স্কুল পালান এই সব আচরণকে এই শ্রেণীর লোকেরা অপরাধ বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং তাঁহাদের পুত্র-কন্যারাও এই সব আচরণে স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যস্থ হইতে থাকে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে যদি কোন ছেলের মধ্যে চুরির অভ্যাস দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে এই বদভ্যাস হইতে মুক্ত করিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে চুরি করাকে কি দৃষ্টি দিয়া দেখে। পারিবারিক জীবনে সে হয়ত চুরি করাকে অপরাধ বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই। সেইজন্য তাহার কাছে চুরির অর্থ যাহা তাহা অন্য সংস্কৃতিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের অর্থ হইতে ভিন্ন। তাহার কাছে চুরির অর্থ কি জানিবার পর তাহাকে চুরি হইতে নিবৃত্ত হইতে সাহায্য করা যাইতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান শুধু যে তাহাদের আচরণ

অবস্থার উপর আলোক সম্পাত করে তাহা নহে এই জ্ঞান নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণেও সহায়তা করে। সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও টেক্সবুকগুলিতে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন যাহাতে সর্বশ্রেণীর শিশুরাই তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাহাদের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে।

তাহা ছাড়া শিক্ষার প্রতি পিতামাতার যে মনোভাব থাকে সন্তানদের ভিতরও তাহা বর্তায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া ভাবিতে শেখে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করিবে বলিয়া আশা রাখে। নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কিন্তু শিক্ষাকে এমন একটি জিনিস বলিয়া দেখে যাহাতে তাহাদের কেবল বিফল মনোরথ হইতে হইবে। শিক্ষাকাল যেন তাহাদের জীবনে একটি অপ্রীতিকর, ব্যর্থ ও নিরানন্দময় অধ্যায়। শিক্ষার মধ্য দিয়া তাহারা যে কখনও উন্নতি ও সফলতা লাভ করিতে পারিবে তাহা আশা করে না। সেইজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালক-বালিকারা শিক্ষালাভের জন্য যে প্রেরণা লাভ করে ও পরিশ্রম করে নিম্ন শ্রেণীর বালক-বালিকাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব দেখা যায়। অবশ্য ইহার যে কোন ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে। নিম্নশ্রেণীর কোন কোন মেধাবী শিশু হয়ত পরিশ্রম করিয়া শিক্ষায় অত্যাশ্চর্য ফল লাভ করিতে পারে।

নিম্নশ্রেণীর শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের আশা ও প্রয়োজন অনুসারেই আমাদের বিদ্যালয়গুলি বিশেষ করিয়া সহরের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম রচিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষরা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই শিক্ষার বিষয়গুলি বিবেচনা করেন কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেদের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া দেখেন না। সেইজন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে দেখা যায় যে ধান কাটা, বীজ বোনা ইত্যাদি মাঠের কাজের চাপ যে সময় পড়ে তখন ছেলেরা তাহাদের পিতাদের সহিত ক্ষেতের কাজে চলিয়া যায় এবং স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা করা অপেক্ষা পরিবারের ভরণ-পোষণের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ক্ষেতের কাজের জন্য বিদ্যালয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পান না।

বিদ্যালয় যখন কৃষক, কামার, কুমোরের শিশুদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না এবং যখন তাহারা বোঝে যে বিদ্যালয় তাহাদের থাকাটাকে সত্যই যে কাম্য বলিয়া মনে করে তাহা যথার্থ নহে তখন তাহারা যত তাড়াতাড়ি পারে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লয়। দেখা যায়, আর্থিক-সামাজিক অবস্থা যত নিম্ন হয় বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যাও তত কম হয়। উপস্থিতির সংখ্যার সহিত আর্থিক-সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধের তিনটি কারণ থাকিতে পারে। সন্তান কতদূর অবধি শিক্ষা লাভ করিবে তাহা নির্ভর করে তাহার পিতার আর্থিক সঙ্গতির উপর। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতা নিজেরা যতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছেন সন্তানদের ততদূর পর্যন্ত বা তদপেক্ষা কিছু বেশী শিক্ষা দিতে তাঁহারা চান। তাহা ছাড়া বন্ধু বা প্রতিবেশীরা তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের যতদূর শিক্ষা দেন প্রথা অনুযায়ী তাঁহারাও তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের অনুরূপ শিক্ষা দিতে চান। তৃতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্বন্ধে পরিবারে যে মনোভাব ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকে তাহাও পুত্র-কন্যারা কতদূর পর্যন্ত শিখিবে তাহা স্থির করে।

আর্থিক-সামাজিক অবস্থা যত ভাল হয় শিক্ষার প্রতি মনোভাবও তত অনুকূল হয়। তবে ইহাই শেষ কথা নহে, উন্নততর সামাজিক মর্যাদা ও সঙ্গতি লাভের উচ্চাকাঙ্খা শিক্ষার প্রতি মনোভাবকে আরও অনুকূল করিয়া তোলে। বরং দেখা যায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনায় তত আগ্রহ দেখায় যত দেখায় অল্পবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা। তাহারা আশা করে যে তাহারা যত উচ্চশিক্ষিত হইতে পারিবে ততই তাহাদের আর্থিক উন্নতি হইবে ও সামাজিক মর্যাদা বাড়িবে। সুতরাং আর্থিক-সামাজিক অবস্থা, উচ্চাকাঙ্খা এবং শিক্ষায় কৃতিত্ব তিনটিই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত।

নিম্নশ্রেণীর শিশুরা ব্যর্থতা এবং তজ্জনিত অবহেলার পাত্র হওয়ায় শিক্ষার

প্রতি বিমুখ হয়। ইহার উপর আবার তাহাদের পিতামাতারাও শিক্ষাকে তত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করেন না। এইসব কারণে নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পড়াশুনা তত এগোয় না। অথচ আমাদের দেশে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকই বেশী। ইহারাই কৃষক, শ্রমিক, রিক্সাচালক, ফেরীওয়ালা ও ছোট ছোট দোকানদার। শিক্ষার প্রতি ইহাদের মনোভাব অনুকূল না হইলে দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত থাকিয়া যাইবে। হইতে পারে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি তত বেশী নাই কিন্তু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে সুশিক্ষার ফলে বুদ্ধিও খানিকটা বাড়ে এবং পুরুষানুক্রমে এইরূপ বাড়িতে থাকিলে এই শ্রেণীর লোকেরাও যে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ হইতে পারিবে না তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনে এই পরিবর্তন একান্ত কাম্য।

এইদিকে লক্ষ রাখিয়াই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতি-ধর্ম সম্প্রদায়-শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে না পারিলে জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হইতে পারিবে না। শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের শিক্ষার মধ্যেই জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত নাই, দেশের মধ্যে যে অধিকাংশ জনসাধারণ আমাদের খাওয়াইতেছে, পরাইতেছে, গৃহনির্মাণ করিয়া দিতেছে, বহিরাক্রমণ হইতে বিপদমুক্ত রাখিতেছে তাহাদের তাহাদেরই কাজে আরও পটুত্ব অর্জন করিতে, কাজের বিজ্ঞানকে জানিতে, কাজকে শ্রদ্ধা করিতে এবং আপন কাজের মাধ্যমেই জ্ঞান বিজ্ঞান শিখিতে শিক্ষা দিতে হইবে। গান্ধীজী শ্রেণীর ব্যবধান এবং শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদেরও আত্মবোধ ও জীবন-দর্শনকে স্বীকার করা হয় নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও যে বিদ্যালয়ের বাঞ্ছিত ছাত্রছাত্রী এবং বিদ্যালয়ের বাহিরের সমাজেও যে তাহারা সমাদৃত এই ধারণা তাহাদের মনে জাগাইয়া দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এমনভাবে গঠিত করা হয় যাহাতে সর্বশ্রেণীর প্রয়োজন মেটে। সব শ্রেণী বিভেদের পার্থক্য

ঘুচাইয়া গড়িয়া তোলা হয় এক অখণ্ড মানবতাবোধ, যেহেতু শ্রেণী বিভেদের মনোবৃত্তি শিশুরা পিতামাতার কাছ হইতেই পায় সেইহেতু পিতামাতাদেরও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের সমাজ শিক্ষা আন্দোলনের আরও প্রচার, প্রসার ও কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রার মধ্যে ঐক্য আনিতে হইলে বিদ্যালয়েই তাহার গোড়াপত্তন হওয়া উচিত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক জীবনযাপন, সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রামীন শিল্প অভ্যাসের মাধ্যমে সাঙ্গীকৃত পাঠদান ও নানা ললিতকলা ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দরদ জন্মায়, সকলেই তাহাদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী কাজ পায় এবং তাহাদের পারিবারিক পেশারও যে সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা আছে তাহা উপলব্ধি করে। হয়ত সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাইতেছে না কিন্তু চেষ্টা ঐ দিকেই আছে।

(২) দলের মধ্যে শিক্ষার্থী

অন্যের সাহচর্যের চাহিদা।

মানুষ সামাজিক হইয়া থাকিতে ভালবাসে। অনেকক্ষণ সঙ্গীহীন অবস্থায় থাকিলে আমরা নিজেদের বড় একলা একলা মনে করি এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। এমন কি কোন নূতন দলের মধ্যে যদি অপরিচিত হইয়া থাকিতে হয় এবং কাহারও সহিত সামাজিক সংযোগ স্থাপন করা যায় না তাহা হইলে নিজেকে বড় খালি খালি মনে হয়। একাকীকত্ব মনে একটি অভাব বোধ জাগায় এবং নিজেকে নগণ্য বলিয়া বোধ হয়—এই অবস্থা বেশ পীড়াদায়ক। এই অপূর্ণতাবোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই মানুষ অপরের সঙ্গ খুঁজে, অন্যের সহিত কথাবার্তা কহিয়া আনন্দ পায়। অন্যের সাহচর্য পাইলেই আমরা আবার মনে-প্রাণে হৃষ্ট হইয়া উঠি—পূর্বের শূন্যতা ও অপূর্ণতা দূর হইয়া যায়।

একাকীকত্বের বেদনা একপ্রকার উৎকণ্ঠারই সামিল। অন্যদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার উৎকণ্ঠা। সমাজের সহিত আমাদের সত্তা এতই ওতপ্রোত হইয়া আছে যে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা যেন কেহ নহি এরূপ বোধ জাগিয়া উঠিতে থাকে এবং তাহাতে আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি। এই উৎকণ্ঠা প্রতিপন্ন করে যে আমাদের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের জন্য সমাজ জীবন কতটা অপরিহার্য। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে থাকিলে আমরা আত্মস্থ হইতে পারি এবং তাহাদের অভাবে আমাদের আত্মহানি হয়।

অতি শৈশব অবস্থা থেকেই অন্যের সঙ্গ মানুষ কামনা করে। দোলনায় শিশু শুইয়া থাকিলেও সে তাহার মা বা অন্য কাহারও সান্নিধ্য চায়—কেহ কাছে না থাকিলে ক্রন্দন করে। সে যাহাদের সংস্পর্শে থাকে বিশেষ করিয়া তাহার মার ভাবান্তরে তাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হয়—মার বিহ্বলতায় সেও বিহ্বল হইয়া পড়ে। শিশু তাহার বিকাশকালে অর্থাৎ শৈশব ও কৈশোরে অন্যরাও তাহার সম্বন্ধে কি ভাবে ইহার উপর তাহার আত্ম ধারণা গড়িয়া তোলে—অন্যদের দৃষ্টির মধ্য দিয়া সে নিজেকে জানিতে থাকে। বাল্য ও কৈশোরে পিতামাতার মতামত অপেক্ষা সমবয়সী সঙ্গী-সাথীদের মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাহাদের অভিরুচি অনুযায়ী নিজেকে চালাইবার চেষ্টা করে এবং তাহার সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাকে নির্বিবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখে যে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে ধারণার মিল নাই এবং ইহার ফলে সে এখন হইতে তাহার সম্বন্ধে অন্যের মতামতকে সে নিজের সম্বন্ধে যাহা সত্যই জানে তাহার সহিত যাচাইয়া দেখিতে চায় এবং এইভাবে একটি বাস্তব আত্মবোধ গড়িয়া তুলিতে থাকে। অপরের মতামত নিরপেক্ষভাবে নিজের সত্যিকার আত্মস্বরূপকে চিনিয়া লইতে তিরিশ, চল্লিশ অথবা তাহা অপেক্ষা আরও বেশী সময় লাগিতে পারে। কেহ কেহ সারাজীবনেও নিজের সত্যিকারের আত্মস্বরূপটিকে

বুঝিবার মত মানসিক পরিপক্কতা লাভ করে না। তাহারা সারাজীবনই পিতামাতা, অভিভাবক, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

দলভুক্ত হইয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়াও অন্য লোকেদের সহিত সংযোগ আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় এই তিনটি জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন এবং বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের অন্যদের উপর নির্ভর করিতে হয়। সভ্য সমাজ জীবন যতই জটিল হইতে থাকে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরনির্ভরশীলতা ততই বাড়িতে থাকে। সকলের মিলিত সহযোগীতার উপরই আমাদের জীবনচর্যা নির্ভর করে। তবে এই সব প্রয়োজন নৈর্বাক্তিকভাবে মিটান যায়। ডাল, ভাত, তরিতরকারী আমরা যাহা খাই তাহা যাহারা উৎপাদন করে, যে বাড়ীতে আমরা থাকি তাহা যে রাজমিস্ত্রী মজুর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে, যে কাপড় পরি তাহা যে তাঁতী বা কলের শ্রমিকেরা বুনিয়া দিয়াছে তাহাদের সহিত আমাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা আমাদের সম্বন্ধে কি অনুভব করে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ধারণা থাকে না। উন্নত সভ্য দেশে অর্থনৈতিক শ্রম বিভাগের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বা ভাবের আদান-প্রদানের স্থান নাই—ইহা নৈর্বাক্তিক। কিন্তু অন্ন বস্ত্র আবাস এবং বিপদ হইতে রক্ষারূপ একান্তভাবে দৈহিক প্রয়োজন ছাড়াও আমাদের অন্য প্রয়োজনও আছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালবাসা পাওয়ার এবং পদমর্যাদা পাওয়ার ইচ্ছা নৈর্বাক্তিক-ভাবে পূরণ হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই আমাদের প্রতি অন্যদের সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রীতিমধুর মনোভাব ও ব্যবহার এবং তাহাদের প্রতিও আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রীতিমধুর মনোভাব ও ব্যবহার। জগতের বেশীর ভাগ অনর্থ ও অশান্তি সমাদর ও সম্মান না পাওয়ার ব্যর্থতার পরোক্ষ বা অপরোক্ষ পরিণাম। ইহা ছাড়া মানুষ সৃষ্টিধর্মী। তাহার সৃজন অন্যেরা সমাদর করুক ইহাই সে চায়। সুতরাং এইসব প্রয়োজন মিটাইতে হইলে অপরের সংস্রব অপরিহার্য।

শিশুদের ক্রমবিকাশশীল আত্মনির্ভরতা।

শিশু যত বড় হইতে থাকে ততই সে আত্মনির্ভর হইতে চায়। কচি অবস্থায় খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য শিশুকে সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশু হিসাবে সে অল্প পরিমাণে আত্মনির্ভর হইতে পারে। এই সময় সে তাহার ক্ষুদ্র অথচ জঠিল জগৎটির সঙ্গে কারবার করিবার জন্য যে জ্ঞান ও কৌশল লাগে তাহা সে তাহার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকেই শেখে। ইহার পর যতই সে বাড়িতে থাকে ততই তাহার লব্ধ জ্ঞান ও পটুত্বের সাহায্যে আরও বেশী করিয়া স্বাবলম্বী হইতে থাকে।

অধিকাংশ শিশুদের পক্ষে বিদ্যালয়ে আগমন গৃহ হইতে বহিজগতে আসার একটি দীর্ঘ পদক্ষেপ স্বরূপ মনে হয়। পরিবারের অনেক বন্ধন এই সময় হইতে শিথিল হইতে থাকে। দিনের অনেকটা সময় এখন সে পরিবারের লোকজন হইতে ভিন্ন বয়স্ক লোকেদের তত্ত্বাবধানে থাকে। শুধু তাই নয় সে এখন প্রায় তাহারই সমআকৃতি, সমবয়সী ও সমশ্রেণীর সঙ্গী-সাথীদের সমাজের একজন হইয়া যায়। এই সাথীর দল তাহার একটি ক্রমবর্ধমান বড় প্রয়োজন মেটায়। এই দলের মধ্যে থেকে সে তাহার যোগ্যতার পরিচয় লাভ করে এবং দল তাহাকে কতটা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছে তাহা বুঝিতে পারে। সে দেখে এই দল বয়স্কদের দল হইতে ভিন্ন। পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা তাহার আচরণের যে আদর্শ ঠিক করিয়া দেয় তাহার নাগাল সে পায় না কিন্তু শিশু সমাজের আচরণে অনায়াসেই রপ্ত হইতে পারে। আট বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েরা আট বৎসর বয়সী অন্য ছেলেমেয়েদের কাছ হইতে আট বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েদের যাহা সাধ্য তাহাই করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। সেইজন্য বয়স্কদের সমাজের চেয়ে শিশুরা সমবয়সী শিশুদের সমাজে থাকিতেই আরাম বোধ করে।

নিজের অপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা, তাঁহাদের নির্দেশে চলা—এক কথায় বলা যায় তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা—এই চাহিদাকে বলা যায় শিশু সুলভ চাহিদা। সেইজন্য ইহা আশা করা যায় যে শিশুরা যত বড় হইতে থাকে সেবা-যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্দেশের প্রয়োজন তাহাদের তত কম হইতে থাকে। শিশুদের অত্যধিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহাদের নির্ভরশীল করিয়া রাখা এবং যে যুক্তি ও চিন্তা তাহারা করিতে সমর্থ তাহা তাহাদের করিয়া দেওয়ার প্রবণতা পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে দেখা যায়। ছোটবেলা থেকে শিশুদের নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার ফলে তাহারা বড় হইতে থাকিলেও তাহাদের উপর হইতে কর্তৃত্বের রাস ছাড়িয়া দিতে মন চায় না। ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়াই শিশুরা নানা জিনিস শিখিতে পারে সুতরাং একটু ভুল করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিয়া বড়দের উচিত শিশুরা তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় যাহাতে তাহাদের ভুল সংশোধন করিতে পারে তাহাতে সাহায্য করা। শিশুরা তাহাদের নিজেদের শিক্ষা যতদূর সম্ভব নিজেরাই করুক—এই বিষয়ে তাহাদের স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা অপেক্ষা অনিচ্ছাই বড়দের বেশী মধ্যে দেখা যায়। প্রাক্ কৈশোর ও কৈশোর কালে এই স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে প্রবল থাকে এবং শিক্ষা লইয়া যে সকল তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার মূলে থাকে শিক্ষক-শিক্ষিকার বালক-বালিকাদের শিক্ষার স্বাধীনতা দিবার অনিচ্ছা। সেইজন্য শিশুদের শিক্ষার সুযোগ যদি দিতে হয় এবং বাল্য ও কৈশোরের কতিপয় আচরণ সমস্যার যদি নিরসন করিতে হয় তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং পদ্ধতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশুদের দলীয় জীবন।

শিশুরা তাহাদের সঙ্গীদের সহিত যেমন যেমন ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে তাহা একটি ধারা ধরিয়া চলে এবং এই ধারার ক্রমটি তাহাদের খেলার মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমে শিশুদের খেলা অনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যহীন

থাকে—নিছক চঞ্চলতা ও গতিই এখনকার খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার পর শিশু অন্য শিশুদের খেলা নিরীক্ষণ করে কিন্তু নিজে সে খেলায় যোগদান করিতে পারে না। আর একটু বয়স বাড়িলে সে একা একা স্বাধীনভাবে খেলা করে। ইহার পর শিশু অন্য শিশুদের সান্নিধ্যে খেলা করে কিন্তু তাহাদের সহিত খেলা করে না—অর্থাৎ এইরূপ খেলায় সামাজিক আদান প্রদান হয় না। আরও একটু বয়স বাড়িলে সে সঙ্গীদের খেলায় বেশী করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে। একই রকমের খেলায় এখন সকলে যোগ দেয় এবং এক অপরকে অনুকরণ করে। ইহার পর শিশুরা প্রকৃত সহযোগিতা-মূলক খেলা করিতে সক্ষম হয়। এই সময় সত্যকারের খেলার দল তাহারা গড়িতে পারে এবং প্রত্যেক শিশু নিজেকে দলের একজন বলিয়া মনে করিতে পারে। এখন তাহারা দল বাঁধিয়া একসাথে নানাপ্রকার খেলা যেমন বল খেলা, কানামাছি ইত্যাদি খেলে, মাটির পুতুল বানায় এবং রাজা-রাণী, রেলগাড়ী ইত্যাদি অভিনয় মূলক খেলা খেলে। উপরে খেলার যে স্তরগুলির কথা বলা হইল তাহারা যে ঠিক পর পর শিশুর জীবনে আসে ও চলিয়া যায় তাহা নহে। দুই বা ততোধিক স্তর একই সঙ্গে থাকিতে পারে, তবে ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একা একা খেলা হইতে দলগত খেলা শিশুরা বেশী পছন্দ করে। তিন বৎসরেরও কম বয়সী শিশুরা একা একা বা অন্যের সান্নিধ্যে খেলে বা অপরের খেলা নিরীক্ষণ করে। চার বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুরা যদিও অন্যের সান্নিধ্যে খেলে তবে অন্যদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এবং দলের সহিত সহযোগিতা করিয়া খেলিতে বেশী উৎসুক হয়।

প্রাক্‌বিদ্যালয়ের শিশুরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া থাকে। দলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার তাহাদের তেমন গরজ দেখা যায় না। কখনও কখনও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া খেলে বটে কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

যেহেতু প্রাক্‌বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে দলীয় মনোভাব প্রবল থাকে না সেই হেতু তাহারা দলীয় আচার ব্যবহারের কোন আদর্শ নিজেরা ঠিক করিতে

পারে না। বড়রা তাহাদের আচরণের যে মাপকাঠি ঠিক করিয়া দেন তাহারা তাহাই মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। সুসংবদ্ধ দল না হওয়ায় তাহাদের দল হিসাবে পরিচালনা করাও অনায়াস সাধ্য হয় না। শিশুর দল না বলিয়া তাহাদের শিশু সমাবেশ বলিলেই ঠিক বলা হয়।

কোন ব্যক্তি অপরদের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়া চলে তাহা দেখিয়া তাহার প্রক্ষোভিক ও সামাজিক জীবনের বিকাশ ও পরিণমন কতদূর হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। খুব অল্পবয়স্ক শিশুরা তাহাদের হাবভাবে আত্মকেন্দ্রিকতাই প্রকাশ করে এবং অন্যদের সম্বন্ধে তাহারাও ওটুকুই আগ্রহ দেখায় যতটুকু অন্যেরা তাহাদের কাজে আসে বা সুখ বাড়ায়। পিতামাতার সহিত ছোট শিশুর যে সম্পর্ক তাহাতে সে তাহাদের কাছ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, আদর যত্ন ও স্নেহ ভালবাসা পাইতে চায়। এই সময় অপরদের কাছ থেকে শুধু লইতেই চায়, দিবার কোন প্রেরণা তাহার মধ্যে থাকে না।

খেলার সময়ও তাহার আত্মসর্বস্বতা প্রকাশ পায়। অন্যের খেলনা সে কাড়িয়া লইতে চায় কিন্তু নিজের খেলনা সে অন্যকে খেলিতে দিতে চায় না। বড়রা শিক্ষা দিলে পরে সে অবশ্য সাথীদের সহিত তাহার খেলনা ভাগ বাটোয়ারা করিয়া খেলিতে এবং নিজের পালা আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতে শেখে। এইরূপ আচরণের পরিবর্তন অবশ্য একাধিক কারণে ঘটিতে পারে। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সে এইরূপ আচরণ মানিয়া লইতে পারে। পিতামাতা তাহার স্বার্থপরতাকে অপছন্দ করিতেছে ইহা অনুভব করিলে শিশু তাহাদের ভালবাসা হারাইবার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। এই অবস্থা ঘটিতে না দিবার জন্যও হয়ত সে পিতামাতার অনুমোদিত সামাজিক আচরণ অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলিবার আন্তরিক বাসনাও এইরূপ সামাজিক আচরণের হেতু হইতে পারে। কারণগুলি পৃথকভাবে না ঘটিয়া সবগুলিই একসময়ই ঘটিতে পারে। তবে প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশু যে প্রধানতঃ আত্মসুখ বিলাসী এবং গ্রহণকারী তাহা বলিলে ভুল বলা হয় না। অন্যদের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি তাহার আগ্রহ জন্মাইলেও

তাহার স্থায়ীত্ব ও পরিমাণ খুব কম থাকে। বদান্যতা ও দাক্ষিণ্যের মত মনের অবস্থা তাহার তখনও হয় না তবে শিক্ষার ফলে এইভাবের অঙ্কুর তাহার মনে জন্মান যাইতে পারে।

বালক বালিকাদের দলীয় জীবন।

বালক বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে থাকে তখন তাহাদের এক বা একাধিক সাথীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মায়—ইহারাই তাহাদের প্রাণের বন্ধু হয়। অপরের সাথে খেলা করা এবং নিজের মনের ভাবের আদান প্রদান করিবার প্রেরণা আসিলে শিশু সামাজিক বিকাশের এই স্তরে আসিয়া পৌছায়। প্রাণের বন্ধুরা নিজেদের সুখ দুঃখানুভূতি ও কল্পনা, ভাবনা যাহা কিছু তাহাদের মনের কথা তাহা পরস্পরকে বলে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া তাহারা পরস্পরের বন্ধুত্বকে বিশেষ-ভাবে উপভোগ করে এবং তাহাদের আবেগময় জীবনে পরস্পরের প্রতি গভীর আত্মীয়তা স্থাপিত হয়।

বালক-বালিকারা এখন আর একা একা খেলিতে, অন্যদের খেলা দর্শক হিসাবে নিরীক্ষণ করিতে বা বয়স্কদের সহিত বেশীক্ষণ থাকিতে চায় না। বাড়ীর বাহিরে যে জগৎ আছে তাহারই অনুসন্ধানে তাহারা উৎসুক হইয়া উঠে এবং মনের মত বন্ধুর সহিত যদি নূতন নূতন জিনিস খুঁজিয়া বাহির করা যায় তাহা হইলে তাহার মত মজা আর কি আছে !

দুই তিন জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া বড় দলের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাহারা এখন বোধ করে না। অবশ্য বিদ্যালয়ে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বড় দলের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকে। বালক বা বালিকা দেখে যে শিক্ষক শ্রেণী পাঠের সময় তাহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন না, শ্রেণীর সকল ছেলেমেয়েকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, শ্রেণীকে তিনি একটি দল হিসাবে গণ্য করেন এবং তাহাদের এমন দলগত কাজকর্ম দেন যাহাতে দলের প্রত্যেককেই অপরের সহিত সহযোগিতা করিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য করিয়া করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় পরস্পরের সহিত ভাব ও কাজের

আদান প্রদান এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কেমন মনে হয় তাহা বালক-বালিকারা উপলব্ধি করিতে থাকে। অবশ্য ৫ থেকে ৮ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা বড় দলের সহিত সম্পর্ক বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এখনও তাহারা দুই তিন জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যই কামনা করে এবং তাহাদের সহিত একত্রে খেলিতে ও কাজ করিতেই আরাম বোধ করে। মনের মত দুই বা তিন বন্ধু যখন খেলা করে তখন বাহিরের কেহ তাহাদের দলে ঢুকিতে চাহিলে তাহারা ঘোর আপত্তি জানায়। সামাজিক বিকাশের পথে ইহা একটি স্বাভাবিক পর্যায় এবং এখন বাহিরের কাহাকেও এই ছোট্ট বন্ধু গোষ্ঠীর মধ্যে জোর করিয়া না ঢুকানই ভাল। এই বয়সে শিশু অন্য শিশুদের ভাল করিয়া চিনিয়া বুঝিয়া লইতে চায়। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বড় দলে সক্রিয় ও সফলভাবে দলের একজন হইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়।

এইরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কয়েক মাস ও কয়েক বৎসর স্থায়ী হইতে পারে, সময়-সময় সারাজীবনও স্থায়ী হয়। ইহা ছাড়া অবস্থা বিশেষে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবেও ঘনিষ্ঠতা ঘটিতে পারে। এই বয়সে খেলার সঙ্গী পাইবার আকাঙ্খা শিশুর মধ্যে প্রবল থাকে। সঙ্গী-সাথী না পাইলে শিশু বিমর্ষ হইয়া পড়ে, আবার খেলার সাথীরূপে কাহাকেও পাইলে বা কোন দলে মিশিতে পারিলে প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। কচি অবস্থায় পিতামাতার স্নেহ হারাইবার ভয়ই শিশুর সবচেয়ে বেশী থাকে আর বাল্যে সাথীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে সে উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়। উদ্বেগ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে বলিয়াই বালক-বালিকার মনোভাব ও আচরণের উপর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমবয়সীদের দলের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

দেখা গিয়াছে যে শিশু যদি তাহার নিজ পরিবারের আসক্তি হইতে তাহার সমবয়সীদের দলে কিছুটা একাত্মতা বোধ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মানসিক পরিপক্কতা বেশী হইতে থাকে। এই সময় সাধারণতঃ বালক ও

বালিকাদের দল সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। দলের মধ্যে থাকিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরের সমর্থন ও সান্ত্বনা লাভ করে।

কৈশোরে দলীয় জীবন।

কৈশোরে পিতামাতারা তাহাকে কি চক্ষে দেখিতেছে এ বিষয়ে শিশু বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। বালক অপেক্ষা বালিকাদের বোধ এ বিষয়ে বেশী তীক্ষ্ণ হয়। তবে পিতামাতার প্রতি তাহাদের কিরূপ মনোভাব তাহা তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। এই সময় তাহারা সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা পাইতে চায় এবং দলের মধ্যে জনপ্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বেশী রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে এখন আর তাহারা থাকিতে চায় না, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার ইচ্ছা জাগে এবং বড়দের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি পাইতে চায়।

এই সময় বন্ধু-বান্ধব লইয়া দলের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী হয়। বালক-বালিকাদের মনোভাব ও কার্যের উপর দলের একনায়কত্ব বিরাজ করে। অনেক সময় দলের শাসন উৎপীড়ন স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহা হইলেও দলের শাসনের কাছে অনেক কিশোর কিশোরীকেই নতি স্বীকার করিতে হয়। বয়স বাড়িলে এই আনুগত্য ও নির্ভরশীলতা তাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারে এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শিখে এবং নিজেদের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে পারে, কৈশোরের অনেক কথা বড়রা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহারা দলের আদর্শ অনুসারে যে সব কাজ করে তাহা বড়দের কাছে অযৌক্তিক বা বোকামী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বড়রা ভুলিয়া যান যে এই সময় দলের মানদণ্ডের বিরুদ্ধে যাওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ দলের চিন্তাভাবনার সীমারেখার মধ্যে তাহারা বন্দী হইয়া থাকে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দীত্ব স্বাভাবিকভাবেই ঘুচিয়া যায় এবং প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা লাভ করে। তবে একথাও সত্য যে অনেক কিশোর কিশোরী পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলেও এই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না এবং

দলনিরপেক্ষভাবে চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম করিতে পারে না। বয়স পরিণত হইলেও সামাজিক, বৌদ্ধিক এবং প্রক্ষোভিক পরিণতী তাহাদের হয় না।

দল কর্তৃক গৃহীত ও পরিত্যক্ত হওয়ার উপর বালক-বালিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে আবার শিক্ষাকার্যে তাহারা কতটা সাড়া দেবে তাহা নির্ভর করে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। দেখা গিয়াছে যাহাদের মধ্যে বন্ধুসুলভ মনোভাব আছে, অন্যদের কাছে জনপ্রিয় হইতে পারে, যাহারা প্রফুল্ল ও সুখী এবং প্রিয়দর্শন এবং হাস্যকৌতুক উপভোগ করিতে পারে তাহারা পড়াশুনায় বেশ উন্নতি করে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (১৩-১৬ পৃঃ) শিশুর সামাজিক সম্পর্ক জানার যে কৌশলের (Sociogram) কথা বলা হইয়াছে ঐরূপ পদ্ধতিতে দলের প্রত্যেক বালক বালিকা সঙ্গীদের কাছে কতটা জনপ্রিয়, সমাদৃত বা বাঞ্ছিত তাহার একটি ছবি পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে জানা গিয়াছে যে দশ এগার বৎসর বয়স হইলেও কোন কোন বালক-বালিকা অন্যদের সহিত মেলামেশা করিতে পারে না। অন্যদের অবলোকন করা ছাড়া সক্রিয়তা ও সহৃদয়তার সহিত সাথীদের কাজকর্ম খেলাধূলার সহিত নিজেদের মিলাইয়া লইতে পারে না—এইদিক দিয়া তাহাদের প্রক্ষোভিক ও সামাজিক পরিপক্কতা আসে না। অবশ্য এই অপরিপক্কতা নানা প্রকারের হইতে পারে যাহা শুধু Sociogram দেখিয়া বোঝা যায় না। হয়ত শিশু এত দুঃসহ ভাবে লাজুক যে সে দলের মধ্যে নিজেকে বেচপ মনে করে এবং সেইজন্য দলে যোগ দিতে পারে না। তাহাছাড়া সাথীরা কাহাকেও অপছন্দ করে বলিয়া দলে লয় না বা এমনি উপেক্ষা করিয়া চলে তাহাও Sociogramএ বোঝা যায় না। সাধারণতঃ অনেকগুলি কারণের জন্য শিশু দল ছাড়া হইয়া পড়ে। তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, লাজুকতা এবং নিজেকে গুটাইয়া লইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। দলে থাকিয়া যে ছেলে বা মেয়ে এইরূপ অস্বচ্ছন্দতা বোধ করে তাহার সম্বন্ধে সাথীরা আর বেশী মাথা ঘামায় না।

যে শিশু দলের একজন হইতে পারে না দেখা যায় গৃহে এবং বিদ্যালয়ে সে প্রক্ষোভজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে, পড়াশুনায় পিছাইয়া থাকে এবং তাড়াতাড়ি স্কুল ছাড়িয়া দেয়। নিম্ন সামাজিক আর্থিক শ্রেণী হইতেই এইরূপ শিশুর আসিবার সম্ভাবনা বেশী। অপরপক্ষে যে শিশু দলের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারে লেখাপড়ায় সে যথেষ্ট পটুত্ব দেখায়, বেশী বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয় এবং প্রক্ষোভজনিত সমস্যা তাহার খুব কম থাকে। এইরূপ শিশু উচ্চ সামাজিক স্তর হইতেই সাধারণতঃ আসে।

আচরণের উপর সামাজিক রীতি রেওয়াজের প্রভাব।

শিশু যতই তাহার বাল্য, প্রাক্ কৈশোর ও কৈশোর অবস্থার মধ্য দিয়া বড় হইতে থাকে ততই তাহার উপর তাহার দলের প্রভাব বেশী করিয়া পড়িতে থাকে। দলের মধ্যে কতকগুলি রীতিনীতি ও মনোভাবের উদ্ভব হয়—এইগুলি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। দলের মধ্যে যাহারা থাকে তাহারা বুঝিতেই পারে না যে তাহারা দলের শাসন কতদূর মানিয়া চলিতেছে বা দলের প্রভাব তাহাদের উপর কতদূর পড়িতেছে। দলও অন্যপক্ষে বুঝিতে পারে না যে তাহা কতকগুলি রীতি-রেওয়াজের প্রবর্তন স্বতঃই করিতেছে। দলের অনুগত হইয়া যতদিন চলা যায় ততদিন দলের প্রভাব টের পাওয়া যায় না কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে যাহা দলের আনুগত্য স্বীকারে বাধা ঘটায় তাহা তখন দলের প্রভাব প্রকট হইয়া উঠে।

এগার বার বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি কেহ কিছু অন্যায় করিয়া ফেলে তাহা হইলে দলের নিয়মানুসারে কেহ তাহা বড়দের বলিয়া দেয় না। শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে বোর্ডে কেহ যদি কোন তামাশার ছবি আঁকিয়া রাখে, তাহা হইলে শিক্ষিকা শ্রেণীতে পুনরাগমন করিলে শ্রেণীর কেহই একথা তাঁহাকে বলিয়া দিবে না—বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও চাপিয়া যাইবে। শিক্ষিকা যদি এই কাজ লক্ষ্য না করেন তাহা হইলে দলের প্রভাব ছাত্র ছাত্রীদের উপর অজ্ঞাতসারেই কাজ করিবে।

কিন্তু যদি তিনি ছবিটি লক্ষ্য করেন এবং ইহা কে করিল জিজ্ঞাসা করেন তখন সকলেই দলের আইন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। এখানে অপরাধী কে বলিয়া দেওয়া মানে দলের আইন অমান্য করা এবং বলিয়া দিবার ইচ্ছা কাহারও হইলেও তাঁহাকে ইহা পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। শিক্ষিকার প্রিয়পাত্র হওয়া অপেক্ষা দলের সমর্থন তাহার কাছে অধিকতর কাম্য হইয়া উঠে।

দল যে আইন ও রীতি-রেওয়াজ সৃষ্টি করে তাহা মানিয়া চলিলে দলের সঙ্গে একাত্মবোধ জন্মে এবং দলভুক্তির বোধ অটুট থাকে। দলের নিয়ম দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে রক্ষা করে। উপরে ইহারই দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। দলের নিয়ম না মানিলে অমান্যকারী দলের কাছে উপহাসের পাত্র হয় এমনকি তাহাকে নানাভাবে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেও ছাড়ে না এবং তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রেণীর সহিত শিক্ষকের সম্পর্ক।

অনেক সময় শ্রেণী পরিচালনায় শিক্ষক অসুবিধা বোধ করেন। তাঁহাকে একথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে একজন শিশুকে লইয়া যেভাবে কাজ করিয়া ফল পাওয়া যায় সমগ্র শ্রেণীর সহিত কাজ করিবার সময় সে পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না। শ্রেণীর মধ্যে দলবদ্ধ ভাব জন্মান দরকার কেননা সম্বন্ধহীন শিশু সমষ্টি লইয়া কাজ করিলে তাহা তত কার্যকরী হয় না। শ্রেণী যদি সুসংবদ্ধ দল হইয়া গড়িয়া উঠে তাহা হইলে সুদক্ষ শিক্ষক শিখন ক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমুখী ও সফল করিয়া তুলিতে পারেন। অবশ্য দলের মনোবৃত্তি বুঝিয়া তাহাকে লক্ষ্যের দিকে চালনা করা গভীর উপলব্ধি এবং সম্যক নৈপুণ্যের কাজ। প্রায়ই শ্রেণী শিক্ষকের কথা শুনিতে চায় না এবং শ্রেণীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। এই অমান্যের কাজে তাহারা শিক্ষককে বা কোনরূপ শাস্তিকে ভয় করে না কারণ তাহাদের কাজে দলের থাকে সমর্থন এবং ফলভোগে থাকে সান্ত্বনা। শিক্ষককে বুঝিতে হইবে ব্যক্তিগত সম্পর্কে যে শিশু তাঁহার কাছে নম্র ও ধীর থাকে, দলের মধ্যে সে-ই হইয়া উঠিতে পারে অশান্ত ও অশিষ্ট, যে শিশু নিভৃতে তাঁহার কাছে

খোলাখুলিভাবে কথা কয় সে-ই দলের মধ্যে পড়িয়া নির্বাক হইয়া যাইতে পারে।

সেইজন্য শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষার্থী—শিক্ষক সম্পর্কের কথা চিন্তা করিয়া দলের নিজস্ব অস্তিত্বের কথা ভোলা শিক্ষকের পক্ষে মারাত্মক ভুল হইবে। শিশুর জীবন বিকাশে দলের সহিত সম্পর্কিত হওয়া একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পর্যায় এবং তাহার দলভুক্তির চাহিদাকে তৃপ্তি দিতে পারিলে শিক্ষার কাজ সহজতর ও সফলতর হয়। শিক্ষক শিশুদের এই চাহিদার সুযোগ লইয়া শ্রেণী সংগঠন ও পরিচালনা করিবেন; এই শ্রেণীকে শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবেন। দলের বিরুদ্ধে না গিয়া দলের সহিত কিরূপে কাজ করিতে হয় তাহা শিক্ষককে শিখিতেই হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে দলের আইন ও রীতি-রেওয়াজ শিশুদের মনোভাব ও বিশ্বাসের কিরূপ অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। বড়দের উপদেশ ও মতামত অপেক্ষা দলের প্রভাব তাহাদের উপর প্রবলতর থাকে। এই কথা স্মরণ করিলে শিক্ষক দলের সহিত সহযোগিতার সহিত কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবেন।

বালক বালিকারা যাহাতে তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে, বিশ্লেষণ করিতে, মূল্যায়ণ করিতে ও উন্নতি করিতে পারে সে বিষয়ে সাহায্যদান শিক্ষার একটি ব্যাপক লক্ষ্য। সেইজন্য তাহারা যাহাতে নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে অন্বেষণ ও আলোচনা করিবার সুযোগ পায় তাহার বন্দোবস্ত শিক্ষক করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে দল তাহার নিজের রীতি-রেওয়াজ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। যদি শিক্ষক তাহাদের নিজস্ব রীতি রেওয়াজ মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলেন এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহাদের কাছ হইতে আরও উপযুক্ত উন্নত আচরণ আশা করা যায়। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বালক বালিকারা তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক

পরিবেশ, হাতের কাজ, এবং সাথীদের সহিত সহযোগীতা ও প্রতিযোগীতার সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত ও কার্যকে সজ্ঞানভাবে বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় এবং ইহার ফলে তাহারা তাহাদের কাজের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বুঝিতে পারে এবং এই উপলব্ধির ফলে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের আচরণ সংশোধন করিয়া লয়। নূতন বিশ্বাস নূতন মত লইয়া তাহারা তাহাদের দল পুনর্গঠন করে এবং শিক্ষক যে সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার প্রয়াসী তাহার গোড়াপত্তন হইয়া যায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ও সানন্দে। এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি জোর করিয়া তাঁহার মত বিশ্বাস তাহাদের উপর চাপাইতে চাহিতেন বা তাঁহার ঈপ্সিত পথে তাহাদের আচরণকে বাধ্যতামূলকভাবে ভয়প্রদর্শনের দ্বারা লইয়া যাইতে চাহিতেন তাহা হইলে ফল হইত উল্টা। ইহার ফলে দলের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হইত এবং শিক্ষক অনতিক্রমনীয় বাধার সম্মুখীন হইতেন—বিদ্রোহী মনোভাব ও অবাধ্যতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিরন্তন নাটক অভিনীত হইত। এক্ষেত্রে শাস্তির কঠোরতা যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ পঙ্গু হইয়া যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে নানা সামাজিক অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইতে পারে।

দলের উত্তম সম্বন্ধ গঠনে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা।

শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের সহিত যোগাযোগ যত ভাল ও কার্যকরী হইবে ততই ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথক ব্যক্তি হিসাবে এবং দলের একজন সদস্য হিসাবে তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে সত্যিকারের উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবে। শিক্ষকের সহিত ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরে যাহাতে তাহারা পরামর্শ করিতে পারে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে এবং কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে জানিয়া লইতে, নিজেদের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। বড়রা ভাবেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাদের কথা শিশুদের বোঝাইতে পারেন তাহা হইলেই শিশুদের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের সন্তোষজনক

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শিশুরা যাহা বলে তাহা বড়রা বুঝিতে পারেন কিনা সেদিকে—তাঁহারা লক্ষ্য করেন না—ইহার প্রায়োজনীয়তাকে তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। তাহা ছাড়া শিক্ষকের সহিত শিশুদের ভাবের আদান-প্রদান যে পরিমাণে প্রয়োজন সেই পরিমাণেই প্রয়োজন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের। সেই কারণে শ্রেণীতে শিক্ষক যদি শুধু নিজে নিজেই বকিয়া যান তাহা হইলে শ্রেণীর সহিত ও শ্রেণীর মধ্যে সত্যকারের যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। ভাবের আদান-প্রদান যদি সত্যই কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরস্পরের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া উচিত—নিজের কিছু কথা বলা ও অন্যের কথা শোনা। যে শিক্ষক কিছুই শুনিতে চান না তিনি কখনও শিক্ষার্থীদের সহিত সম্যকভাবে যোগ স্থাপন করিতে পারেন না। ভাবের আদান-প্রদান আবার শুধু যে কথায় হয় তাহা নহে। হাবভাবে, হাসি বিরক্তির দ্বারা, অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা এবং আরও অন্যান্য উপায়ে আমরা আমাদের অনুভূতি ও মনোভাব প্রকাশ করি। কোন বিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষণে গিয়া কথাবার্তা না বলিয়াও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের মনোভাব এবং শিশুদের প্রতি বিদ্যালয়ের মনোভাব কিরূপ তাহা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের চাল-চলন দেখিয়া বোঝা যায়।

সংহতি।

যে শ্রেণীতে শিশুরা শিক্ষকের সহিত এবং সহপাঠীদের মধ্যে পরস্পরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে তাহারা যে একই দলের মধ্যে বাস করিতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। তাহারা একই সঙ্গে কাজ করিয়া, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং খেলাধূলা করিয়া উপকৃত বোধ করে ও সন্তোষ লাভ করে। ইহার ফলে তাহারা দলের মধ্যেই থাকিতে চায়। এই যে দলের মধ্যে একজন হইয়া থাকিবার ইচ্ছা ইহাই দলের সংহতির বন্ধন রজ্জু ও প্রাণ। সংহতির মধ্যে দলের প্রতি আনুগত্যের বাসনা এবং দলের গর্বে গর্ববোধ নিহিত থাকে।

মনোবল।

যে দলের মধ্যে সংহতি বিরাজ করে এবং নব উদ্যম ও আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরপূর থাকে সে দলের মনোবলও হয় স্থায়ী ও অটুট। ছাত্র-ছাত্রীদল, শ্রমিকদল বা সৈন্যদল সব দল সম্বন্ধেই একথা সত্য। মনোবল যেখানে সুখও সেখানে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈনিকদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা আছে; শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের খেলাধূলা সংগঠন করিতে, অভিনয় করিতে, উৎসব করিতে সাহায্য করেন। এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে বা কাজ করিতে করিতে যে একঘেয়েমী আসিয়া যায় বা যেসব দলগত জীবনের বিরক্তিকর সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবে মনোবল শুধু বিনোদনের মনোবৃত্তিতেই যে প্রকাশিত হয় তাহা নহে। মনোবল দলের ঐক্যবোধ বাড়াইয়া দেয়, নেতৃত্বকে স্বীকার করে এবং প্রয়োজন হইলে অসীম উদ্যম, দুর্জয় সাহস এবং অপূর্ব আত্মত্যাগ দেখাইতে পারে।

মনোবল থাকা মানে আশাবাদী হওয়া। যে দলে মনোবল আছে তাহাদের মনে সাফল্যলাভের সুনিশ্চিত বিশ্বাস থাকে, দলের অভীষ্ট ফললাভ হইবেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা তাহাদের থাকে। ঈপ্সিত ফললাভ দলের কোন একজনের ব্যক্তিগত বিষয় হইতে পারে। বাংলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া পড়ে তবে দলের মধ্যে যদি মনোবল বিরাজ করে তাহা হইলে সে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকে কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানিয়াছে কোন বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারিলে পরিণামে তাহা আয়ত্ত করা যায়। তাহা ছাড়া শিক্ষক ও দলের মধ্যে একজন হওয়ায় সে শিক্ষকের কাছ থেকে কঠিন কঠিন জায়গায় সাহায্য পাইবার আশা করে। তাহার শিখিবার কালে ভুল করিলে সঙ্গী-সাথীরা উপহাস করিবে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকে। দলগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও মনোবলের বিশেষ প্রয়োজন। নেফা ও লাদাকে চীন আক্রমণকারীদের সহিত ভারতের যে যুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে পুরোভাগে যে সব জোয়ান

সৈনিকদল ছিলেন তাঁহার মধ্যে কোন কোন দল মূল সৈন্যবাহিনী হইতে শত্রুদের চক্রান্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কিন্তু এইসব সৈনিক নিজেদের অসহায় ভাবিয়া ভীত না হইয়া অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাণ বিসর্জনও দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অদম্য শৌর্য আসিয়াছিল তাঁহাদের প্রবল মনোবল হইতে। এই বিশ্বাসে তাঁহারা অটল ছিলেন যে দেশের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতেছেন এবং নিজেরা এই মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করিয়া দেশবাসীর কাছে সাহস ও আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন। যদি এই মহান ভাবে তাঁহাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া না থাকিত এবং পরিণামে ভারতে জয় যে অবশ্যম্ভাবী এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিত, যদি তাঁহারা মনে করিতেন যে যুদ্ধে আমাদের পতন ঘটিতেছে এবং এখন আর সংগ্রাম চালাইয়া কোন ফল নাই তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন না, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিতেন।

সন্তোষজনক দলগত কাজকর্মের ভিতর দিয়াই সম্যকভাবে চিন্তা ভাবনার আদান-প্রদান, সংহতি ও মনোবল গড়িয়া উঠে আবার চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান, সংহতি ও মনোবল থাকিলে দলগত কাজকর্ম সন্তোষজনক ও সার্থক হইয়া উঠে—ইহাদের পৃথক করিয়া ভাবা যায় না। যোগাযোগ, সংহতি ও মনোবল ইহারা দলের মধ্যে সম্মিলিতভাবে বিরাজ করিলে দলগত কাজও শেখা হইয়া উঠে মধুর ও তৃপ্তিদায়ক। অপর পক্ষে দল যদি তাহাদের কাজকর্মে নিরুৎসাহ বা বিরক্তি বোধ করে বা নিস্পৃহ হইয়া উঠে, শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষককে যোগাযোগ, সংহতি ও মনোবল জন্মাইতে হইবে। এইরূপ শ্রেণীর দলই শিখনের কাজে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রেণীর মানসিক আবহাওয়া।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি কিরূপে গৃহের স্নেহাদর বা অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের আবহাওয়া শিশুর আচরণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয় এবং শ্রেণীর মধ্যেও নানাপ্রকার মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তনে আমাদের মনের অবস্থা

বিভিন্ন হয়। সূর্য-কিরণ-হীন মেঘলা দিনে আমাদের মন বিষণ্ণ ও নিস্তেজ হইয়া যায় আবার শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রবিকরস্পর্শে, মেঘ-শূন্য-নীলাকাশের দ্যুতিতে আমাদের মন উৎসাহ ও প্রফুল্লতায় ভরিয়া যায়। অনুরূপভাবে শ্রেণীরও মানসিক আবহাওয়া থাকে এবং সেই আবহাওয়া অনুযায়ী দলের আচরণ গড়িয়া উঠে। যদি কেহ কোন শ্রেণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে এক এক শিক্ষকের অধীনে ছাত্রছাত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচরণ করে ও মনোভাব দেখায়, যেন প্রতিটি শিক্ষকের উপস্থিতি শ্রেণীতে একটি নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। কোন শিক্ষক শ্রেণীতে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ শ্রেণীর সকলে অস্থির হইয়া উঠে ও ছটফট করে আবার কাহারও উপস্থিতিতে শ্রেণীতে কিছু গোলমাল হয় বটে কিন্তু উৎসাহের বন্যা বহিয়া যায় এবং ছেলেমেয়েরা নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতে থাকে এবং অন্য কোন শিক্ষকের সামনে দমিত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর আবহাওয়া পূর্ণ হইয়া উঠে নীতিমূলক ও বিরূপ সমালোচনার মনোভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষ-ত্রুটির চুলচেরা বিচার করা হয় এবং তাহাদের চোখের সামনে সেগুলি ফলাইয়া ফলাইয়া দেখান হয়। অন্য শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সব কাজকেই মর্যাদা দেওয়া হয় এবং একটি হৃষ্টচিত্ততার ভাব বিরাজ করে। মনে হয় যেন কেহই ভুলভ্রান্তি করে না অর্থাৎ ভুলভ্রান্তিকে অত বড় করিয়া দেখান হয় না এবং তাহার জন্য বিষণ্ণ হইবার কিছু থাকে না। পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়া শ্রেণী সানন্দে সহজ স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকে। কোন কোন সময় হয়ত মনে হইতে পারে যে এইরূপ শিখনের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায় কিন্তু পরিণামে ইহা শুভ ফলদায়কই হইয়া উঠে। আবার অন্য কোন শ্রেণীর আবহাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ধনুকের ছিলার মত তীব্র ভাবে টানিয়া রাখে। এরূপ শ্রেণীতে শিক্ষক যেন সৈন্যদলের সর্দারের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সামরিক নির্ভুলতার সহিত কাজ করাইতে বাধ্য করান, মনে হয় যেন সব জিনিষই ঘড়ির কাটা ধরিয়া বাঁধা আছে।

দলের সকলের ব্যক্তিত্বের সম্মেলনের ফলেই আবহাওয়ার উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য শিক্ষকই প্রধানতঃ দায়ী থাকেন। ইহার কারণ এই প্রভাবোৎপাদন আবহাওয়া সৃষ্টির মূল ক্ষমতাগুলিই শিক্ষকের হাতে থাকে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত করিতে পারেন। তিনি এমনভাবে বাধ্যবাধকতার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন যাহা অলঙ্ঘনীয় বা যাহা প্রয়োজন হইলে পরিবর্তন করা যাইবে অথবা এ বিষয়ে কোন নিয়মই তিনি প্রবর্তন না করিতে পারেন। শিক্ষকের কাছ থেকে আঁচ লইয়াই শ্রেণীতে ভাবান্তর সঞ্জাত হয়।

আবহাওয়া সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য হইলেও একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে এ বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা ও দায়ীত্ব সীমাহীন। শ্রেণীর পক্ষে কিরূপ আবহাওয়া উপযোগী বা কিরূপ আবহাওয়ায় তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের তৃপ্তি সেই ভাবে আবহাওয়া সৃষ্টির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শিক্ষকের হাতে নাই। অন্যান্য শক্তিতে ইহার মধ্যে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বিদ্যালয়ে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিক্ষককে তাহার খেয়াল খুশী মত চলিতে দেয় না। বিদ্যালয়ের মূলনীতি ও পরিচালন ব্যবস্থা যদি গণতন্ত্রভিত্তিক হয় তাহা হইলে শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে না। অপরপক্ষে বিদ্যালয় যদি শুধু বড়দের কড়া শাসনে ও নির্দেশে চলে তাহা হইলে শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ার ফল।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে কিরূপ দলীয় মনোভাব ও আচরণ শ্রেণীর শিখনের কাজে সাহায্য করে। কি কি অবস্থা ও কারণের ফলে এরূপ মনোভাব ও আচরণ গড়িয়া উঠে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব কি কারণে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটে এবং দলগত অনুভূতি সৃষ্টি হয় না।

শিক্ষক যদি শ্রেণীকে একটি গোটা দল হিসাবে না দেখিয়া শুধু মাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সমাবেশ বলিয়া দেখেন এবং সেইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহিত ব্যবহার করেন তাহা হইলে দলের সংহতি-বোধ গড়িয়া উঠে না। তাহা ছাড়া কোন কোন শিক্ষক ইচ্ছা করিয়াই দলীয় মনোভাব গঠন করিতে দেন না। তাঁহারা এমন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন যাহাতে যাহারা পরস্পরের বন্ধু তাহারা একত্রে কাজ করিবার সুযোগ পায় না, একজনকে আর একজনের দোষ ধরিবার কাজে লাগাইয়া দেন এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে প্ররোচিত করেন। শ্রেণীর মধ্যে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হইলে দলের পরস্পরের সহিত মধুর সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া যায়। আজকালকার সভ্য জগতে প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেজন্য শ্রেণী হইতে এই ভাবকে দূর করা খুবই কঠিন। অবশ্য প্রতিযোগিতার পদ্ধতি যদি ঠিকমত ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অনেক শিক্ষার্থীই শিখনের কার্যে প্রণোদিত হইতে পারে। তবে যদি ইহাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য যেমন সহযোগিতার সহিত কাজ করা, ব্যর্থ হইয়া যায় এবং দলীয় চেতনা ও মনোবল নষ্ট হইয়া যায়।

প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিলে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। আর প্রতিযোগিতার উত্তেজনা একবার আস্বাদন করিতে পারিলে সহযোগিতার মনোভাব নীরস হইয়া যায়। প্রতিযোগিতায় এইরূপ মাতিয়া উঠিলে তাহা নানা অশুভ পরিণামের কারক হইতে পারে।

সকলের আগ্রহ আছে এমন কাজ, সমস্যা বা পরিকল্পনা সমাধান বা সম্পন্ন করিতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার সামর্থ্যকেই সহযোগিতা বলা যায়। সহযোগিতার মধ্যে অংশীদারত্বের ও সমতার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু কোন কোন পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সহযোগিতা কথাটিকে 'বাধ্যতা' বা 'মান্য করা'র সমার্থবোধক বলিয়া ধরিয়া লন। এইরূপ ভাবনায় দলের সকলের অংশীদারত্ব ও সমতার ধারণা থাকে না। সহযোগিতার সহিত

কাজ করিতে গেলে যেসব কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় প্রতিযোগিতায় সেগুলি অর্জন করা যায় না এবং ব্যবহারও করা যায় না।

সহযোগিতা, নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি দলের কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলে কিন্তু ব্যক্তিগত পুরস্কার ও সম্মানের জন্য প্রচেষ্টায় দলের সংহতি ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক কমিয়া যায় এবং দলের কাজ সুচারুরূপে হয় না।

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় প্রতিযোগীতার উগ্ররূপ আমরা সর্বত্র দেখি, এইজন্য শিশুদের প্রতিযোগিতা করিতে শিখাইবার জন্য বেশ চাপ দেওয়া হয়। সেজন্য প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা ঠিক করা এক জটিল সমস্যা। গৃহ হইতেই প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। শিশু তাহার ভাই বোনদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে বিদ্যালয়ে আসিবার আগেই শিখিয়া আসে। বিদ্যালয়েও প্রতিযোগিতার আবহাওয়া বজায় থাকে। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করা, কোন কাজে বিশেষ সম্মান লাভ করা, পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদি প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি খুবই প্রতিযোগিতা মূলক। তবে বিদ্যালয়ের বাহিরের জীবনে যতটা প্রতিযোগিতা বর্তমান আছে তদপেক্ষা বেশী প্রতিযোগিতার ব্যবহার বিদ্যালয়ে প্রচলন করা কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাহা ছাড়া সফলতার সহিত জীবন যাপন করিতে হইলে প্রতিযোগিতায় যে সকল দক্ষতা ও নৈপুণ্য লাগে তদপেক্ষা সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে যে সকল দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন হয় তাহার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রতিযোগিতার যে সকল মারাত্মক অভিব্যক্তি আজ জগতের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান তাহাতে মনে হয় এই জগৎকে যদি বাঁচিয়াই থাকিতে হয় তাহা হইলে আমাদের সফল ও কার্যকরীভাবে সহযোগিতার সহিত কাজ করিতেই হইবে।

প্রতিযোগিতার উপর বেশী জোর দিলে স্বভাবতই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুলনা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যে শিশুর লেখাপড়া সাধারণ থেকে বেশী উন্নত হয় না সে যেহেতু শ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে না সেই হেতু তাহার যোগ্যতা যে নিম্নস্তরের-সেই বিষয়ে তাহাকে

অবহিত করাইয়া তোলা হয়। যে শিশুর বৌদ্ধিক শক্তি সীমায়িত সে তাহার সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করে কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় কখনও সফল হইতে পারিবে না বলিয়া তাহাকে শিক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করা হয়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে জয় করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রথম হওয়া এই সবই চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, ইহার নীচে যাহা কিছু তাহা অসাফল্যেরই সমান বলিয়া গণ্য করা হয়। শিশুর জীবন বিকাশের মূল চাহিদাগুলি নানা জিনিস শিখিবার মধ্য দিয়া মিটিতে থাকে কিন্তু প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না তখন শিক্ষা কেবল হারজিতের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ শিশুকেই অসাফল্যের গ্লানি বহণ করিতে হয় কারণ উচ্চ সম্মান মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই লাভ করিতে পারে।

কুসংস্কার।

পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অন্য বয়স্ক লোক ও সঙ্গীসাথীদের কাছ হইতে ভাল মন্দ দুই-ই শেখে। কোন সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম কাজ ইত্যাদির প্রতি তাঁহারা অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব দেখান তাহা হইলে শিশুও ক্রমে ক্রমে বিশেষ করিয়া কৈশোরে তাহা শিখিয়া লয় এবং সেও অনুরূপ চিন্তা ও আচরণ করে। বিশেষ করিয়া কৈশোরে তাহার নবোন্মেষিত চাহিদাগুলির সন্তোষজনক পূরণ না হইলে তাহার আক্রোশ এইসব ধর্ম, জাতি, কাজ, সম্প্রদায়ের উপর গিয়া পড়ে।

শিশু যদি নিম্ন আর্থিক সামাজিক স্তরভুক্ত হয় এবং পিতামাতা যদি সেজন্য আক্ষেপ করেন তাহা হইলে শিশু নিজেকে অসম্মানিত ও হীন ভাবে। তাহার আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা ব্যহত হয়। এইরূপ মনোভাবের দুইটি ফল ফলিতে দেখা যায়। এইরূপ শিশুরা, হয় নিস্পৃহ, একান্ত অনুগত ও অযোগ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের সুপ্ত সম্ভবনাগুলি তাহাদের কাজকর্মে প্রকাশিত হইয়া উঠে না, নয়, আক্রোশ পরায়ণ, বিদ্রোহী ও আক্রোমনোদ্যত হইয়া উঠে। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এই দুই অবস্থার কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। তাহা ছাড়া ইহাতে দলের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন ও কার্যকরী শিক্ষাও

গুরুতররূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার উচ্চ আর্থিক সামাজিক স্তরের শিশুদের মধ্যেও বড়দের প্রভাবে তাহাদের দল, সম্প্রদায়, জাতি ধর্ম, ইত্যাদি সম্পর্কে অহঙ্কার উপজাত হইতে পারে এবং তাহাদের হইতে ভিন্ন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় সম্পর্কে তাহারা উন্নাসিক মনোভাব পোষণ এবং আচরণেও তাহা প্রদর্শন করিতে থাকে। শিক্ষার বৃহত্তর লক্ষ্যের মধ্যে আছে নিজেকে ও অন্যদের বুঝিতে পারা, নিজের জন্য চিন্তা করিতে শেখা, অপরের সহিত সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্য-বোধ জন্মান। কিন্তু বালক বালিকার মনোযোগ ও শক্তি যদি অন্য দলভূক্ত বা সম্প্রদায়ভূক্ত শিশুদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ উৎপন্ন ও প্রদর্শন করিতে নিযুক্ত থাকে এবং তাহাদের জীবনাদর্শ যদি গোড়াতেই একপেশে হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে উক্ত শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছান সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। কুসংস্কার নানাভাবে কার্যকরী শিক্ষার উপর আঘাত হানে এবং ইহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই কথা বিবেচনা করিলে বিদ্যালয় এইরূপ কুসংস্কারের বিপদকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে চিন্তা হইয়া পড়ে জড়, অনড়, চিন্তা তাহার স্বচ্ছন্দগতি হারাইয়া ফেলে এবং একই নির্দিষ্ট খাতে চলিতে থাকে এবং সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে।

যে কুসংস্কারের বীজ সুকুমার মতি বালক বালিকাদের মধ্যে উপ্ত হয় তাহা শুধু শৈশবেই তাহার বিষময় ক্রিয়া করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিণত বয়সেও শৈশবে ও বাল্যে শেখা কুসংস্কার থাকিয়া যায়। ইহার ফলে দেশের নানা বৃহৎ বৃহৎ দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান ব্যহত হয়, সহযোগিতার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং অপরাধ ও দুষ্ক্রিয় আচরণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয় অবশ্য ইচ্ছা করিলেই শিশুদের মন হইতে কুসংস্কারকে কমাইয়া দিতে বা দূরীভূত করিতে পারে তাহা নহে। ইহা একটি অতীব দুরূহ সমস্যা কারণ কুসংস্কার জীবনের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া যায় যে তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে গেলে সমস্ত জীবনের উপরই

টান পড়ে। কেহ একেবারে কুসংস্কারমুক্ত তাহা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। তবে এইরূপ কুসংস্কার যাহাতে জন্মাইতে না পারে অথবা ইহার তীব্রতাকে যতটা কমাইতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে হইতে পারে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের প্রক্ষোভিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে তাহাতেই এই কার্য সাধিত হইতে পারে। শিশুরা যদি শ্রেণীতে স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছন্দে পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে পারে, তাহাদের যদি পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে শেখান হয়, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে যদি তাহারা কাজ করিতে ও খেলিতে পায় এবং তাহাদের সামর্থানুসারে নিজেদের বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিবার স্বাধীনতা ও সাহায্য পায় তাহা হইলে কুসংস্কার সঞ্জাত ঘৃণা, আক্রোশ এবং উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং এই বিষয়ে সত্যিকারের উন্নতি দেখা দিবে।

সংঘ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান

শিক্ষার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের সাধন।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং নানারূপ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের মূল লক্ষ্যগুলিই শিক্ষার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য। বিচারমূলক ও সংগঠনমূলক চিন্তা করিবার শক্তি, আত্ম নিয়ন্ত্রণ, অন্যদের সহিত সহযোগিতার সহিত ও কার্যকরী ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা এবং নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—এইসব মূল শিক্ষাদর্শের দৃষ্টান্ত। অনেক শিক্ষায়তনে এই সকল সামর্থ্যগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শীতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জিত হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

পূর্বে শ্রেণীতে পাঠদান করা হইত বটে কিন্তু শ্রেণীকে একটি সুসংহত দল হিসাবে গণ্য করা হইত না। শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দেখিতেন, ফলে দল হিসাবে শ্রেণী আশানুরূপ উদ্বুদ্ধ হইত না এবং শিক্ষার কাজও সন্তোষজনক হইত না। বহুবৎসর ধরিয়া গবেষণা করিয়া শিক্ষা

মনোবিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে দলের মধ্যে কতকগুলি রীতি-রেওয়াজ ও আদর্শ উৎপন্ন হয়। এইসব রীতি-রেওয়াজ, বিশ্বাস ও আদর্শের প্রভাবে দলের লোকেদের মনোভাব গঠিত হয় এবং দলের এই মনোভাবের উপরই নির্ভর করে শ্রেণীর শিক্ষায় আগ্রহ সঞ্চার। শ্রেণীতে যে শিক্ষার কাজ চলিতে থাকে তাহা যদি শ্রেণীদল তাহাদের যোগ্য কাজ বলিয়া এবং আকর্ষণীয় বলিয়া মানিয়া লয় তাহা হইলে শ্রেণীর প্রত্যেকের মনোভাব শিক্ষার কাজে আগ্রহ সৃষ্টির অনুকূলে যায় এবং প্রত্যেকেই তাহাদের সাধ্যমত শিখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দলের রীতি যদি এই হইয়া পড়ে যে শিক্ষার কাজকে তাহারা বিরূপ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করে ও সে বিষয়ে নিস্পৃহতা দেখায় তাহা হইলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শিক্ষা দিবার প্রত্যেক প্রয়াসকে বাধা দিবার প্রবণতা জন্মায়। শিক্ষার মুখ্য ও গৌণ লক্ষ্যের দিকে শ্রেণী কতটা অগ্রসর হইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে দলীয় প্রথা ও আদর্শ দলের ব্যক্তিদের কি পরিমাণে শ্রেণীর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে অনুমোদন করিবে ও উৎসাহিত করিবে। বস্তুত অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে দলের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মনোভাব দল-রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। দল কি করিবে, কি বিশ্বাস করিবে এবং কি আচরণ করিবে যদি দলের সকলে স্বাধীনভাবে স্থির করিয়া লয় তাহা হইলে দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য আরও জোরদার হয়।

শ্রেণীতে সঙ্ঘ সম্পর্ক।

অবশ্য শ্রেণীদলকে শিক্ষা গ্রহণের অনুকূল করিয়া মনোভাব গঠন করিতে সাহায্য করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ কার্য নহে। এই সঙ্ঘ পদ্ধতিগুলি নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সম্যকভাবে ইহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণীর সকলকে তাঁহার মতামতের সহিত সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাইতে সক্ষম হন না। সেইজন্য শিক্ষককে এই সব সঙ্ঘ পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং যাহা যে কাজের জন্য উপযোগী তাহা বাছিয়া লইতে হইবে।

যাহা হউক, সত্য পদ্ধতির মূল কথাগুলি মনে রাখিয়া আমরা কতকগুলি ঐরূপ পদ্ধতির আলোচনা করিব। শ্রেণীর মধ্যে শিশুদের পরস্পরের ভিতর যেরূপ সম্পর্ক থাকে তাহার প্রভাব তাহারা যাহা কিছু শিখে তাহার উপর পড়ে। শ্রেণী সমাজে শিশুকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা সে অনুভব করে এবং ইহারই ফলে শিক্ষার প্রতি তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব গড়িয়া উঠে। শিখনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিশুদের অনুভূতিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং সেইভাবে কাজের, পড়ার ও খেলার দল গঠন করিতে হইবে এবং শিশুর ব্যক্তিগত কাজও কি হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে।

শিশুদের মধ্যে প্রাত্যহিক যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে তাহার দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন দিন শিশু হয়ত নেতৃত্ব গ্রহণ করে, কোন দিন বা কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে; একদিন যাহাকে সে ভালবাসে অন্যদিন হয়ত তাহার প্রতি সহানুভূতি হারাইয়া ফেলে; দলের নিয়মে সে করিবে বা না করিবে তাহা কিরূপে স্থির করে এসমস্তই শিক্ষককে সূক্ষ্মভাবে সমীক্ষণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া শ্রেণীতে যে শিশু-সমাজের গঠন বড়দের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে Sociometry পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষককে তাহা জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা তিনি জানিতে পারিবেন যে শ্রেণীর বড় দলের মধ্যে ছোট ছোট দল থাকে। এই দলগুলি পারস্পরিক প্রয়োজন, একত্র অবস্থান, আগ্রহের মিল ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠে। শিক্ষককে এমন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে এইসব ছোট ছোট দলগুলির কাজের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করা যায়।

প্রত্যেক শিশু যদি দলের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ আছে তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে সাহায্য পায় তাহা হইলে দলের মধ্যে সফলভাবে ও সুখী হইয়া থাকিবার নৈপুণ্য লাভ করিতে থাকে। নেতৃত্বের

ও সদস্যর কাজ, দলের কাজ কি কি কারণে অগ্রসর হইতে পারে, ব্যহত হইতে পারে এবং সমস্যা আসিলে কিভাবে সমাধান করিতে হয় এই সব বিষয়ের আলোচনা অতীব প্রয়োজন।

শুধু শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সঙ্ঘ জীবনের সম্বন্ধই নয় বিদ্যালয়ের বাহিরে শিশুরা যেসব দল বা সমচক্রর অন্তর্ভূক্ত তাহা তাহাদের পরিষ্কার-ভাবে বলিয়া দিতে হইবে।

উপরের এই কথাগুলি মনে রাখিয়া আমরা এখন সঙ্ঘ পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের যে নূতন ভূমিকা তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

সঙ্ঘকে সহায়তা দান।

সর্বপ্রকার সঙ্ঘপদ্ধতিতে দলের প্রত্যেককে দলের একজন হিসাবে নানাবিধ সহায়তা দান করাই প্রধান কাজ। শিক্ষার যেসব পূর্ব বর্ণিত বৃহত্তর লক্ষ্য আছে সেগুলি সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ সহায়তা দান করা হয়।

এইরূপ সহায়তা দান নানাভাবে দেওয়া যায়। দলের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিয়া কিরূপে সফলভাবে জীবনযাপন করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের সাহায্য করিতে পারেন। শিশুরা নিজেদের অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, দলের অন্তর্ভূক্ত হইয়া তাহারা অন্যদের সহিত তাহাদের মিল যাহাতে আবিষ্কার করিতে প্যারে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। অন্যের প্রদত্ত যুক্তি ও প্রমাণ বিবেচনা করিয়া কিভাবে সুসিদ্ধান্তে আসিতে হয় শিশুরা সহায়তা পাইলে শিখিবে। প্রক্ষোভিক সমস্যা সম্পন্ন শিশুরা অনেক সময় দলের পরিবেশে উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তাহাদের সমস্যার সমাধান করিতে পারে। দলের মধ্যে মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়িয়া তুলিতে সেগুলি বুঝিতে এবং সেগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার যথেষ্ট সুযোগ শিশুদের দিতে হইবে। দলের সকলের সহিত নিজেদের সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলে তাহারা উপকৃত হয়। শিক্ষকও শিশুদের আরও ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পান।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ জানাইতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ও উহার কার্যক্রমের প্রতি মনকে তৈয়ার করিয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়া তাহারা যাহাতে তাহাদের শিক্ষার এবং পরবর্তীকালে তাহাদের জীবিকার জন্য প্রস্তুতির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের উপযুক্ত সংবাদ পরিবেশন করিতে হইবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনে হইতে পারে যে এগুলি বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত নয় সুতরাং উহারা বিদ্যালয়ের মূখ্য কাজও নয়। নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া ও বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনের কাজেই বিদ্যালয়কে প্রধানতঃ নিযুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু দেখা গিয়াছে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও নানা বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ কার্যকরিভাবে ঘটে না যদি না সজ্ঘ-পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়। সেইজন্য শ্রেণীর সর্ব-প্রকার কাজকর্মের ভিত্তিতে এইগুলি থাকে। সেইজন্য বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সর্ব পর্যায়ে শিক্ষার বৃহত্তর ও মূল উদ্দেশ্যগুলি মানিয়া লইতে হইবে এবং পাঠ-পরিকল্পনা ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হইবে। এই নূতন উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রবর্তন করেন।

শ্রেণীতে আলোচনা

সজ্ঘপদ্ধতিগুলির মধ্যে শ্রেণী-আলোচনা একটি মূল পদ্ধতি। শিখন প্রক্রিয়ার এই পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা একত্র করিতে পারে। একজনের চেষ্টায় যে সমস্যার সমাধান সম্ভব হইত না সকলে মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে তাহার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা যায়। তাহা ছাড়া কোন বিষয়ে এইভাবে তাহারা সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিতে পারে বা কি করিবে বা না করিবে তাহা মিলিতভাবে স্থির করিতে পারে। নিজের চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করিবার আকাঙ্খাও এই পদ্ধতির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে। এইরূপ মিলিত আলোচনার ফলে যোগাযোগের রাস্তা খুলিয়া যায় এবং শিক্ষার কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীদল সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার ও সমর্থন করিতে পারে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগাযোগের পথ বন্ধ

থাকে এবং অনেক সময়ই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধীতা শিক্ষার্থীদের কাছ হইতে আসে। কিন্তু দল যদি বিচার করিয়া কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তাহা হইলে কোন সদস্যের পক্ষে তাহার বিরোধীতা করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার ফল দেখা যায় শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তনের মধ্যে। মনোভাবের পরিবর্তন সব পরিবর্তনের মূল। শ্রেণী-আলোচনায় অভীষ্টপথে মনোভাবের পরিবর্তন যতটা হয় গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহা সম্ভব হয় না।

দলের মধ্যে সকলে যদি পরস্পরের সহিত আলোচনার সুযোগ পায় তাহা হইলে শিখন শিক্ষক কেন্দ্রিক না হইয়া সঙ্ঘ কেন্দ্রিক হয়। আলোচনা সঙ্ঘ-কেন্দ্রিক হইলে দলের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত চিন্তা ও অনুভূতির যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ে এবং সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। এইরূপ অবস্থায় দলের সংহতি ও মনোবলের সঞ্চার হয় এবং শ্রেণীতে শিখনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

আলোচনার ধরণ কয়েক প্রকারের হইতে পারে। নিজে কেবল বক্তৃতা না দিয়া কিছুটা পড়ানর পর ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং তাহাদের প্রশ্নগুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন। ইহার চেয়ে আলোচনা আরও বেশী কার্যকরী হয় যদি তাহারা নিজেরাই শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তবে এই দুই প্রকারেই শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষককেই বেশী কথা বলিতে হয়। বেশীর ভাগ আলোচনাই ইহার থেকে আর বেশী দূর অগ্রসর হয় না কারণ শিক্ষকরা নিজেরা কথা বলিতে পারিলে আরাম বোধ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে এত অভ্যস্থ হইয়া যায় যে তাহারা শিক্ষককেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতে এবং পড়ানর দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে চায়। আলোচনাকে অধিকতররূপে কার্যকরী করিয়া তুলিবার কৌশল না জানা থাকার দরুণ শিক্ষক শ্রেণীকে ইহার অপেক্ষা বেশীদূর লইয়া যাইতে পারেন না।

আলোচনাকে শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিবার জন্য যখন কোন শিক্ষার্থী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে তখন শিক্ষক তখনই তাহার উত্তর

নিজে না দিয়া শ্রেণীর কেহ ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় কিনা জিজ্ঞসা করিতে পারেন। শিক্ষক যদিও শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উপর কিছু কথা বলেন তাহা হইলেও শ্রেণীর অন্য ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে কি চিন্তা করে তাহা জানিতে চাহিতে পারেন। তিনি শিক্ষার্থীর দ্বারা উত্থাপিত কোন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে পারেন যে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের মত আছে, ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানে কি না।

আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ ও সক্রিয় করিবার জন্য শিক্ষক নেতার ভূমিকা হইতে কিছু পরিমাণে সরিয়া আসিতে পারেন। আলোচনা চলিবার কালে ছাত্রছাত্রীরা যেসব প্রয়োজনীয় বিষয় বলিবে তিনি সেগুলি ব্লাকবোর্ডে যদি লিখিতে থাকেন তাহা হইলে এক উপায়ে দুই কার্য সিদ্ধ হয়। প্রকাশ্য নেতৃত্ব থেকে তিনি খানিকটা অন্তরালে আসিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের কথা বোর্ডে লেখা হইতেছে দেখিয়া তাহাদের কথাও যে শিক্ষক গ্রহণ করিয়াছেন ইহা উপলব্ধি করে। তিনি কোন ছাত্র বা ছাত্রীকেও আলোচনা চক্রের নেতা করিয়া দিয়া নিজে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ভুল কথা বলে বা শিক্ষক যাহা যথার্থ বলিয়া মনে করেন তাহার সহিত তাহাদের কথা মেলে না তখন শিক্ষকের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা খুবই কঠিন। কিন্তু তিনি যদি বার বার তাহাদের কথার প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিবার যে স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া তিনি সৃষ্টি করিতে চান তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। শিক্ষকের কাছ হইতে বাধা পাইলে তাহারা আর আলোচনায় যোগ দিতে চায় না। ছাত্র-ছাত্রীরা ভুল কথা বলিলে শিক্ষক ইহার মন্দ ফল সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কিন্তু যদি একটু ধৈর্য ধরেন তাহা হইলে দেখিবেন কোন না কোন ছাত্র অনতিবিলম্বে এই ভুলটি ধরাইয়া দিবে। শিক্ষকের অপেক্ষা নিজেদের পরস্পরের সমালোচনা স্বীকার করিয়া লওয়া শিশুদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়। সেইজন্য মতবিরোধ ও দোষ ধরিবার ভার তাদের উপর থাকাই ভাল। তবে শিক্ষক যদি দেখেন

যে সত্য সত্যই কোন ভুল ধারণা সংশোধন হইল না এবং তাহারা ভুলটাই শিখিয়া যাইবে তাহা হইলে ঐ বিষয়টি তিনি মনে রাখিবেন এবং পরে যখন তিনি আলোচনার সারাংশ বলিবেন বা লিখিবেন তখন ঐ বিষয়ের যথার্থ ধারণাও দিয়া দিবেন। এইরূপ করিবার ফলে ভুলটি আর কোন ব্যক্তি বিশেষের থাকে না সমস্ত আলোচনার একটি অঙ্গ হইয়া যায়। তবে এই কার্যও তাঁহাকে সাবধানতা ও সহানুভূতির সহিত করিতে হইবে নচেৎ শিক্ষক এত যত্নে যে শিক্ষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই শিক্ষণপরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা অনুভব করে যে তাহাদের চিন্তা ও ধারণা সমর্থিত, অনুমোদিত হয় এবং সেজন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলি প্রকাশ করে। শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে এইরূপ পরিস্থিতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপ পদ্ধতির একটি সুবিধা এই যে ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পরের কাছ হইতে শিখিতে পারে শুধু শিক্ষকের কাছ হইতে নহে। দেখা গিয়াছে সঙ্ঘপদ্ধতিতে আলোচনা ও কাজ করিতে পাইলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তার বিনিময় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা ও সমালোচনা গতানুগতিক পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশী করিতে পারে।

প্রচলিত শ্রেণী বিন্যাসকে পরিবর্তন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যদি এমনভাবে বসান যায় যাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় তাহা হইলে আলোচনার সাফল্যের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের চতুষ্কোণ বা গোল করিয়া বসান যাইতে পারে। কাহারও পিছনে থাকিয়া কথা বলিলে বা যে কথা বলিতেছে তাহার মুখ দেখা না গেলে আলোচনা জমে না কারণ এইরূপ অবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে সকলে নিরুৎসাহ বোধ করে।

আলোচনা পরিচালনা করা সত্যই কঠিন কাজ তবে এই কাজে পারদর্শীতা অর্জন করার সার্থকতা আছে। আলোচনা ঠিক মত পরিচালিত হইলে ইহা শ্রেণীতে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, বিদ্যালয় ও শিখনের প্রতি অনুকূল মনোভাব

গড়িয়া তোলে এবং এইরূপ শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা ও অনুভূতিকে উপলব্ধি করিতে পারেন। স্বচ্ছন্দ ও কার্যকরী আলোচনার কৌশল উদ্ভাবন করিবার জন্য শিক্ষককে বেশ কিছু কাল ধরিয়া সম্ভবত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়া শিশুদের বয়স ও অন্যান্য দিকের সমতা থাকিলেও একই পদ্ধতি সব রকম দলের জন্য খাটে না—এদিক দিয়াও পদ্ধতিগুলির যাচাই করিবার দরকার আছে। বয়স ভেদে পদ্ধতির পার্থক্য অবশ্যই হয়। খুব ছোট ছোট শিশুরা অন্যের কথা শুনা অপেক্ষা নিজের কথা বলিতেই বেশী পছন্দ করে। তাহা হইলেও নিম্নতর শ্রেণীগুলিতেও আলোচনা পদ্ধতি চলিতে পারে কেন না অন্যদের কথা শুনিতে শেখাও সামাজিক বিকাশের একটি অঙ্গ।

শ্রেণীর সকলের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে যাহা থাকে সেইরূপ বিষয় দিলে সকলে তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ছেলেমেয়েরা সকলেই যদি ক্ষেতের কাজ দেখিয়া আসে বা স্থানীয় ষ্টেশনে বা অন্য কোন জায়গায় বেড়াইয়া আসে, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্লানেটোরিয়াম দেখিয়া আসে, কোন টেপরেকর্ডের কথা বা গান শোনে বা চলচ্চিত্র দেখে তাহা হইলে পরবর্তী শ্রেণী আলোচনায় তাহারা যাহা দেখিয়াছে ও অনুভব করিয়াছে তাহা একত্র করিতে এবং মিলাইয়া দেখিতে পারে। চক্ষু কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির পর আলোচনা করিলে শিখনের গভীরতা ও সমৃদ্ধি বাড়ে। যাহা দেখা বা শোনা হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয় দিকগুলি আলোচনায় পর্যালোচিত হয়, ভুল উপলব্ধি সংশোধিত হয় এবং সমস্ত বিষয়টির একটি বৃহত্তর ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে ভাঙ্গিয়া আলোচনা।

স্বেচ্ছায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিলে একটা অসুবিধা এই হইয়া পড়ে যে অল্প কয়েকজন ছাত্রছাত্রীই আলোচনায় কর্তৃত্ব করে কিন্তু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা নীরব শ্রোতা হইয়া বসিয়া থাকে বা কদাচিৎ অংশগ্রহণ

করে। শিক্ষক যদি বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে তাহাদের কথা বলিতে হয় এবং এইভাবে প্রত্যেককেই প্রশ্নোত্তরে লইয়া আসা যায় কিন্তু আধুনিক শিক্ষক চান সকলে স্বেচ্ছায় আলোচনায় যোগদান করুক, তাহাদের বাধ্য করাইয়া নয়।

আলোচনা সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবে অথচ আলোচনার মধ্যে থাকিবে স্বতঃস্ফূর্ততা—এইরূপ শিখন অবস্থার প্রবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। শ্রেণীতে সমগ্রভাবে আলোচনা না চালাইয়া শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া আলোচনা পরিচালনা করিলে আলোচনায় ব্যপ্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা দুই-ই লইয়া আসা যায়। শ্রেণীর অনেকে লাজুক প্রকৃতির হয় বা পাছে তাহাদের কথা ভুল হইয়া পড়ে এই ভয়ে সমস্ত শ্রেণীর আলোচনায় যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। ছোট ছোট দলে আলোচনা হইলে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং পরে বড় আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়।

এইরূপ ছোট ছোট দলে আলোচনার জন্য কোন বিষয় প্রশ্নের আকারে লওয়া যাইতে পারে এবং প্রশ্নটি বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রকল্প কাজ, সম্বন্ধিত, পাঠদান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি পাঠদান পদ্ধতিতে এই পদ্ধতি বেশী কার্যকরী হয় কেননা আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কিছু না কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা থাকা চাই। দলগুলি সকল সদস্যের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা একত্রিত ও সমন্বিত করে যাহার ফলে সেই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও সমস্যা সমাধানের নূতন আলোক বা সন্ধান পাওয়া যায়।

"আমাদের গ্রামে জল সরবরাহ ও নিকাশের কি ব্যবস্থা আছে?" "কোন্ কোন্ ঋতুতে কি কি ফুল হয়?" "আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষায় কিভাবে সাহায্য করিতে পারি?" এই ধরণে প্রশ্নাকারে বিষয় উপস্থাপিত হইলে সুপ্ত আগ্রহ জাগরিত হইা উঠে এবং ছোট দল হইলে প্রত্যেকেই সাহস করিয়া তাহাদের কথা বলিতে পারে। পাঁচ বা ছয়জন করিয়া দল গঠিত হইতে পারে এবং সমস্যা সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দিবার ভায় তাদের উপর দিতে হইবে। এই রকম ছোট দলে আলোচনার জন্য খুব কম সময় দেওয়া হয়। সাধারণত

পাঁচ হইতে দশ মিনিট সময়ই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। আলোচনা চলিতে থাকার কালে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক দল ঠিক মত অগ্রসর হইতে পারিতেছে কিনা দেখিবেন। এই নূতন পদ্ধতিতে কোন দল যদি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে বা তাহাদের কি করিতে হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে না পারে তাহা হইলে তিনি যত্নপূর্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া যথানির্দেশ দিবেন। দলগত আলোচনার পর ছাত্রছাত্রীরা আবার যখন একত্রে সম্মিলিত হইবে তখন আলোচনার ধারা কোন্ পথে চলিবে তাহার ইঙ্গিত শিক্ষক দলগুলিকে পরিদর্শন করিবার কালে পান। তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট দলে কিরূপ আচরণ করে তাহা দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আরও বাড়ে। ছোট দলে আলোচনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শ্রেণীকে লইয়া সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এই সাধারণ আলোচনা প্রত্যেক দলে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার বিবরণ দলের একজনকে দিতে হয়। এই বিবরণ লিখিত বা মৌখিক দুই-ই হইতে পারে। প্রত্যেক দলের একজনকে শিক্ষক এই ভারার্পণ করিতে পারেন বা দল নিজেই তাহাকে নির্বাচিত করিতে পারে। দলগত আলোচনার সময় ছাত্রছাত্রীদের মুখামুখী বসিতে হইবে।

দলগত আলোচনার সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীতে যথারীতি আসন গ্রহণ করিয়া পুনর্মিলিত হয় এবং শিক্ষক বা ছাত্র বা ছাত্রী সভাপতি প্রত্যেক দলের বিবরণী রক্ষককে পালাক্রমে বিবরণী পেশ করিতে বলেন। সমস্ত বিবরণী পড়া না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ আলোচনা বা মন্তব্য প্রকাশ করা হয় না। বিবরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল কথাগুলি বোর্ডে লিখিয়া ফেলিলে ভাল হয়। দল যদি সংখ্যায় অনেক বেশী হয় তাহা হইলে বোর্ডে যে কথাগুলি লেখা থাকিবে তাহা ছাড়া কোন নূতন কথা বিবরণীতে থাকিলে তাহাই শুধু বিবরণী রক্ষককে জানাইতে বলা হয়।

বিবরণী পাঠ সমাপ্ত হইলে শিক্ষক বা ছাত্র বা ছাত্রী সভানেতা বা নেত্রী ছোট ছোট দলগুলির চিন্তাধারার সাধারণ সূত্রগুলির বর্ণনা দিবেন বা নিজেই তাহাদের সংক্ষিপ্তসার শ্রেণীর কাছে উপস্থাপন করিবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীতে

আলোচনা চলিবে। আলোচনায় যিনি নেতৃত্ব করিবেন তাঁহাকে সব সময়ই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আলোচনা কোন ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যতদূর সম্ভব শ্রেণীর মধ্যে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। যাহা হউক সর্বশেষে শিক্ষক যদি আলোচনার মূল কথাগুলির সারাংশ বলিয়া দেন এবং আলোচ্য বিষয়গুলির পরস্পরের সম্বন্ধ দেখাইয়া দেন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা সারা আলোচনার সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারে।

ব্যক্তিত্বের বা সমাজ সম্বন্ধের অভিনয়।

পাশ্চাত্য দেশে এই প্রণালীর ব্যবহার নানা ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা দান করিবার কাজেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোন ঘটনা, পরিস্থিতি বা ক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করাই এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। হয়ত পল্লীর বাগানগুলি হইতে ছেলেমেয়েদের ফুল তুলিতে বারণ করা হইয়াছে। ইহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং বড়রা যে তাহাদের আনন্দ হইতে কেবলই বঞ্চিত করিতে চাহে এই নিষেধকে তাহারা এই মনোভাবেরই আর একটি প্রকাশরূপে দেখিতেছে। এইরূপ অবস্থায় শিক্ষক এই নিষেধের কতকগুলি যুক্তি হয়ত দেখাইতে পারেন কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি যুক্তিগুলি নিজেরাই আবিষ্কার করিতে পারে তাহা হইলে তাহা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। এই পরিস্থিতিকে নাট্যরূপ দিতে গেলে একটি ছেলে বা মেয়েকে ফুল ছিঁড়িবার অভিনয় করিতে হয় এবং সেই অবস্থায় উদ্যানরক্ষক বা গৃহস্বামী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে এই দৃশ্যের অবতারণা করিতে হয়। এই অবস্থায় তাহাদের উভয়ের মধ্যে বচসা হইবে তাহাতে ছেলেটি বা মেয়েটি ফুল ছেঁড়া যে অন্যায় নয় তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইবে এবং গৃহস্বামী ফুল ছেঁড়া যে গর্হিত কাজ তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবেন। যে ছেলেটি গৃহস্বামীর ভূমিকা অভিনয় করিবে তাহাকে গৃহস্বামী যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ফুল ছেঁড়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহার অন্ততঃ কিছুটা আবিষ্কার করিতে হইবে। অন্য ছাত্রছাত্রী যাহারা এই অভিনয় দেখিতেছে তাহারা তাহাদেরই একজনের কাছ হইতে

যুক্তিগুলি খোলামনে শুনে। তাহার যুক্তি তাহাদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করে বড়দের যুক্তি তাহা করিতে পারে না, কারণ বড়দের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তাহাদের প্রতিকূল ধারণা জন্মাইয়া গিয়াছে এবং পূর্বধারণার জন্য বড়দের যুক্তি তাহাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

এইরূপ অভিনয় পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই হওয়া উচিত। অভিনয় করিবার আগে কিছুক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারীরা নাটকের চরিত্র ও দৃশ্যর সম্বন্ধে 'আঁচ' পাইবার জন্য কিছুটা আলোচনা করিয়া লইতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন-ভাবে সমাধানের ইঙ্গিত পাইবার জন্য এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি নানাপ্রকারে করিতে হয়।

এইরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা লাজুকতা ও ভয় কাটাইয়া উঠিতে পারে। ধরা যাউক কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য শিক্ষার্থীরা নির্মাণ করিয়াছে তাহা বিক্রয় করিতে হইবে। যদিও এই কাজ করিতে ছেলেমেয়েরা খুবই উৎসাহী থাকে কিন্তু অপরিচিত লোকদের বাড়ী গিয়া জিনিষ কিনিতে বলিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করে ও ভয় পায়। এই দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থী-নেতা দলের সকলকে এই বিষয়ে অভিনয় করিতে বলিবেন। প্রথমে হয়ত ইহা লইয়া একটু হাসাহাসি ও অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে কিন্তু পরে তাহাদের মধ্যে সাহস আসিবে এবং সহজভাবে তাহারা অভিনয় করিতে পারিবে। নানারূপ দৃশ্যের অবতারণা হইবে। কোন দৃশ্যে গৃহস্বামী এই বিক্রয়ের উদ্দেশ্য কি এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা-বাদ করিবেন, অন্যত্র কোন ব্যক্তি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই রকম কাজ করিতেছে দেখিয়া অসন্তোষ জানাইবেন, কোন ব্যক্তি জিনিষ কিনিতে অস্বীকার করিবেন এবং কোন ব্যক্তি জিনিষের যে দাম তাহা অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া জিনিষটি কিনিবেন। সব ছেলেমেয়েরাই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে এবং অভিনয়ের শেষে তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে যে অভিনয় বাস্তবধর্মী হইয়াছে কিনা এবং তাহাদের যাহা বলা এবং করা প্রয়োজন তাহা সুষ্ঠুরূপে তাহারা করিতে পারিয়াছে কিনা। একবার ঠিকমত না হইলে অভিনয় পুনর্বার

বা কয়েকবার করা যাইতে পারে, সর্বশেষে সত্যকার বিক্রয়-অভিযানে সফলভাবে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মাইবে।

আচরণ সমস্যার পশ্চাতে যে প্রক্ষোভজনিত চাহিদা থাকে তাহার সম্বন্ধে উপলব্ধি ও অন্তদৃষ্টি লাভ করিবার কাজে এইরূপ অভিনয় সহায়ক হয়। কোন বালক হয়ত শ্রেণীতে ক্রমাগত অন্যদের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে চায়। খেলার মাঠে সকলের উপর সে প্রভূত্ব করে। সে অন্যদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে পছন্দ করে না—জোর করিয়া সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করাতেই তাহার আনন্দ। তাহার সহিত শান্তস্বভাবের ছেলেমেয়েদের বনিবনা হয় না। শিক্ষক তাহার সহিত অন্য দুই একজনকে অভিনয়ে নামাইতে পারেন। আক্রমণপরায়ণ বালকের নাম যদি দুর্মতি হয় ও বন্ধুভাবাপন্ন শিষ্ট স্বভাব অন্য বালকের নাম সুমতি হয় তাহা হইলে এই অভিনয়ে দুর্মতি সুমতির ও সুমতি দুর্মতির ভূমিকা অভিনয় করিবে। তাহারা কোন একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া বচসা, দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি প্রদর্শন করিবে। দুর্মতি এখন চোখের সামনে তাহার মূর্তির প্রকৃত রূপকে তফাতে থাকিয়া দর্শন করিতে পারিবে এবং তাহার বিপরীত চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সে-সম্বন্ধে তাহার নূতন আত্ম-উপলব্ধি ঘটিবে। অভিনয় শেষে শিক্ষক অভিনেতারা অভিনয়কালে কিরূপ অনুভব করিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে দুর্মতিকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহার ভূমিকা যে অভিনয় করিতেছিল অর্থাৎ সুমতি সে অন্তরে ভয় পাইয়াছিল তাই বড় বড় কথা বলিতে হইয়াছে। অন্যদের চক্ষে সে কিরূপ প্রতিভাত হয় এখন সে তাহা চাক্ষুষ দর্শন করিল। এখন শিক্ষক দম্ভোক্তি ও প্রভুত্বপরায়ণতা না দেখাইয়াও নিজেকে কি করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহার পথ দেখাইয়া দিবেন এবং নিজের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে আত্মধিক্কার না জন্মাইতে পারে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির সহিত তিনি তাহা দেখিবেন।

কোনরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে এইরূপ অভিনয় পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। পূর্বে আলোচনা না করিলেও ইহাকে আলোচনার দ্বারাই শেষ করিতে হইবে।

এইরূপ আলোচনার সুযোগ থাকিলে অংশগ্রহণকারীরা এবং দর্শকরা তাহারা যাহা অনুভব করিয়াছে তাহা বলিবার সুযোগ পায় এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বাহির হইয়া আসে। শিক্ষার্থীদের নানারূপ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ অভিনয়ের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। ছেলেমেয়েরা যদি নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের সমস্যার সমাধান করিতে পারে তাহা হইলে সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ও মনোভাব স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী হয় এবং গণতন্ত্রসম্মত হয়।

সমিতি পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির সাহায্যে শ্রেণীর প্রায় সকলকেই শিক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত রাখিতে পারা যায়। এই ধরণের দলগত কাজের মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক গুণাগুণ ও নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে সমিতির কাজের পরিকল্পনা করিতে পারেন। কোন কাজ বা বিষয় লইয়া শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা যখন আলোচনা করে তখন তাহারা কাজ বা বিষয়ের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সমিতির উপর ভারার্পণ করিবে। প্রত্যেক সমিতি আবার তাহার উপর ন্যস্ত বিষয় বা কাজটিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করিয়া সমিতির সদস্যদলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে।

এইরূপ সমিতির কাজে শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে কি ধরণের ও কি পরিমাণ সহায়তা দান করিতে হইবে তাহা নির্ভর করে শ্রেণী ও বয়সের তারতম্যের উপর। শিক্ষককে সাহায্য দান কার্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পরিমিত মাত্রায় বিচক্ষণতার সহিত তাহাকে সাহায্য দান করিতে হইবে, সাহায্য দান এত কম যেন না হয় যাহাতে শিশুরা নিরুপায় ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে আবার এত বেশী যেন না হয় যাহাতে মনে হয় যে সমিতির সব কাজটাই যেন শিক্ষকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। যতটা সম্ভব ছাত্রছাত্রীরা সমিতির কাজকে তাহাদেরই কাজ, তাহাদেরই দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতে পারে। অবশ্য সাহায্য দানের এইরূপ সীমা সামলাইয়া চলা খুব সহজ কাজ নয়। দলগত পদ্ধতি লইয়া কাজ করিতে করিতে প্রথমে কখন কখনও হয়ত শিক্ষককে কিছুটা বিফল হইতে হয় কিন্তু ইহাতে দমিয়া

যাওয়া উচিত নয় বরং সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়াই অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে এবং ফলপ্রদ কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করিতে হইবে।

সমিতি পদ্ধতির আর একটি গুণ যে ইহা শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার মধ্যে একটি শুভ ও সুস্থ পরিবর্তন আনয়ন করে। শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী অনাদৃত বা অবহেলিত অবস্থায় থাকে বা কয়েক জন মিলিয়া ছোট ছোট দল পাকাইয়া থাকে। এইরূপ শ্রেণী সমাজে সংহতি আসে না এবং সংহতি না আসিবার ফলে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে না এবং যোগাযোগের অভাবে উত্তম মনোভাবের সঞ্চার হয় না। সমিতি পদ্ধতিতে শ্রেণীর সকলকেই শিক্ষাকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়, নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালন করিতে হয়, নিজেদের প্রকাশ করিতে হয় এবং সহযোগিতার সহিত একই লক্ষ্যে কিরূপে পৌছাইতে হয় তাহা শিখিতে হয়। এইরূপ সকলে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিবার ফলে দলের সংহতি বাড়িয়া যায় এবং শ্রেণীর নানারূপ কাজে স্বেচ্ছা প্রণোদিত অংশ গ্রহণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

সঙ্ঘ পদ্ধতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উপায়।

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে দল হিসাবে একসঙ্গে কাজ করিতে গেলে নূতন নূতন নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ নৈপুণ্য অর্জন করা সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। ছাত্রছাত্রীরা যেমন ইহা একদিনে অর্জন করিতে পারে শিক্ষকের পক্ষেও তাই। সেই জন্য প্রথম প্রথম এই ধরণের কাজ করিতে গিয়া হয়ত কিছু বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয় কিন্তু তাহাতে হতাশ হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা এই যোগ্যতা অর্জন করিতেই হইবে।

সঙ্ঘপদ্ধতি হিসাবেই শুধু সঙ্ঘপদ্ধতির মূল্য হয় না যদি না ইহার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুর অবতারণা না করা যায়। সেইজন্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী করিয়া উপযুক্ত সঙ্ঘ পদ্ধতিকে

বাছিয়া লইতে হইবে। বিষয় বস্তু রসদ ও সঙ্ঘ পদ্ধতি বাহন। রসদ না থাকিলে বাহনের কাজ নিস্ফল ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই জন্য সঙ্ঘপদ্ধতির দ্বারা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ও ভাবধারা যদি না পরিবেশিত হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতি নিরর্থক হইয়া যায়।

দলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক মনোভাব যত ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিপূর্ণ থাকে এবং তাহাদের নিজেদের কাজটি করিতে যত নিপুণ হয় ততই সঙ্ঘের প্রগতি বাড়িতে থাকে।

দলের মধ্যে কাজ করিতে গেলে কি কি কৌশলে বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় তাহা মুখে বলিয়া বা বক্তৃতা দিয়া হাজার বুঝাইলেও ছাত্রছাত্রীরা তাহা শিখিতে পারে না। এইরূপ নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইলে সত্য সত্যই দলের মধ্যে কাজ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে এবং সেগুলি পরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

সঙ্ঘপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকের মধ্যে যেন গোঁড়ামীর মনোভাব উৎপন্ন না হয়। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে শ্রেণীর সব কাজ সঙ্ঘপদ্ধতির মারফৎ হয় না। অনেক কাজ আছে যেগুলি একা একা করিতে হইবে বা একই সঙ্গে শ্রেণীর সকলকে করিতে হইবে।

পশ্চিমের দেশগুলিতে সঙ্ঘপদ্ধতিগুলি ব্যাপক ভাবে ব্যবহিত হইতেছে কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ পদ্ধতি এখনও নূতন। কার্যের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি নূতন ধরণের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে এই পদ্ধতিগুলিকে প্রধানত কাজে লাগান হইতেছে। তবে গতানুগতিক পাঠ্য ক্রমের শিক্ষাও সঙ্ঘপদ্ধতির মাধ্যমে দেওয়া হইতেছে। পাঠ্য বিষয়ের অর্থপূর্ণ সার্থক শিক্ষা ছাড়াও সঙ্ঘ পদ্ধতিতে কাজ করিতে করিতে ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরকে আরও ভাল করিয়া জানিবার বুঝিবার সুযোগ ঘটে এবং সহনশীলতা ও অপরকে স্বীকার করিয়া লওয়ার মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। ইহার ফলে তাহারা অন্যদের সহিত আরও ভাল করিয়া থাকিতে ও কাজ করিতে

শেখে। এই পদ্ধতিতে কাজ করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের অনুভূতিকে কথায় ব্যক্ত করিতে শেখে।

সহযোগিতাপূর্ণ গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইলে ছাত্রছাত্রীরা যেন বোঝে যে তাহারা যে কাজ করিতেছে তাহাতে শিক্ষক শিক্ষিকার সমর্থন ও অনুমোদন আছে। শ্রেণীর সকল কাজে পরস্পরকে সাহায্য করিতে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের সহযোগিতাকে যাহাতে বাধা না দেওয়া হয় তাহা দেখিতে হইবে। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠনের জন্য কতকটা এই ধরণের সঙ্ঘপদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করিবার জন্য বিদ্যার্থী পরিষদ গঠন করে। এক এক কাজের ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া মন্ত্রী বা নেতা নির্বাচিত হয়, যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রী, সাফাই মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রী, কৃষ্টি মন্ত্রী, শ্রেণী মন্ত্রী ইত্যাদি। ইহাদের সকলের কাজের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করেন একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধাননেতা। প্রত্যেক মাসে নূতন করিয়া নির্বাচন হয়। বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রী মিলিয়া তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে তাহার নিয়মসমূহ তাহারা নিজেরাই প্রণয়ন করে। প্রত্যেক মাসে মন্ত্রী বদল হওয়ায় সকলেই সব রকম কাজ ও দায়িত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিদ্যার্থী পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে বা ভোটের দ্বারা গৃহীত হয়। এই অবসরে পরিষদের সদস্য সদস্যারা তাহাদের মতামত ব্যক্ত করে এবং আলোচনা করিবার সুযোগ পায়। শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের একই আসনে সর্বক্ষণ বসিয়া থাকিতে বাধ্য করা হয় না। তাহারা প্রয়োজন মত শ্রেণীর সকল জিনিষপত্রের কাছে যাইতে পারে এবং ব্যবহার করিতে পারে।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এইরূপ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সাহায্যে অন্য লোকেরা কিভাবে জীবনযাপন করে ও কাজ করে তাহা জানিতে পারে। তাহারা স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাজার হাট, গ্রন্থাগার, সেবা সমিতি, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পাহাড় পর্বত, প্রদর্শনী, পুতুল নাচ, মেলা, নদী, সমুদ্র সৈকত, ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি

গভীর অভিনিবেশ ও আনন্দের সহিত দেখে এবং প্রত্যক্ষভাবে বহু জিনিষ শিখিতে পারে। শারীর শিক্ষণ ও খেলাধূলার মধ্যেও তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি বাড়ে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তাহারা নিয়মিত খেলাধূলা করে।

একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ উপভোগ ও আত্মপ্রকাশ করার মধ্যে যতটা হয় অন্য কিছুতে ততটা হয় না। এইজন্য শিশুরা নিজেরাই নানা প্রকার আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এবং নাচগান অভিনয় করে, রেকর্ডের গান শোনে, ফিল্ম দেখে। শ্রেণীর মধ্যেও তাহারা আঁকিয়া, রংতুলির কাজ করিয়া, সমাজবিদ্যা বা ইতিহাস পাঠের স্বতস্ফূর্ত অভিনয় করিয়া নিজেদের সামাজিক ঐক্য বোধকে বাড়াইয়া তুলে।

পঞ্চম অধ্যায়
কৈশোর

শৈশব হইতে পরিণত মানবতায় রূপান্তরিত হইবার কালকেই কৈশোর বলা হয়। ১২ হইতে ২১ বৎসর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশ বালকবালিকা তাহাদের বাল্যবস্থা ছাড়িয়া পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। পূর্ণ মানুষ হইবার একটি লক্ষণ সন্তান উৎপাদন ও ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভ। এই সময় শারীরিক বৃদ্ধি ও পরিণমন পূর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। বালিকাদের স্তনযুগল ভারী ও পূর্ণতর হইয়া উঠে, যৌনস্থানে ও বগলে চুল গজাইতে শুরু হয়। তাহাদের এখন রমণীদের মত দেখিতে হয়। কৈশোর কালেই মানুষ তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের শীর্ষের কাছাকাছি যাইয়া উপস্থিত হয়। বালিকার রজ দর্শন এই সময় হয়। সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে রজস্রাব শুরু হয় তবে এবিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে রজস্রাব ১০ বৎসর বয়স হইতে হইতেই আরম্ভ হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের আগে রজস্রাব হয় না। অংশত দৈহিক পরিণমন এবং অংশত পরিবেশের প্রভাব এইরূপ কালান্তরের কারণ বলিয়া মনে করা হয়। বালিকাদের মত বালকদের মধ্যে যৌবনাগম কোন একটি লক্ষণের দ্বারা অত স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সাধারণত ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে বালকরা কৈশোরে উপনীত হয়। তাহাদের গলার স্বর ভাঙ্গিয়া যায়, যৌনস্থানে ও মুখে চুল গজাইতে আরম্ভ হয় এবং জননেন্দ্রিয় তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। কৈশোর কাল হইতেছে "হইয়া উঠিবার কাল"। এই সময় মানুষ স্বাধীনতা ও দায়িত্ব গ্রহণের পথে পা বাড়ায় এবং পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইতে আরম্ভ করে। জগতের ঘটনায় ও কার্যে তাহারা জানিতে ও লিপ্ত হইতে চায়। জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি উপলব্ধি করিবার জন্য তাহারা উৎসুক হইয়া উঠে। সারা দেহে ও মনে এক জাগরণের

সাড়া পড়িয়া যায়। দেহে ও মনে পুলক ও অস্বস্তি একই সঙ্গে বিরাজ করে। দেহ-মন বিস্তৃত ও প্রসারিত হইতে চায় এবং নানাপ্রকার উন্নত ও তৃপ্তিকর কার্যে ও ভাবনায় মগ্ন হইয়া থাকিতে চায়। নানারূপ বিষয় ও সমস্যা লইয়া চিন্তা করিবার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার এবং দায়িত্ব লইবার সুযোগ তাহারা পাইতে চায়। এই সময় দূরবর্তী লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনে তাহাদের প্রয়াসশীল থাকিতে হয়। প্রয়োজন হইলে ইহার জন্য বর্তমানের সুখসুবিধাকে বিসর্জনও দিতে হয়।

কৈশোর জীবনের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। কিশোর কখনও ছেলেমানুষী করে আবার কখনও বড়দের মত আচরণ করে। সে এখন দোটানায় থাকে। পিতামাতাও তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করেন যাহাতে এক সময় মনে হয় সে ছেলেমানুষ আছে আবার অন্যসময় সে যে বয়স্ক হইয়াছে তাহা তাহাকে মনে করাইয়া দেওয়া হয়। ফলে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না তাহার কর্তব্য কি। বাল্য ও বয়স্ক দুই জীবনই তাহার উপর আলোছায়া ফেলিতে থাকে।

কৈশোরের এই অব্যবস্থিত অবস্থা জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, কেননা এই সময় জীবন দুর্যোগময় হইয়া উঠিতে পারে আবার উপযুক্ত পরিচালনা সংগঠন ও নূতন দিগ্‌দর্শনের দ্বারা জীবনের রূপই পালটাইয়া যাইতে পারে।

পোষক-পরিচ্ছদে ও কতকগুলি আচরণে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সমতা দেখা গেলেও তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিভিন্নতাও প্রচুর দেখা যায়।

কৈশোরে কেহ জীবনের সঙ্গে কতটা মানাইয়া চলিবে তাহা নির্ভর করে পূর্ব-জীবনের কিরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ যদি নিজের অবস্থায় নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ না মনে করে তাহা হইলে সে পূর্বের শৈশবোচিত উপায়ের দ্বারাই জীবনের নানা পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার চেষ্টা করে। নূতন অভিজ্ঞতার স্বাদ লইতে এবং নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিতে সে সাহস পায় না। সেইজন্য পরবর্তী বিকাশের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে। শিশু-পালনের ভুলভ্রান্তি অনেক সময় কৈশোর অবস্থা না আসা পর্যন্ত ধরা পড়ে না। বয়ঃসন্ধিকালে জীবনের

সহিত যেভাবে মানাইয়া লইতে হয় শৈশবে সেজন্য দেহমনে প্রস্তুত হইয়া না উঠিলে তাহা করা কষ্টকর হইয়া উঠে। পুঞ্জিভূত বিদ্বেষ, নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করা, হীনমন্যতা, অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এইসব অনুভূতি অতি শৈশবকাল হইতেই উৎপন্ন হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ও তীব্রতর হইয়া উঠিতে পারে। যে শিশু অতি শৈশবকাল হইতে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায় সে পরে বয়োপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের আশ্রয় ও সহায়তা ছাড়িতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে বা তাহা করিলে নিজেকে অপরাধী মনে করে। চিরকাল মায়ের আঁচল ধরা হইয়া থাকিলে বয়সে সন্তান কখনও স্বাবলম্বী হইয়া জগতের কাজকর্মে ও উন্নতিতে লাগিতে পারে না। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন :

'তিন কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

শিশু যত বড় হইতে থাকিবে ততই তাহার পরনির্ভরতা যেন স্বেচ্ছাকৃত হয়—আসক্তিতে পরিণত না হয়। এইরূপ নির্ভরশীলতায় যে যেমন নিশ্চিন্ত বোধ করে তেমনি ক্রমে ক্রমে সে আত্মস্বরূপের সঙ্গে, নিজের শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে থাকে যাহাতে ভবিষ্যতে পরিণত বয়সে সে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। যে শিশু তাহার সারা শৈশবকাল ধরিয়া স্বাবলম্বন এবং আত্মমর্যাদা লাভের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে সে কৈশোরেও তাহার এই প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং পরবর্তী পরিণত জীবনে তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠা সহজ সাধ্য হইবে।

বস্তুতঃ সমগ্র অতীত জীবন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ণ পরিণত মানুষ হইবার ক্ষমতা এমন ব্যক্তিরই থাকে যে শৈশবের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি না হারাইয়া শিশু হইতে বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারে। কচি শিশুদের প্রক্ষোভের শক্তি ও আত্মশাসনের জেদ, প্রাক্‌বিদ্যালয় শিশুদের বিস্ময় স্ফূর্তি এবং ক্রীড়াপ্রবণতা, বিদ্যালয়ের শিশুদের পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে যুক্ত হইবার ক্ষমতা এবং

বৌদ্ধিক কৌতূহল স্পৃহা এবং কিশোরদের হৃদয়বেগ এবং আদর্শ—সার্থক পরিণত মানুষের মধ্যে এ সবই থাকিয়া যায়।

কৈশোরে বিকাশের বিভিন্ন ধারা।

বয়ঃসন্ধি কালের সর্বপ্রধান লক্ষণ শারীর বৃত্তীয় (physiological) পরিবর্তন। দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্র ও গ্রন্থির পরিবর্তন হইতে থাকে। আমাদের দেশে ১৩।১৪ বৎসর হইতে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়েরা সন্তান ধারণের যোগ্য হইয়া উঠে। ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্তি সাধারণতঃ মেয়েদের হইতে ২।১ বৎসর দেরীতে হয়। তবে বয়ঃপ্রাপ্তি কালের পার্থক্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বালক বালিকাদের এই পরিবর্তনকে জীবনের একটি পরিণতি হিসাবে করিয়া স্বীকার লইতে উৎসাহিত করা উচিত। পুরুষ ও নারী হিসাবে তাহারা সংসারে যে ভূমিকা গ্রহণ করিবে ইহা তাহারই প্রস্তুতি এইভাব তাহাদের মনে যেন জাগরিত হয়।

শারীরিক পরিণমন।

কৈশোরে ছেলেমেয়েরা শারীরিক পরিপক্বতা লাভ করে। কৈশোরের প্রাক্কালে দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। দৈর্ঘ্যে ও ওজনে তাহারা বাড়িতে থাকে। কব্জির হাড়গুলি বিশেষ ভাবে শক্ত হয়। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পরিপক্ব হইয়া বয়স্ক ব্যক্তির মতন আয়তন লাভ করে। কলেজে পড়া কালীন ছেলেরা উচ্চতায় বাড়িতে থাকে এবং প্রায় ১৯ বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে তাহাদের দৈর্ঘ্যের শেষ সীমার পৌঁছায় তবে ওজনে ইহার পরেও বাড়িতে থাকে। মেয়েরা হাইস্কুলে পড়িতে পড়িতেই তাহারা যতটা দীর্ঘ হইবে তাহা হইয়া লয়। একথা মনে রাখিতে হইবে যে যৌবনাগম কোন্ বয়সে হইবে তাহার উপর বৃদ্ধি ও বিকাশের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। যে ছেলের পরিক্কতা আসিতে দেরী হয় তাহার মনে শারীরিক ও সামাজিক হীনতাবোধ আসিতে পারে কেননা তাহারই সমবয়সী অন্য ছেলেরা তাহার অপেক্ষা বাড়িয়া উঠে এবং তাহাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সে তাল রাখিতে পারে না। এই সময় সে যদি তাহার মত অবস্থার অন্য সাথী

পায় তাহা হইলে বিলম্বিত যৌবনাগম তাহার পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হয় না। কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষক তাহাদের বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে যে-সব দৈহিক পরিবর্তন আসে এবং ইহার সুবিধা অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সরল ও সহজভাবে সহৃদয়তার সহিত বুঝাইয়া দিবেন।

মানসিক পরিণমন।

২০ বৎসর বয়সের মধ্যে সাধারণতঃ বৌদ্ধিক বিকাশের পূর্ণতা ঘটে। কঠিন ও জটিল কাজে যাহাতে বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা করিবার সর্বাধিক ক্ষমতা এই সময়ের মধ্যেই আসিয়া যায়। বুদ্ধি তীক্ষ্ণতার পূর্ণ পরিণাম এই সময়ের মধ্যে হইলেও জ্ঞানের প্রসার সারাজীবনই চলিতে থাকে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং বিচার-বিবেচনা করিবার শক্তিও বাড়ে। যে-সব ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকে বা এমন সব কাজে নিযুক্ত থাকে যাহাতে ভাষা এবং গণিতের সামর্থ্যের প্রয়োগ করিতে হয় তাহাদের ভাষা ও গণিতের সামর্থ্য উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। মানসিক সামর্থ্যের নিয়মিত প্রয়োগের উপর তাহার বৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

বিদ্যাবত্তার সামর্থ্যে হাই স্কুলের ছেলেরা সাধারণতঃ হাইস্কুলের মেয়েদের থেকে শ্রেষ্ঠতর হয়। তবে ছেলেদের মধ্যে এই সামর্থ্যের পার্থক্য মেয়েদের থেকে অনেক বেশী থাকে। মেয়েদের থেকে যেমন অনেক মেধাবী ছেলে থাকে অবার তেমনি অনেক বেশী পিছাইয়া পড়া ছেলেও থাকে।

কৈশোরে দেহের মধ্যে যেমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে তেমন বৌদ্ধিক শক্তির মধ্যে আসে না। কোন বালক বা বালিকার যে ধারায় তাহার মানসিক বৃদ্ধি ইতিপূর্বে চলিতেছিল যৌবনাগমের সময়ও সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রক্ষোভের পরিণমন।

কোন ব্যক্তির প্রক্ষোভের পরিপক্বতা কতটা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় তাহার আত্মসংযম বা বিবেক বুদ্ধির দ্বারা। তাহা ছাড়া অবশ্যম্ভাবী আশাভঙ্গ

বা অতৃপ্তি সহ্য করিবার শক্তি তাহার জন্মে এবং জীবনের নানা পরিস্থিতির মধ্যে গঠনমূলক ভাবের পরিচয় দিতে পারে। অন্যের সেবার কাজে লাগিতে পারায় সে সন্তোষ অনুভব করে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিতে পারে। নূতন অবস্থা ও দায়িত্বের ঝুঁকি লইতে পরিণত মানুষই উৎসুক হয়।

কিশোর-কিশোরীদের অনেক বিষয়ের সহিত যুঝিতে হয়। তাহাদের নিজেদের দেহ সম্বন্ধে যে চিত্র তাহাদের মনে এতকাল ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয়। পিতামাতা ও অন্যদের সহিত সম্পর্কের মধ্যেও আসে কিছু অভিনবত্ব। এই সময় তাহারা শিশুও নয় আবার বয়স্ক ব্যক্তিও নয়, সুতরাং তাহাদের অবস্থা থাকে সংজ্ঞাহীন। দৈহিক পরিপক্বতা তাহাদের যতটা হয় প্রক্ষোভিক পরিপক্বতা ততটা হয় না। তাহাদের কাছ হইতে কি প্রত্যাশা করা হইতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এইরূপ অনির্দেশ্য অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকা বেশ অস্বস্তিকর। এই সময়কার প্রবল মনের আবেগকে সৃজনাত্মক ও সংগঠনাত্মক কাজ-কর্মে তাহারা সাফল্যের সহিত নিয়োজিত রাখিতে চায়। ইহাতে তাহারা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

পরিণত প্রক্ষোভের আর একটী শুভ লক্ষণ প্রেমে পড়া। অন্যজন নিজের অনুভূতিতে আসা ও তাহার জন্য আত্মদান করিতে পারা—এইরূপ প্রক্ষোভিক বিকাশের অবস্থাতেই প্রেমে পড়া যায়। কচি শিশুর আত্ম-রতি, তাহার পর প্রথম শৈশবের পিতামাতা ও আপন পরিজনের প্রতি আসক্তি, শেষ শৈশবের বন্ধু-প্রীতি এবং প্রাক্-কৈশোরদলের প্রতি অনুরক্তি—এইসব পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে কৈশোরের পরকীয় প্রেমে। অন্য কাহাকেও সত্য সত্যই ভালবাসিতে পারিলে সেই অকৃত্রিম ভালবাসা বিস্তার লাভ করে সমাজের সমস্ত লোকের কল্যাণ কার্যে, জনকল্যাণমূলক কাজমাত্রেই আগ্রহের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

যৌন সম্বন্ধ জীবনের যে একটি স্বাভাবিক অঙ্গ এই উপলব্ধি যৌবনাগমের বহু পূর্বেই উপজাত হওয়া উচিত। কিন্তু হাইস্কুলের বালকবালিকাদের মধ্যে

এই সম্বন্ধে কোন সঠিক জ্ঞান থাকে না। সুতরাং এই সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কিছু প্রতিষেধকমূলক কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমাজ শিক্ষার ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া জীববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য—বিশেষ করিয়া আবেগ ও যৌন বিষয়ের সমস্যা লইয়া রচিত জীবনী ও উপন্যাস পাঠ্যসূচীতে রাখা দরকার। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কণ এবং সামাজিক কাজকর্মও এই উদ্দেশ্যের পরিপোষক। তবে যৌন সম্বন্ধে শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত কেননা এবিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বন না করিতে পারিলে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলিবে। যৌন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হয় নাই এমন সব বালক বালিকাদের যৌন চেতনার অকাল বোধন হইতে পারে এই ব্যবস্থার অনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা।

সামাজিক পরিণমন।

প্রক্ষোভের পরিণমনের সহিত সামাজিক পরিণমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সামাজিক পরিণমনের একটি প্রধান লক্ষণ বর্ধিত সামাজিক সংবেদনশীলতা অর্থাৎ অপরের সুখ দুঃখানুভূতি ও মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারা। এই উপলব্ধির আলোকেই কিশোর কিশোরী তাহাদের সমাজ পরিবেশকে অনুভব করে এবং তদনুযায়ী আচরণ করে। সামাজিক পরিপক্কতা যত বাড়িতে থাকে তত সামাজিক সম্পর্ক শুধু যে বিস্তৃত হয় তাহাই নহে, সামাজিক সম্পর্ক উন্নততর হইতে থাকে।

যে সকল বয়স্কলোক নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে চায় এবং কিশোর কিশোরীদের চিন্তা এবং কাজকে সহৃদয়তার সহিত উপলব্ধি করিতে পারে না সেরূপ লোকজনের সংস্রব তাহারা এড়াইয়া চলিতে চায়। যে সকল পিতামাতারা এখনও তাহাদের বাঁধাধরা নিয়মশৃঙ্খলা ও গণ্ডীর ভিতর রাখিতে চান, স্বাধীনতা দেন না সে সকল পিতামাতাদের তাহারা এখন তাহাদের পথের বাধা বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু বয়স্ক লোক মাত্রেই তাহাদের কাছে অরুচিকর হয় না।

যে বয়স্ক লোক তাহাদের সামাজিক কাজকর্মে উৎসাহ দেন, গঠনাত্মক কাজে সাহায্য করেন, তাহাদের হৃদয়ানুভূতি বোঝেন এবং সুখদুঃখের ভাগী হন এমন বয়স্ক লোক তাহাদের খুবই প্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহার সঙ্গ তাহাদের একান্ত প্রার্থিব হয়। যাহা হউক তাহারা একটু বড় হইয়া উঠিলে স্বাভাবিকভাবেই তাহারা বড়দের সঙ্গ পাইতে চায় এবং বড়দের মতন করিয়াই কথাবার্তা কয়। সাধারণত দেখা যায় বয়স্ক ব্যক্তিরা কিশোর কিশোরীদের সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন না ; সেইজন্য তাহাদের কাছ হইতে তাহাদের শিখিবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

প্রাক্-কৈশোরে নিজ সমবয়সীদের দলের সহিত কিশোর-কিশোরীর যে একাত্মতা জন্মায় তাহাই পরবর্তী কৈশোরে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি ঘনিষ্ঠ হইবার পথকে সুগম করিয়া দেয়। এইরূপ ঘনিষ্ঠতার স্বাভাবিক পরিণাম বিবাহে এবং পারিবারিক জীবনে আগ্রহ এবং তাহা হইতে নিজেদের পুত্রকন্যা লাভ করা। অন্য ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি ভালবাসা এবং সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়াও মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইতে পারে।

কৈশোরে মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা দুই এক বৎসর আগে থেকেই সামাজিক সচেতনতা ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ দেখাইতে থাকে।

কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক আচরণ কিরূপ হইবে তাহা বহুলাংশে নির্ভর করে কিরূপ পরিবার হইতে তাহারা আসিয়াছে। পরিবারের সামাজিক মান তাহাদের আচরণে প্রতিফলিত হয়। তবে তাহাদের আচরণের উৎস যে কেবল পরিবারের পদমর্যাদার মধ্যেই সর্বক্ষেত্রে নিহিত থাকে তাহা নহে। মানসিক সামর্থ্য, স্বভাব, দৈহিক রূপ এবং অন্যান্য অবস্থা ইহাদের মিলিত প্রভাব আচরণের উপর পড়িতে পারে। প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় সামজিক উচ্চ নীচতার দূরত্বকে কমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। কৈশোর এই দূরত্বকে ঘুচাইয়া ফেলিবার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় তাহারা আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন আর্থিক সামাজিক স্তরের কিশোর কিশোরীরা যদি একসঙ্গে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতে পায় তাহা

হইলে তাহাদের মধ্য হইতে সামাজিক ব্যবধান দূর হইয়া যায়। এইরূপ সক্রিয় আদান প্রদানের মধ্য দিয়াই তাহারা এমনভাবে চিন্তা, অনুভব ও কাজ করিতে শিখে যাহা তাহাদের প্রগতিশীল করিয়া তুলে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এমন জিনিস রাখিতে হইবে যাহাতে কিশোর কিশোরীরা মানুষের ব্যক্তিত্ব কিভাবে বিকশিত হয় এবং মানুষের নানাপ্রকার আচরণের কারণ কি তাহা উপলব্ধি করিতে সাহায্য পায়।

অনেক কিশোর কিশোরী সমাজ সেবামূলক কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং এইরূপ কাজ করিবার জন্য অনেক সুযোগও পায়। শিক্ষা যদি সমাজ গঠনের শিক্ষা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই তাহার বিদ্যালয় ও পল্লীকে আরও স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, সুন্দর ও উৎপাদনক্ষম করিয়া তুলিতে সুযোগ পায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয়। যে সব কিশোর কিশোরী তাহাদের পরিবারের লোকজন ও সমবয়সী সঙ্গী সাথীদের লইয়া সুখী হইতে পারে তাহারা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিতে দেখা যায়। একত্রে বসবাস করিবার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলেই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রধানত হইয়া থাকে। শিক্ষা দিয়া চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করা যায় না—জীবন্ত অভিজ্ঞতার রসায়নের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

ধর্মভাবের পরিণমন।

জীবনের মূল্যবোধ, জীবনদর্শন এবং জগত সম্বন্ধে ধারণা মানুষের যেমন যেমন বাড়িতে থাকে তাহার ধর্মবোধও তেমন তেমন পরিপক্ক হইতে থাকে। ধর্মভাবের বিকাশ নিঃসঙ্গভাবে হয় না। জীবনের অন্যান্য দিক বিশেষ করিয়া মানবিক সম্বন্ধের সহিত ধর্মভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। পূজা, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনার সময় মন্দিরের শান্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষ তাহার হইতে বিরাট ও মহতের সহিত তাহার জীবনকে মিলাইয়া দেখিতে পারে। ভগবান বা অন্য কোন উচ্চ আদর্শের সান্নিধ্যে সে নিজ আত্মসত্তাকে অনুভব করে বৃহতের ও মহত্বের প্রেরণা তাহার দেহমনকে স্পন্দিত করে। যে বিরাট ও

মহতের পূজা তাহার সমাজের সকলে করিতেছে তাহাতে তাহার নিজের পূজার নৈবদ্য মিলাইয়া দিয়া সমগ্র সমাজের সহিত একাত্মতা বোধ করে—তাহার মধ্যে এক পরম নিশ্চিন্ততা বোধ জন্মে। ধর্মভাবের ভিত্তি শৈশবেই স্থাপিত হয়। পরবর্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে শৈশবকালের ধর্মভাব বিলীন হইয়া যাইতে পারে অথবা ইহা ক্রম পরিণতী লাভ করিতে থাকে।

সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দুইয়ের ফলেই উৎপন্ন হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শন—এইসব বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে করিতে কিশোর কিশোরীরা জগত সংসার সম্বন্ধে এবং ইহার মধ্যে তাহার স্থান কোথায় এ সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করিতে থাকে। যে সভ্য সমাজে তাহারা বাস করে তথাকার প্রথা ও সংস্কারকে খানিকটা মানিয়া চলিতে হয়—এইভাবে চলিতে পারিলে সফল জীবন যাপন সম্ভব হয় ইহা তাহারা অনুভব করিতে শেখে। তাহারা আরও বুঝে যে কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য, মনোভাব এবং আদর্শ মিলিয়া মিশিয়া নৈতিক ঔচিত্য বোধের সৃষ্টি করে এবং এই বোধই মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে। মানুষ যতই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে সফলভাবে বাঁচিতে গেলে নিজের যাহা কিছু শক্তি সামর্থ্য আছে, তাহা উৎসাহের সহিত ও কার্যকরী-ভাবে কাজে লাগাইতে, ফলদায়ক লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রযত্নশীল হইতে, অন্যদের সহিত সহযোগিতা করিতে, ব্যর্থতা সহন করিতে ও ভগ্নোদ্যম না হইতে, অধ্যব-সায়ী হইতে, দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নিজস্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালবাসা দেখাইতে হইবে। যাহার আচরণে এই গুণগুলি যতবেশী প্রকটিত হইবে সে ততই পরিণত মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরিণত ব্যক্তিত্ব জীবনের একটি ফলদায়ক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য খুঁজিয়া পায়। এইরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য জীবনকে একটি ঐক্য দান করে, বিচার-বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আচরণকে পরিচালিত করে। জীবনের যে-সব ক্ষেত্রে মানুষকে তাহার হাতের কাজ বা কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য মনে-প্রাণে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে

থাকিতে থাকিতে তাহার সুসমন্বিত ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। যে-সব কাজ গঠনাত্মক, প্রাণবন্ত, চেষ্টাসাধ্য এবং কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী সেইসব কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্যক্তিত্বের সুষমতা বাস্তব জীবনে পূর্ণরূপে সাধিত দেখা যায় না তবে পূর্ণ সুষম ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। কিশোর বা কিশোরী কি হইয়া উঠিবে তাহার একটিমাত্র সম্ভবনাই থাকে—কয়েকটি সম্ভবনা থাকিতে পারে না। কোন্ ব্যক্তিসত্তা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণীয় হইবে এবং তাহার লাভযোগ্য হইবে তাহার একটি ধারণা গড়িয়া তুলিতে সে চায়। পরস্পর বিরোধী প্রবণতাগুলির একটি সন্তোষজনক সমন্বয় সাধন করিতে না পারিলে বা যদি আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের বিরাট ব্যবধান থাকে তাহা হইলে তাহার পরিণাম নঞর্থক আচরণ (অর্থাৎ সব কাজেই বাঁকিয়া বসা, খেয়ালখুশীমত দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া, অসহযোগিতা করা ইত্যাদি), দুষ্ক্রিয়তা, মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং মনোব্যাধি সুরাসক্তি এবং আত্মহত্যা হইতে পারে। মানুষ যখন নিজেকে নিশ্চিন্ত, আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট মনে করিতে পারে না তখন সে তাহার আত্মবোধ বা অহংএর মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা দেখাইবার জন্য নঞর্থক আচরণের আশ্রয় লয়। এইভাবে নিজের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস অতি নিম্নশ্রেণীর ও অপরিণত মনের পরিচায়ক। দুষ্ক্রিয়তা, মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং মনোব্যাধির কবলে পড়িলে মানুষ তাহার শক্তিসামর্থ্য গঠনাত্মক কাজকর্মে প্রয়োগ করিতে পারে না তাহার সমস্ত শক্তি ধ্বংসাত্মক কার্যে বা নিরর্থক ভাবে অপচয়িত হয়। জীবনের প্রক্ষোভজনিত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ মদ্যপান করিয়া মাতাল থাকিতে চায়। দুঃখ বেদনা বা অত্যন্ত তীব্র অসন্তোষ বা অতৃপ্তি যখন নিদারুণভাবে অসহ্য হইয়া উঠে তখন নিজেকে সরাইয়া ফেলিবার অন্তিম উপায় আত্মহত্যার আশ্রয় লয়।

বৃত্তি বিষয়ে পরিণমন।

আমাদের দেশে কৈশোরে ছেলেদের বৃত্তি বিষয়ে সামর্থ্য অর্জন করা একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা

ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থায় কিশোর কিশোরীরা তাহাদের শক্তিসামর্থ্য, সুযোগ-সুবিধা ও আগ্রহ অনুসারে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন করিতে পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে এবং পরে সেই বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে পারে।

বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশায় বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধির দরকার হয়। কিন্তু বৃত্তি নির্বাচনে বুদ্ধিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইতে পারে না। শারীরিক আকার ও রূপ, সামাজিক বুদ্ধি, প্রক্ষোভিক বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-গুলিকেও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। হাতেনাতে কাজ করিতে গিয়া কাজের সঙ্গে ও সহকর্মীদের সহিত কিশোর বা কিশোরী কিভাবে অভিযোজন করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে কারণ সার্থক নৈপুণ্য ও অভিযোজনের মধ্য দিয়া বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করা যায়।

বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ (vocational guidance) দানের আগে শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ (educational guidance) দান করা প্রয়োজন। কোন শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষাগত সম্ভাবনাগুলিকে যদি বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে সময় আসিলে সে কোন বৃত্তিতেও পারদর্শী হইয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

কিশোর বা কিশোরীকে বুঝিবার উপায়।

কিশোর বা কিশোরীর সম্পর্ক তাহার পিতামাতার সহিত কিরূপ ছিল এবং বর্তমানে তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। পরিবারে তাহার ভূমিকা কি এবং তাহার জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনা যে তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বের সহিত গতিশীল সম্বন্ধে সম্পর্কিত তাহা অনুভব করিতে হইবে। তাহার পরিবেশের পরি-প্রেক্ষিতে তাহার জীবনকে দেখিতে হইবে এবং সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথম খণ্ডে বর্ণিত শিশু সমীক্ষার অন্যান্য পদ্ধতিও এই বিষয়ে আলোকসম্পাত করিতে পারিবে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে কৈশোরে মানুষ তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িবার একটি সুবর্ণ সুযোগ পায়। শৈশবে অশুভ অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও আবার শুভ পরিণামের অভিমুখে জীবনকে চালনা করা এই সময় সম্ভব কেননা জীবনের ভারসাম্য এখন পরিবর্তনশীল হইবার উপযোগী থাকে। শৈশবে যে বাহিরের জগৎকে শত্রুভাবাপন্ন ও ভীতিপদ অনুভব করিয়াছিল এখন যদি সে এমন পরিবেশে থাকে যেখানে অন্যেরা তাহার অনুভূতিকে ও মনোভাবকে সহানুভূতির চোখে দেখে এবং তাহাকে সাদরে স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে সে বুঝিতে পারে যে জগতের সকলেই তাহাকে ব্যর্থকাম ও পরাজিত করিবার জন্য উদ্যত নয়, স্নেহ ভালবাসার পরশও এখানে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে পূর্বের বদ-অভ্যাসগুলি ত্যাগ করিয়া নূতন মানুষ হইয়া যাইতে পারে। সে তখন নূতন আশায় বুক বাঁধে যে তাহার জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাদ উপভোগ করিতে পারিয়া সে অন্ততঃ কিছুটা আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। জীবন যাপনের নানা কৌশল শিখিবার প্রশস্থ ও ফলপ্রদ কাল হইতেছে কৈশোর। সেই কিশোর বা কিশোরীকে আমরা পরিণত বলিব যে তাহার আবেগের শক্তিকে গঠনাত্মক কাজে লাগাইতে, ফলপ্রদ কাজকর্মে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে, অবস্থাকে আপন চেষ্টায় পরিবর্তন করিতে বা অবস্থার প্রতি আপন মনোভাবের পরিবর্তন করিতে এবং যে অবস্থাকে সে নিজের চেষ্টায় পরিবর্তন করিতে পারে না তাহার সহিত মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছে। অন্যদের সহিত এখন সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এবং সেই সম্বন্ধকে নানাভাবে ফলপ্রদ ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলিতে শিখিয়াছে। আত্মপোলব্ধি হওয়ায় এখন সে অন্ধের মত কাজ করে না। সেই কিশোর বা কিশোরীই সুখী হইতে পারে যে জানে যে জীবনে কিছু উত্থানপতন থাকা সত্ত্বেও সে ক্রমশঃই সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ব্যক্তিত্ব কি ?

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ আছে। তাহার শারীরিক আকার প্রকার, হাবভাব, কথা, চিন্তাভাবনা, প্রক্ষোভ, অভ্যাস ও সামর্থ্য এইসব লইয়াই তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করে না সব বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিতভাবে একই সঙ্গে কাজ করে এবং বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ের যে অখণ্ড রূপ তাহাকেই ব্যক্তিত্ব বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল হইয়া উঠিতে পারে এবং ব্যক্তিত্বের অন্যগুণগুলি তখন ক্ষীণপ্রভ হইয়া যাইতে পারে কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিত্বের কোন গুণকেই আমরা বাদ দিতে পারি না। শিক্ষার দ্বারা অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যরই রূপান্তর ঘটান সম্ভব।

ব্যক্তিত্বের গঠন

শিশু তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সম্ভবনাগুলি লইয়া আসে তাহাদের ভালরূপে বুঝিতে হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলি যেমন দৈহিক গড়ন, মানসিক সামর্থ্য, প্রক্ষোভ, স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা এবং পরিবেশ—এগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে এই সবগুলি প্রভাবই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অখণ্ডরূপে ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। এইগুলি আবার এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যাহাতে বাহিরের জগতের সহিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তাহারা ব্যক্তিত্বের মধ্যে সুসমঞ্জস ও সঙ্গতিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বংশগতির উপর সংস্কৃতির প্রভাব।

ব্যক্তিত্ব কতটা বংশগতি ও কতটা পরিবেশের ফল তাহা বিবেচনা যোগ্য। এ বিষয়ে একটি তুলনার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। কোন তন্তুবায়,

কুম্ভকার বা কর্মকারের (কামার) তাহার কাজের জন্য কাঁচা মালমশলার দরকার হয়। তুলা, মাটি ও লোহা তাহাদের কাজের জন্য প্রয়োজন হয়। এইসব উপাদানের সাহায্যে তাহরা নানাপ্রকার জিনিসপত্র তৈয়ার করে। কিন্তু কিরূপ জিনিষ নির্মিত হইবে তাহা নির্ভর করে শিল্পীর কর্মদক্ষতার উপর —কিরূপ কৌশল ও নৈপুণ্য লইয়া সে উপাদানকে অভীষ্ট পরিণতির দিকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। শিল্পী যদি পটু না হয় তাহা হইলে উপাদান যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন তাহা হইতে যে জিনিস নির্মিত হইবে তাহা আকর্ষণীয় বা কাজে লাগিবার যোগ্য হইবে না। আবার সুদক্ষ শিল্পীর হাতে ঐ একই উপাদান উৎকৃষ্টতম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। উপাদান কিছু নিকৃষ্ট হইলেও সুদক্ষ শিল্পীর সুবিবেচনা ও নৈপুণ্যের গুণে উত্তম জিনিসে পরিণত হইয়া উঠে। সদ্যজাত শিশুর সম্পর্কেও এই কথা সত্য। সে তাহার ব্যক্তিত্বের কাঁচা মালমশলাগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য এই কাঁচা মালমশলা বা সম্ভবনাগুলির উৎকর্ষতা বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন হয় একথা মানিয়া লইয়াও বলা যায় যে এই সম্ভাবনাগুলিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে যাহাতে এই আদি শক্তি ও সম্ভাবনাগুলি নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়া বিকশিত ও সুসংহত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। উপরের তুলনা অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে উত্তম সম্ভাবনা লইয়া যে ভূমিষ্ঠ হইল সুশিক্ষা ও সুপরিবেশের অভাবে তাহাকে সুখী করিতে বা সমাজের কাজে নাও লাগিতে পারে। আবার যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সম্ভাবনা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে সে যদি উত্তম শিক্ষা পায় এবং উত্তম পরিবেশে তাহার সম্ভাবনাগুলিকে সফলভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সুযোগ পায় তাহা হইলে সে নিজের সুখ শান্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে—সুনাগরিকে পরিণত হইবে।

জন্মগ্রহণের পর হইতেই শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভবনাগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে নানাপ্রকার অভ্যাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া। প্রথম শৈশবে বিশেষ করিয়া ছয় বৎসর বয়সকাল অবধি শিশুর যে অভ্যাস ও মনোভাব

গঠিত হয় দেখা গিয়াছে সেগুলি তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবনের আচরণের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং জীবনের এই সময়টি ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় পিতামাতাকে সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। এখন তাঁহারাই শিশুর জীবন শিল্পী। শিশুর সম্ভাবনাগুলি লইয়া তাঁহাদের তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করিতে হইবে। কুঁড়েমী করিয়া বা অন্ধ স্নেহের বশে এসময় তাহাকে সমাজ অভিপ্রেত পথে মানুষ করিয়া তুলিতে না পারা মানে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করা। এখন ছেলে মানুষ পরে সব ঠিক হইয়া যাইবে—এরূপ ধারণা খুব ভুল। চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ এখনই গঠিত হইবার সময়। সেজন্য পরিমিত স্নেহভালবাসার মধ্য দিয়া দিয়া শিশুর শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তাহাকে অভিপ্রেত পথে লইয়া যাইতেই হইবে। মায়ের অবহেলার ফলে শিশু যদি স্বার্থপর হইয়া পড়ে বা আত্মসংযমে অভ্যস্থ না হয় তাহা হইলে শিক্ষককে বা সঙ্গী সাথীদের দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। বাড়ীতে মন্দ অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে বিদ্যালয়ে কোন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তাহা সুঅভ্যাসে পরিণত হইতে পারে না। শিশুদের অতিরিক্ত শাসন বা দমন যেমন ভাল নয় তেমনি বল্গাহীন ভাবে তাহাদের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়াও ঠিক নয়। অনেকে মনে করেন এসময় শিশুদের প্রকৃতি যাহা চায় নির্বিচারে তাহাই করিতে দেওয়া উচিত। বুদ্ধদেব বসুর লিখিত ছোটদের গল্পের বই 'রান্না থেকে কান্না'য় Shoe-শিক্ষা নামে যে গল্প আছে তাহাতে তিনি অপূর্ব লিপিকুশলতার সহিত এই বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'বেশী 'লাই' পাইলে শিশু প্রকৃতি কি বিশ্রী ও অসহনীয়-ভাবে অসামাজিক হইয়া উঠে তিনি তাহার একটি উপভোগ্য চিত্র আঁকিয়াছেন। এইরূপ শিশুদের দুষ্টামিকে ও নষ্টামিকে পিতামাতারা মৌলিক বা প্রতিভার কার্য বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কিন্তু এইভাবে তাহাদের বাড়িতে দিলে ভবিষ্যতে তাহারা কি হইবে তাহা জানিলে তাহাদের আঁৎকাইয়া উঠিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সমাজের মধ্যে থাকিয়া হয়—একলা একলা হয় না। পরিবেশের অসংখ্য রকমের প্রভাব

সূক্ষ্মভাবে ও অলক্ষে ব্যক্তি সত্বার সহিত মিশিতে থাকে এবং ব্যক্তিত্বকে রূপদান করে।

ব্যক্তিত্বের উপাদান

দৈহিক গঠন এবং স্বাস্থ্য।

দৈর্ঘ্য, ওজন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও আয়তন, চোখ ও চুলের বর্ণ ও বাহার গায়ের রঙ, শরীরের আনুপাতিক বৃদ্ধি এবং দৈহিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সব শিশু সমান স্বাস্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। যে শিশু দুর্বল হইয়া জন্মায় তাহার সেবা-যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ একটু বেশী করিয়া করিতে হয়। কিন্তু সেবা-যত্নের ফলে তাহার বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলেও বড়রা তাহাকে অতিরিক্ত আদর দেন এবং তাহার সব রকম ইচ্ছা পূরণ করেন। ফলে এরূপ শিশু যে আত্মসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব লইয়া শিশু তাহার সঙ্গী সাথীদের সহিত মানাইয়া চলিতে পারে না এবং তাহার সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়। প্রায়ই দেখা যায় একমাত্র সন্তান হইলে তাহার সামান্যতম অসুস্থতাকে গভীর উদ্বেগের সহিত দেখা হয় এবং তাহার চিকিৎসা ও মানুষ করা লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়। ইহার ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ত উৎপন্ন হয়ই তা'ছাড়া শৈশবে তাহার অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার এই বিপুল প্রয়াস ও উদ্যোগ দেখিয়া সে বড় হইয়া জীবনটাকেই আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকে এবং জীবনের সমস্যাগুলি স্পষ্টরূপে দেখিতে ও তাহাদের সহিত যুঝিতে ইতঃস্তত করে। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই সে পিতামাতার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষকে কখনও স্বাবলম্বী হইতে দেয় না।

অন্যপক্ষে শিশু যদি দীর্ঘায়ত ও অসাধারণ সুস্থ হইয়া জন্মায় তাহা হইলে পিতামাতা তাহার সম্বন্ধে সকলের কাছে বড়াই করিয়া বেড়ান। বাড়ীতে লোকজন বেড়াইতে আসিলে শিশু যে বয়স অনুপাতে কত বড় এবং সব সময়ই সে তাহার সমবয়সীদের অপেক্ষা দৈহিক বৃদ্ধিতে আগাইয়া যাইতেছে—তাহার

অপেক্ষা বড় ছেলে মেয়ের জামা কাপড় সে পরিতেছে—এই সব বিষয় তাহাদের শোনান হয়। ইহার ফলে শিশুর মনে অহংকার জন্মায় এবং সে যে তাহার সমবয়সীদের থেকে শ্রেষ্ঠ এই আত্মাভিমানের ফলে তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের স্থষ্টি হয় এবং তাহার সামাজিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। শরীরে বড় হইলেই পরিপক্ক হওয়া যায় না। কিন্তু অনেক সময় বড়রা তাহার কাছে তাহার দেহের বাড় অনুযায়ী আচরণ প্রত্যাশা করেন। ইহার ফলে সে যে বিফলতার সম্মুখীন হয় তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

চোখ, চুল ও গায়ের রঙও ব্যক্তিত্বের দৈহিক উপাদান হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভাইয়ের হয়ত ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম আছে কিন্তু বোনটি বিরলকেশা এবং চুল সোজা ও লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকে। বাড়ীতে মন্তব্য করা হয় তোমরা ভাই বোনে চুল বদলা বদলী করিয়া লইলে খুব ভাল হইত। স্বভাবতই বোনটি ভাইয়ের কেশ সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে এবং ভাইটিও তাহার চুল মেয়েদের মত যাহাতে কেহ না বলে তাহার জন্য সজাগ থাকিতে হয়। চোখের ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের বেশী সচেতন করাইয়া দিলে তাহারা অহঙ্কারী হইয়া উঠে এবং খুঁৎখুঁতে স্বভাবের হইয়া পড়ে।

তবে দৈহিক কোন ভাল বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার জন্য গর্ব অহঙ্কার যাহাই হউক না কেন তাহা তত অনিষ্টকর হয় না যত হয় দৈহিক কোন অস্বাভাবিকত্ব থাকিলে। ছেলেদের বেঁটে হওয়া, মেয়েদের অতিরিক্ত ঢ্যাঙ্গা হওয়া, দাঁড়ান বা বড় কাণ হওয়া, অতিরিক্ত বড় হাত বা পা থাকা ইত্যাদি শিশুর জীবনকে নিন্দিত ও দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। সেইজন্য বড়দের এইসব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত নয়। তামাশাচ্ছলে বলিলেও বিদ্রূপ শিশুদের প্রাণে বড় বাজে এবং তাহারা ইহা ভুলিতে পারে না। তবে নিন্দা বিদ্রূপ করা যেমন ঠিক নয় তেমনি শিশুর গড়নের এইরূপ কোন বৈলক্ষণ্য থাকিলে করুণার আধিক্যে তাহাকে অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করাও অশুভ ফলপ্রদ হইতে পারে।

দৈহিক গঠন সম্বন্ধে সুস্থ মনোভাবের বিকাশ।

প্রত্যেক শিশু একটি বিশেষ শারীরিক ধাত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মের এই দানকে লইয়া আহার-বিহার, নিদ্রা-বিশ্রাম, খেলাধূলা-পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা সে তাহার শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ যতটা সম্ভব ঘটাইতে পারে—ইহা ছাড়া তাহার দৈহিক গঠনের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। প্রকৃতির দানকে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লওয়াই ভাল এবং কোন খুঁৎ থাকিলে সে সম্বন্ধে ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। পিতামাতা ও বন্ধু বান্ধবের এই রকম মনোভাব থাকাই বাঞ্ছনীয়। শিশুর দৈহিক কোন অস্বাভাবিকত্ব থাকিলে তাহা বড় করিয়া দেখা উচিত নয়। শিশুর যেন এ বিশ্বাস না জন্মায় যে সে কোনভাবে অস্বাভাবিক। তবে দেহের কোন দোষ থাকিলে সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও শ্রেয় হইবে না কেননা সমাজে থাকিলে দোষটি অন্যদের লক্ষ্যগোচর হইবেই। সেইজন্য শিশুর বুঝিবার মত শক্তি হইলে তাহার দোষকে অনুভব করাই উচিত। তবে সেই সঙ্গে ঐ দোষ হইতে মুক্তি পাইবার এবং তাহা অসম্ভব হইলে উহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অবশ্য স্বীকার করিয়া লইলেই দোষস্খালন হইয়া যায় না—মনের মধ্যে হীনতাবোধ থাকিয়া যায়। সেই কারণে অন্যদিক দিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিলে এই হীনতাবোধ দূর হইয়া যাইতে পারে। সমাজে সে যদি বাঞ্ছিত ব্যক্তি হইয়া উঠে তাহা হইলে দৈহিক ত্রুটির কথা তাহার আর মনে থাকে না।

কোন ছেলের বাড় হয়ত কম। খুব ছোট বেলায় ইহা লইয়া তাহার কোন ভাবনা ছিল না। কারণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং সঙ্গী সাথীদের মধ্যে সে বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু যখন সে উচ্চবিত্যালয়ে পড়িতে গেল তখন সে যে তাহার সমবয়সীদের হইতে বেঁটে তাহা মর্মান্তিকভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু খেলাধূলায় ও স্পোর্টসে সে কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল এবং বক্তৃতায় এবং সংগঠনমূলক কর্মেও তাহার দক্ষতা প্রকাশ পাইল। ইহার ফলে সে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব পাইল। তাহার নেতৃত্বের উচ্চতা তাহার দৈহিক খর্বতাকে জয় করিল। কোন মেয়ের

রঙ কালো হইতে পারে কিন্তু তাহার গলা এত মিষ্টি এবং এমন সুন্দর গান গাইতে পারে যে সকলেই তাহার কাছে আসিয়া ভীড় করে এবং নানা সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানে তাহার ডাক পড়ে। তাহার এই সামাজিক সম্মান তাহার কালো রঙকে ভুলাইয়া দিয়াছে।

সমাজে তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা হইতেছে বা না হইতেছে সে সম্বন্ধে তাহারা যতটা সচেতন থাকে বড়রা তাহা অনুভব করিতে পারেন না। চেহারা দেখিতে কেমন এবিষয়ে প্রশংসা সূচকই হউক বা বিরূপই হউক কোনরূপ মন্তব্য যত কম করা যায় ততই ভাল। দেহ সৌষ্ঠব কিরূপ তাহার উপর জোর না দিয়া ভাল আচরণের উপরই জোর দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে বড়দের বেশ দায়িত্ব রহিয়াছে। শিশুর শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত সকলেরই এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং শিশু যাহাতে তাহার শারীরিক ধাতকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং এ সম্বন্ধে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোভাব গঠন করিতে পারে তাহাতে সাহায্য করা উচিত।

মানসিক সামর্থ্য।

দেহ ব্যক্তিত্বের একটি উপাদান সন্দেহ নাই কিন্তু উপাদান হিসাবে মন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা ইহাই ব্যক্তিত্বকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে। জগতের অনেক মনীষী ও মহাপুরুষদের দেহ সুগঠিত ও সুন্দর হয় নাই কিন্তু তবুও তাঁহারা উজ্জল ব্যক্তিত্ব সম্পদে অতুলনীয় ছিলেন। মানসিক দৈন্য থাকিলে সৌষ্ঠবযুক্ত লাবণ্যময় দেহও ব্যক্তিত্বের দিক হইতে ক্ষীণপ্রভ হইয়া থাকে।

সেইজন্য বাপ-মায়েরা মানসিক সামর্থ্যের উপর বেশী জোর দেন এবং তাহাদের বুদ্ধি যেরূপই হউক তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের তাঁহারা এক এক জন প্রতিভাধর সন্তান বলিয়া মনে করেন এবং বুদ্ধির কাজে তাহারা অন্য ছেলেমেয়েদের হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ হইবে এবং সকলকে তাক লাগাইয়া দিবে বলিয়া উচ্চাশা পোষণ করেন। সন্তান যদি এইরূপ শুভ লক্ষণ না দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং তাহাকে ধিক্কার দেন।

এইরূপ অবস্থা আরও গুরুতর হয় যখন বাড়ীতে অন্য কোন ছেলেমেয়ে যদি বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন তাহার সহিত তুলনা করিয়া শিশুকে অপদস্থ করা হয় এবং তাহার মনে একটি হীনতা বোধ ও পরাজয়ের ভাব জাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাহাকে এই তুলনামূলক মনোভাবের জন্য শৈশবের আনন্দ হইতে অনেকটা বঞ্চিত থাকিতে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে শিশু যদি বেশী মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির জোরে সে খুব তাড়াতাড়ি শিখিতে পারে এবং বয়স্করা তাহার কাছ হইতে যাহা প্রত্যাশা করেন তাহা করিতে সে তৎপর হয়। তাঁহাদের মনমেজাজের সহিত সে মানাইয়া চলিতে শেখে। নাম, সংখ্যা ও ছড়া সে মুখস্থ রাখে এবং বাড়ীর লোকদের কাছে ও বাড়ীতে অতিথি আসিলে তাহাদের কাছে তাহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি প্রদর্শন করে। এইভাবে সে তাহাদের সপ্রশংস সমাদর লাভ করে। এইরূপ মেধাবী শিশুরা তাহাদের সমবয়সীয়দের সহিতও বেশ মানাইয়া চলিতে পারে। তবে এইরূপ শিশু অনেক সময় নিজের সম্বন্ধে এমন একটি স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করিতে পারে যাহার ফলে সে তাহার অন্য কম বুদ্ধিমান সঙ্গী সাথীদের কাছে অপ্রিয় হইয়া যাইতে পারে। সে নিজে কি কারণে অন্যরা তাহাকে অপছন্দ করিতেছে বুঝিতে না পারায় যে দলগত জীবন তাহার কাছে অপ্রিয় ঠেকে তাহা হইতে নিজেকে সরাইয়া নিজের ভাবে বিভোর থাকে অথবা যে বয়স্ক লোকেরা তাহার কদর বুঝে তাহাদের মধ্যে থাকিতে চায়।

প্রথম শৈশবের অভিজ্ঞতা যদি এমন হয় যাহার ফলে এইরূপ মেধাবী শিশুর ব্যক্তিত্ব আপনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা হইলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পরও তাহার এ অবস্থা ঘুচেনা। এইরূপ আবদ্ধ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ এই যে সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া আত্মভাবে জীবন যাপন করা। পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যের জন্য বিদ্যালয়ে আসিবার আগেই লেখাপড়ায় সে আগাইয়া থাকে। এখন বিদ্যালয়ে আসিয়া সে পড়াশুনায় অন্যদের অপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলেও লেখাপড়ার বাইরে খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি সামাজিক জীবনে সে সাফল্যের সহিত অংশ গ্রহণ করিতে

পারে না। সে নিজেকে দলছাড়া দেখিয়া শিক্ষকের সমাদর পাইবার জন্য উৎসুক হয়। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কাজে তাহার সাফল্য তাহার সঙ্গীদের মনে আরও বিদ্বেষ জাগাইয়া দিতে পারে এবং শিক্ষকের আদরের পাত্র বলিয়া উপহাসাস্পদও হইতে পারে। সে হয়ত তাহার মত আর কয়েকজনকে তাহার দলে পায় তবে এই ক্ষুদ্র দলকে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত বলিয়াই মনে করে। এইরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকিলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যে স্বাভাবিক ধারায় হইবে না তাহা আর বিচিত্র কি। লেখাপড়ায় তাহার আগ্রহ থাকে, তাহার পিতামাতা তাহার সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং শিক্ষকও তাহাকে উৎসাহিত করে। এইসবের ফলে শুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে তাহার সমবয়সীদের থেকে অনেক আগাইয়া থাকে বটে কিন্তু স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত রাখে। ইহা ছাড়া অত্যধিক পড়াশুনা এবং দৈহিক কাজ ও খেলা-ধূলার অভাবে তাহার স্বাস্থ্যের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি থাকিবার ফলে কেহ কেহ অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে এবং কোনরূপ পরাজয় সহিতে পারে না। এইরূপ শিশু খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে না এই কারণে যে সে হয়ত হারিয়া যাইতে পারে। হারিয়া গিয়াও হার স্বীকার করিতে চাহে না। নিজের অসাফল্যের জন্য দায়ী করে অন্যকে বা খেলার ব্যবস্থাকে। অনেক সময় ছলচাতুরী বা প্রতারণা করিয়া জিতিতে চায়। এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায় যখন নিজের অসাফল্যের জন্য অন্যকে দায়ী করিতে শিশু পিতামাতার কাছ থেকেও উৎসাহ পায়।

প্রতিভা থাকিবার ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সুবিধা ও অসুবিধাগুলি ঘটে তাহা উপরে আলোচিত হইল। এখন যে শিশুর বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম বা যাহার শিখিতে দেরী হয় তাহার কি সমস্যা জীবনে আসে দেখা যাউক। এইরূপ শিশু দেখে যে তাহার দুর্বলতার জন্য সে তাহার পিতামাতার নিকট অনাদৃত, সমবয়সীদের বিদ্রূপের পাত্র। কিভাবে সে পিতামাতা সন্তুষ্ট করিতে পারিবে তাহা ভাবিয়া সে কূলকিনারা পায় না। পিতামাতারা সন্তানের মধ্যে

এই ন্যূনতাকে বুঝিতে পারেন কিন্তু স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক থাকেন। তাঁহাদের একটি ক্ষোভের মধ্যে থাকিতে হয়। শিশু তাঁহাদের আশা মিটাইতে পারে না আবার সন্তান স্নেহে তাঁহারা অপরের বিরূপতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে চান। তাঁহারা অন্যদের বুঝাইতে চাহেন যে সে এখন খুব ছেলেমানুষ, এখনই তাহার মধ্যে পরিণত বুদ্ধির প্রকাশ কিরূপে সম্ভব। বয়সোপযোগী ভাবে ব্যবহার না করিয়া তাহাকে এইভাবে ছেলেমানুষ করিয়া রাখিলে তাহার মধ্যে পরনির্ভরশীলতা বাড়িতে থাকে এবং যেটুকু বুদ্ধির ব্যবহার করিতে সে হয়ত সমর্থ ছিল তাহার সুযোগও পায় না।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন পিতামাতা বিশেষ করিয়া মাতা মনে করেন যে তাঁহার সন্তান অন্য শিশুদের মত সমান বুদ্ধিমান। নিজের সন্তানকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রমাণ করিবার সংগ্রাম সারা বিদ্যালয়ের জীবন ধরিয়াই চলে। ছেলে লেখাপড়া পারিতেছে না তাহার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাই দায়ী। তাঁহারাই ভাল করিয়া পড়াইতে পারে না, দোষ তাঁহাদের, শিশুর নহে। শিশু মনে করেন যে শিক্ষক অন্যদের পক্ষপাতিত্ব করিয়া বা অনুগ্রহ-ভাজন বলিয়া তাহাদের বেশী নম্বর দেন এবং তাহাকে কম দেন। এইরূপ অভিযোগ করিতে পিতামাতাও উৎসাহ দেন। তাঁহারা শিক্ষকের সম্বন্ধে এই বিষয়ে নানারকম নালিশ করেন। কোন কোন পিতামাতা মনে করেন যে পাঠ্য বিষয় তাঁহাদের সন্তানের পক্ষে দুরূহ—অথচ তাহাকে তাহার কুঁড়েমী ও আগ্রহহীনতার জন্য ভৎর্সনা করেন। তাঁহারা চেষ্টা করেন শিশু যাহাতে কঠিন পরিশ্রম করে এবং শিক্ষকও এ বিষয়ে সহযোগিতা চান। যদি বলা হয় যে শিশুটি তাহার যতদূর সাধ্য তাহা করিতেছে এবং জোর করিয়া তাহাকে তাহার সাধ্যাতীত কাজে অগ্রসর করান উচিত নয় তাহা হইলে তাঁহারা এই প্রস্তাব অপমান বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অনগ্রসর শিশুর জন্যও তাঁহারা অম্লান বদনে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকেন। পিতা হয়ত ছেলেকে এই বলিয়া শাসান যে লেখাপড়া ভাল করিয়া করিতে না পারিলে কাজে ঢুকিতে হইবে। এইসব পীড়াপীড়ির

ফল কি দাঁড়ায়? যে কাজ সাধ্যের বাহিরে সে কাজ করিবার জন্য জবরদস্তী করিলে সোজা পথে না পারিয়া বাঁকা পথ ধরিতে হয়। নানারূপ প্রতারণামূলক কাজে শিশু দক্ষ হইতে থাকে এবং তাহাতেও বাধা পাইলে বা বিফল হইতে স্কুল পলাইতে শুরু করে। স্কুলে বিফলতার জন্য, বাড়ীও যদি বিরক্তিকর হইয়া উঠে তাহা হইলে বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রতিভাত হইতে পারে যে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়াই ভাল, বেশী বা কম বুদ্ধি হইলে জীবন ধারণে নানা অসঙ্গতি আসিয়া যায়। এই ধারণা সর্বতোভাবে সত্য না হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে সমাজে যে সব রীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকে তাহা সমাজে যাহারা অধিকাংশ অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদের প্রয়োজন মেটায় এবং সেগুলি তাহাদের বোধগম্য থাকে। সাধারণ বুদ্ধি হইতে উপরে ও নীচে যত সরিয়া যাওয়া যায় ততই সমাজজীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা কষ্টকর হইয়া উঠে। যাহা হউক ইহারা যতদূর সম্ভব সমাজের সহিত যাহাতে মানাইয়া চলিতে পারে তাহার শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ইহাদের দানও সমাজ চায়। তাহারা যাহাতে এই দানে সমর্থ হইতে পারে এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহারই চেষ্টা করা হয়।

সন্তান যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তাহাতে পিতামতার অপ্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা যাহা পারে তাহাদের সন্তান তাহা পারিলে তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের লইয়া বিশেষ কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না এবং শ্রেণীর অধিকাংশর সহিত সমান তালে তাহারা চলিতে পারে। সেদিক থেকে শিক্ষকেরও সুবিধা হয় এবং শ্রেণীর কাজ তাহাকে করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা সচরাচর সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নই হন সেজন্য অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া সন্তান ও নিজেদের জীবনে অশান্তি ও বিরক্তি তাঁহাদের না আনাই উচিত।

টারম্যান প্রতিভাশালী শিশুদের সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় এইরূপ শিশুরা শ্রেষ্ঠ গৃহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। শৈশব হইতে তাহাদের বুদ্ধি, মেধা এবং চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রলক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। শৈশবে যদি দেখা যায় যে যথেষ্ট সাধারণ সামর্থ্য, বিশেষ মেধা, উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্পতা এবং অদম্য অধ্যবসায়ের সমাবেশ হইয়াছে তাহা হইলে পরিণত জীবনে উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব সাধনে সফলতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। এইরূপ মানসিক সামর্থ্য ও চরিত্রের শুভ লক্ষণযুক্ত বালক বা বালিকার জন্য ভবিষ্যতে নেতৃত্বের আসন পাতা থাকে। কতদূর উন্নতি হইবে তাহার সীমারেখা অবশ্য বংশগতি টানিয়া দেয় কিন্তু সীমার মধ্যে প্রতিভাশালী শিশু এবং তাহার অপেক্ষা নিম্ন মানসিক সামর্থ্যের অধিকারী শিশুও উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও চেষ্টার দ্বারা তাহাদের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে, তাহাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে।

প্রতিভাশালী শিশুর লালন-পালনে পিতামাতার গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে শিশু তাহার প্রতিভাবলে জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন লইবে। তাহার মানুষ হইয়া উঠার উপর নির্ভর করে সে ভাল বা মন্দ কি ধরণের প্রভাব অন্যদের উপর বিস্তার করিবে। এইজন্য তাহাকে এমন এক পরিবেশে রাখিতে হইবে যাহাতে সে স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে যেহেতু সে একটি উন্নত ও সূক্ষ্ম নার্ভতন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইহেতু ইহা যাহাতে কার্যভারে অতিরিক্ত পীড়িত না হইয়া পড়ে তাহা দেখিতে হইবে এবং এই কারণে তাহার খাদ্য, নিদ্রা, পরিশ্রম সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাহাতে এগুলি সুশৃঙ্খলভাবে পালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে সে হয়ত তাহার শ্রেষ্ঠ শক্তি সামর্থ্যের বশে নিজেকে অতিরিক্ত খাটাইয়া ফেলিতে পারে। সেইজন্য তাহার শারীরিক সুস্থতার বিষয় সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহার নিজের শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা উচিত নয়। ইহাতে অহঙ্কার বাড়িয়া যায় এবং সামাজিক অভিযোজনে বিঘ্ন ঘটে। তাহাকে ইহাই বুঝান দরকার

যে সব ব্যক্তিই একপ্রকার হয় না ; প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছুটা বিভিন্নতা থাকে। তাহার বুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উত্তম আচরণে অভ্যস্থ করাইতে হইবে। তাহার বুদ্ধি অধিক থাকায় কেন সে এইরূপ আচরণ করিবে তাহার কারণ বুঝিতে পারে। বুঝিয়া সুঝিয়া যে অভীষ্ট আচরণ সে করে তাহাতে তাহাকে গর্ববোধ করিতে শিখাইতে হইবে তবে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে যেসব শিশু এরূপ আচরণ কেন করিতে হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না তাহাদের প্রতি তাহার যেন বিরূপ মনোভাব না জন্মায়। সে তাহার সমকক্ষ শক্তির অধিকারী ছেলেমেয়েদের সহিত যেমন মিশিবে তেমনি তাহার অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ দিতে হইবে। এইরূপভাবে সব রকমের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে ও কাজ করিতে করিতে কিরূপ সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে হয় তাহা সে শেখে। সমাজে নানারকম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই বাস করে সুতরাং সুখী ও সক্ষম হইয়া সমাজে বাস করিতে গেলে সব রকম লোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে, প্রীতিবদ্ধ হইতে ও মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে শিখিতে হইবে এবং সে শিক্ষার আরম্ভ শিশুকাল হইতেই করা দরকার। অন্যদের ঘৃনা করিয়া নিজের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে সুখী হওয়া যায় না।

যেহেতু মেধাবী সেইহেতু তাহাকে বিদ্যালয়ের কাজে অসাধারণ কিছু করাইবার জন্য অতিরিক্ত উত্তেজিত করা উচিত নয়। অল্প বয়সে উচ্চ শ্রেণীতে পড়া বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করাটাকে অনেকে রীতিমত গর্বের বিষয় মনে করেন। কিন্তু দুই তিন বৎসর আগাইয়া থাকাটা এমন কিছু গৌরবের কথা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই প্রথম বয়সে আগাইয়া যাওয়া ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রতিভাশালী শিশুকে তাহার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাখাই উচিত তবে ঐ শ্রেণীতে থাকিয়াই তাহার জন্য এমন কার্যক্রম নির্বাচন করা উচিত যাহাতে সে তাহার মনের খোরাক অপর্যাপ্তভাবে পায় (enriched curriculum)। এইসব প্রতিভাশালী শিশুদের

নানাবিষয়ে যোগ্যতা থাকায় তাহারা নানা কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় কোন একটি বিষয়ে পুরাপুরিভাবে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। অনেক প্রতিভাশালী শিশু একই বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আগ্রহী হইয়া উঠিতে থাকে। এইসব শিশুরা অনেক বিষয়ে কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু কোন বিষয়ের উপরে পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারে না। একথা অনস্বীকার্য যে ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা লাভ একান্ত দরকার কিন্তু এই সব শিশুরা প্রতিভাশালী হইয়াও অনেক সময় তাহাদের আগ্রহের অতিরিক্ত বৈচিত্র্যের জন্য জীবনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তাহারা কি কি বিষয়ে আগ্রহী তাহা জানিবার জন্য প্রতিভাশালী শিশুদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া দরকার কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহা তাহার জীবনের সর্বপ্রধান বিষয় হইবে তাহা নির্বাচনে তাহাকে সাহায্য করা উচিত। অন্য আগ্রহের বিষয়গুলি তাহার সখের বিষয় হইয়া থাকিতে পারে। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। জীবনের প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিত্ব সুসংহত হইয়া উঠে এবং ইহা নিজের মনোমত হওয়ায় জীবন ধন্য হয়। ইহাই জীবিকা অর্জনের উপায় হইয়া ব্যক্তিত্বের সুসমন্বয় সবদিক দিয়াই সাধিত হয়। অবশ্য কখনও কখনও দেখা যায় যে কোন সখের বিষয়ও ভবিষ্যতে জীবনের একমাত্র সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

যে শিশুর মানসিক সামর্থ্য কম তাহার সম্বন্ধে কিছুটা ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সে যে সাধারণ শিশুদের থেকে পিছাইয়া আছে এই সত্যকে পিতামাতার স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। অনগ্রসর শিশুমাত্রেই সমাজের বোঝা এইরূপ ভাবিবার কোন যুক্তি নাই। বুদ্ধি কম থাকিলেও কেহ যত্ন ও নির্ভুলতার সহিত একই ধরণের কাজ নিষ্ঠার

সহিত করিতে পারে। সমাজে এইরূপ বহু কাজের সুযোগ আছে এবং প্রখর বুদ্ধিশালী লোক অপেক্ষা কম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই এইসব কাজ সুচারুরূপে করিতে পারে। নানা শিল্প, ব্যবসায় ও সরকারী কাজকর্মে এইরূপ লোকের চাহিদা খুবই বেশী। সুতরাং অনগ্রসর হইয়া সমাজকে বিড়ম্বিত করিতেই হয় না বরং সমাজকে অনেক প্রকারে সেবা করিতে পারা যায়। ব্যক্তিত্বের অন্য কোনদিকের বিকাশ সাধনের দ্বারা মানসিক সামর্থ্যের অভাবটুকু যাহাতে পোষাইয়া লওয়া যায় পিতামাতা সেইভাবে তাঁহাদের সন্তানকে উৎসাহিত করিবেন। পিতামাতা ও শিক্ষকের একথা মনে রাখা দরকার যে বুদ্ধি যদিও ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ শক্তি কিন্তু সামাজিক সাফল্য লাভের জন্য ইহাই একমাত্র শক্তি নহে। সমাজে প্রখর বুদ্ধিশালী লোকদের অপেক্ষা কম মানসিক সামর্থ্যযুক্ত লোকেরাই সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াও সুখে বাস করে।

প্রক্ষোভ।

ব্যক্তিত্বের আর একটি উপাদান প্রক্ষোভ। কর্মের ও আচরণের প্রেরণা প্রক্ষোভ হইতেই আসে। প্রক্ষোভের প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর। ইহার ফলেই প্রক্ষোভ প্রকাশের বিশেষ বিশেষ জটিল অভ্যাস গড়িয়া উঠে। সমাজ-অনুমোদিত ও সমাজ-অননুমোদিত দুই প্রকার আচরণেরই উৎসমূলে থাকে প্রক্ষোভের তাগিদ।

মানুষের জীবনে প্রক্ষোভ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। অতি শৈশব হইতে মানুষের মধ্যে প্রক্ষোভের বিকাশ হইতে দেখা যায়। জন্মের সময় ইহা উত্তেজনার রূপে দেখা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রনাবোধ ইত্যাদি শারীরিক অস্বস্তি ঘটিলে শিশু চঞ্চল হইয়া উঠে এবং কাঁদে—এইভাবে সে তাহার উত্তেজনা জানায়। তিনমাস বয়স হইতে হইতে এই উত্তেজনা দুইটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই উত্তেজনা এখন শারীরিক অস্বস্তি বা অসন্তোষ থাকিলে দুঃখবোধরূপে প্রকাশ পায় এবং শারীরিক স্বস্তি বা সন্তোষ থাকিলে আহ্লাদরূপে প্রকাশ পায়। এক বৎসর বয়স হইতে হইতে এই দুই মূল রূপ আবার আরও

বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। দুঃখবোধের প্রকাশ তিনভাবে হইতে থাকে: ভয়, ক্রোধ ও বিরক্তি এবং আহ্লাদ প্রকাশ পায় উল্লাস ও স্নেহভাবে। মানুষ যত বড় হইতে থাকে ততই সে তাহার প্রক্ষোভের প্রকাশকে সংযত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু দেখা যায় আমরা আমাদের আচরণকে বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলেও আমাদের ভিতরের গূঢ় কামনা বাসনাগুলিই বার বার আমাদের আচরণকে রঞ্জিত করে—নানাভাবে তাহাদের প্রভাব আমাদের কার্যকলাপের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কোন কোন চরম অবস্থায় ভদ্র ব্যবহার লোপ পাইয়া যায়। পৃথিবীতে যত কিছু মহান কীর্তি মানুষ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে তাহার প্রেরণা যোগাইয়াছে আবেগময় জীবনের অমিত বীর্য এবং বিফলতা ও পরাজয়ের করুণ কাহিনীর পশ্চাতেও আছে প্রক্ষোভের অসংযম বা অপব্যবহার। এইসব গঠনাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কার্যে শারীরিক ধাত এবং মানসিক সামর্থ্য প্রক্ষোভের শক্তিকে সাহায্য করে।

শৈশবে প্রক্ষোভের প্রকাশ।

মা যখন শিশুকে খাওয়ান, আদর করেন বা তাহার শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ বিধান করেন তখন মনের আনন্দে সে গদগদ স্বর বাহির করে, মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া আরাম জানায় এবং দেহ ও দুইহাত মায়ের দিকে বাড়াইয়া দেয়। কোন কাজে তাহাকে বাধা দিলে বা ধরিয়া রাখিলে সে অস্থির হইয়া পড়ে ও কাঁদে। উচ্চ শব্দে বা হঠাৎ অবলম্বন রহিত হইলে সে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এইসব প্রারম্ভিক আচরণ বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করিতে থাকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক থেকে এইরূপ বিভিন্ন আচরণ অভিলষিত বা অনভিলষিত দুই-ই হইতে পারে। আদর যত্ন, শারীরিক আরাম শিশুদের পক্ষে তৃপ্তিজনক এবং যাহারা তাহাদের এইরূপ তৃপ্তি দেয় তাহাদের সহিত তাহারা সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করিতে শেখে। আবার অন্তরা যদি তাহাদের অনাদর দেখায় তাহাও তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারে। দেহের আরাম ও বর্তমান চাহিদা মেটানই শিশু জীবনের লক্ষ্য এবং যে সব

বয়স্ক লোক এই লক্ষ্যপূরণ করে তাহারা শিশুর মনোযোগী ও আগ্রহের পাত্র হয়। বড়রা যদি তাহার অভাব মেটাইতে না পারে তাহা হইলে যে ভালবাসা তাহাদের প্রতি ধাবিত হইত তাহা সম্মুখ দিকে না গিয়া যেন নিষ্ক্রিয়ভাবে পিছন ফিরিয়া আসে অথবা দৈহিক অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়া ক্রোধের রূপ পরিগ্রহ করে।

ছোট শিশুদের জীবনে ভালবাসা ও ক্রোধের যেন নিকট সম্বন্ধ। যতক্ষণ খেলনা ও খাবার দিয়া খোকার মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ মা খুবই প্রীতির পাত্র থাকেন কিন্তু যদি কোন কারণে তিনি তাহাকে প্রসন্ন করিতে না পারেন তাহা হইলে প্রীতি তখনই রূপ ধরে ক্রোধের বা ঘৃণার। খোকা তখন ক্ষিপ্ত হইয়া মাকে হয়ত মারিতেই যায়। এই বয়সে প্রক্ষোভ পূর্ণ তীব্রতার সহিতই প্রকাশিত হয়। চাহিদার তাৎক্ষণিক পূরণ না হইলেই শিশু রাগিয়া উঠে। সে বিলম্ব সহিতে পারে না। আবার রাগও তাহার স্থায়ী হয় না, আবার তাহাকে ভুলাইয়া আদর করিলে বা মনোমত জিনিস দিলে সঙ্গে সঙ্গে রাগ জল হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে আবার আসে ভালবাসা। শিশুদের মধ্যে প্রক্ষোভের আলোছায়া সকলেই উপভোগ করিয়াছেন। তাহারা অনেকক্ষণ কিছু মনে রাখিতে পারে না এবং অল্পেতেই তাহাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অবস্থারও পরিবর্তন হয়।

কচি শিশু উচ্চশব্দে বা অপ্রত্যাশিতভাবে অবলম্বণ রহিত হইলে ভয় পায়। স্বভাবত সে শান্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু তাহার পরিবেশে অপ্রত্যাশিত-ভাবে কিছু ঘটিলে সে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, সঙ্কুচিত হয় এবং কাঁপিতে থাকে। পরে বড় হইয়া অপরিচিত কিছু দেখিলে অথবা নিজেকে নিরাপদ না মনে করিলে উপরোক্ত উপসর্গগুলি সে দেখাইতে থাকে; ইহার কারণ যে কোন ভয়ের বিষয়ের সহিত পূর্বের ভয়প্রকাশক লক্ষণগুলি যুক্ত হইয়া যায়। খুব ছোট শিশুকে বকিলে ভয় পায়—ইহার কারণ এই নয় যে সে বকার ভাষা বুঝিতে পারে, কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক তীব্রতা ও রুক্ষতাই

তাহাকে ভয় পাওয়ায়। বড়দের স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তনকে শিশুরা ভয় করে।

বড়দের স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তনের একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ছোট ছেলে বাবলু খেলাচ্ছলে মার সাড়ীর কোণ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। মা তাহার হাতটি ধরিয়া কাঁচিটি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু এবার মার মুখে স্বাভাবিক হাসিটুকু লাগিয়া নাই —মুখ গম্ভীর। খেলার সময়ও ত মা হাত ধরেন কিন্তু এবার মুখের ভাবের এই পরিবর্তন কেন। বাবলুর সাড়ী-কাটার সহিত মার অপ্রসন্নতার যোগাযোগ মোটেই ভাল লাগিল না। পরে আবার সে এইসব ব্যাপার ভুলিয়া গেল এবং আবার কাঁচির অসদ্ব্যবহার করিয়া ফেলিল—এবারও কার্যের ফল ভাল হইল না। শেষ পর্যন্ত বাবলু আর কাঁচির অসদ্ব্যবহার করিতে ভয় পাইতে লাগিল কারণ ইহার ফল সন্তোষজনক নয়।

শিশুর মনোভাবের বিকাশ।

শিশু নিজেকে একজন ব্যক্তি বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে, তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও বন্ধুদের সহিত তাহার যে একটি সম্পর্ক আছে তাহা সে অনুভব করিতে থাকে। এইসব মনোভাব প্রক্ষোভ মূলক। অন্যদের প্রতি তাহার ভালবাসার বা বিদ্বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে স্পষ্ট ও যুক্তি সম্মত উত্তর দিতে পারে না। অন্যরা তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহা দেখিয়াই সে তাহাদের সম্বন্ধে একটা ভালমন্দ অনুভব করে বা 'আঁচ' করে। এটা যেন একটা সামগ্রিক অনুভূতি—ইহাকে সে বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারে না কেন সে কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত এবং কাহারও প্রতি বিরক্ত। কোন খেলা, কোন খাদ্য, কোন খেলনা শিশুর ভাল লাগে আবার কোন কোন খাদ্য, খেলা ও খেলনা তাহার ভাল লাগে না। কেন লাগে বা লাগে না সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। শিক্ষা দিলে কোনটি ঠিক আচরণ ও কোনটি নয় তাহা সে বুঝিতে পারে এবং তদনুযায়ী কাজে অভ্যস্থ হইতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের সার কথা হইতেছে যে শিশুর রুচিবোধ, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা এ সকলই শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশ হইতেই উদ্ভূত হয় এবং যে কাজে সে সন্তোষ লাভ করে তাহার প্রতি মনোভাব তাহার অনুকূল হয় এবং অপ্রসন্নতা বা বিরক্তি উৎপাদনকারী কাজের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাব গঠিত হয়।

শিশুর প্রক্ষোভ জীবন সম্বন্ধে পিতামাতার ধৈর্য ও জ্ঞান দুইই থাকা দরকার। শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক ও মানসিক গুণাগুণ তাহার প্রক্ষোভের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রোগা দুর্বল শিশু একটু বেশী আবেগ প্রবণ হয়। একটুতেই সে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া পড়ে। স্বভাবতই বড়রা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ একটু বেশী করিয়া করেন। ইহার ফলে সে বড়দের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে এবং যে অবস্থা তাহাকে সন্তুষ্ট না করিতে পারে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না এবং তাহার দৈহিক দুর্বলতার দরুণ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে সে খিটখিটে হইয়া পড়ে, অল্পেতেই ভয় পায় এবং ক্রোধোন্মত্ততার বশীভূত হইয়া পড়ে। এইসব শিশুদের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া অবশ্য কর্তব্য কিন্তু ইহাদের লইয়া বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

দৈহিক দৈন্যের কথা বলা হইল। এখন মানসিক সম্পদের একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। খুব মেধাবী শিশুর তাহার মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী বৌদ্ধিক কাজ করিবার প্রেরণা পাওয়া দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে তাহার সাধ্যাতীরিক্ত কাজ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। তাহার দৈহিক পরিপক্বতা যতটা হইয়াছে তদনুযায়ী কাজকর্মেই সে লিপ্ত হইবে। তাহা বাহিরে নয়। যতদূর সম্ভব সাধারণ শিশুদের কাজকর্মে তাহাকে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং সে তাহার সমবয়সী শিশুদের যাহাতে যথেষ্ট সঙ্গ লইবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এরূপ মেধাবী শিশু শুধু মানসিক কাজকর্ম করিয়া তৃপ্ত থাকিতে চায় কিন্তু ইহা

তাহার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। সেজন্য যাহাতে সে যথেষ্ট খেলাধূলা ও সামাজিক মেলামেশা করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আবার যেসব শিশু অল্পমেধী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদেরও মনে এই কারণে যাহাতে আঘাত না লাগে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের মানসিক শক্তির সীমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন শিক্ষা পরিস্থিতি রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সফলতার স্বাদ পায়। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় তাত্ত্বিক, হাতের কাজ, সেবামূলক কাজ ও গঠনাত্মক নানা রকম কাজের মধ্যে যেমন প্রতিভাশালী শিশুরা তাহাদের শ্রেষ্ঠ মানসিক শক্তির অনুশীলন করিবার সুযোগ পায় তেমনি পায় সাধারণ বুদ্ধি ও নিম্ন বুদ্ধির ছেলেমেয়েরা—সকলেই অল্প বিস্তর সাফল্যের তৃপ্তি পায় এবং শিক্ষা কার্যে অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করে।

সর্বশেষে প্রক্ষোভের প্রসঙ্গ এই বলিয়া শেষ করা যায় যে বড়রা তাঁহাদের আচরণে যে পরিমাণ সংযম, নিষ্ঠা ও যুক্তি-যুক্ততা দেখাইবেন ছোটরাও তাহাদের আচরণে সেইরূপ দেখাইতে শিখিবে।

বিশেষ আগ্রহ ও সামর্থ্য সম্ভবনা।

পিতামাতারা সাধারণত অনেক আগে থেকেই তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়া থাকেন। পিতা হয়ত প্রথমে যে বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণবশত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই তিনি তাঁহার সন্তানকে সেই বৃত্তিতে ঢুকাইয়া এখন সন্তোষ লাভ করিতে চাহেন। আবার কখনও কখনও পিতা তাঁহার নিজের বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্যই পুত্রকে প্রস্তুত করিয়া তোলেন। অনেক সময় নিজ বংশের ছেলেমেয়েরা যে বৃত্তি বা পেশার জন্য শিক্ষিত হইতে যায় প্রথানুয়ায়ী পুত্র কন্যাদেরও সেই পথেই পা বাড়াইতে হয়। বংশের ধারা ত বজায় রাখিতে হইবে। মাতারা নিজেদের মধ্যে যেসব সামর্থ্যের বিকাশ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের মধ্যে সেই সব সামর্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

অনেক ক্ষেত্রেই আবার শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কোন পূর্বপরিকল্পনা পিতামাতারা গোড়া থেকে করেন না কিন্তু তাহার মধ্যে কি কি আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে তাহা সদাসর্বদা লক্ষ্য করিতে থাকেন। যদি গাছপালা ফলে-ফুলে শিশু একটু বিশেষ আগ্রহ দেখায় অমনি তাঁহারা ধরিয়া নেন যে সে একজন মস্ত বড় উদ্ভিদবিৎ হইবে। হারমোনিয়মের রিডের উপর হাত দিয়া থাবড়াইলে বা সেতার বা এসরাজের তার লইয়া টানিলে তাহার ভবিষ্যৎ সঙ্গীতজ্ঞের জীবন তাঁহাদের চোখে জলজল করিয়া উঠে। কোন যন্ত্রের কলকব্জা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে ইহা যে নির্ঘাৎ যান্ত্রিক প্রতিভার নিদর্শন সে বিষয়ে তাঁহাদের মনে কোন সংশয় থাকে না।

পুত্রকন্যাদের সম্বন্ধে পিতামাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেরূপই ধারণ করুক তাহা যদি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে তাহা হইলে তাহা তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতে থাকে যাহা অনেক সময়ই বাস্তবে পরিণত হয় না। শিশুরা বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্বাভাবিক নিয়মেই নানা বিষয়ে আগ্রহ দেখায় আবার পরে সেইসব বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ নাও থাকিতে পারে। পিতামাতার আগ্রহ অনাগ্রহের দ্বারা বা শিশুর মধ্যে ক্ষণিক আগ্রহের বিকাশ দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছু স্থির করা সমীচীন নহে। শিশুরাও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে। মাষ্টার মহাশয়ের কি ক্ষমতা সকলকেই তিনি শাসন করিতে পারেন, সকলের শ্রদ্ধা তিনি পান, তাঁহার কত পাণ্ডিত্য, শিশু স্কুলমাষ্টার হইবার জন্য একান্ত-ভাবে কামনা করে। সিনেমা অভিনেত্রীরা কি সুখে আছে, তাঁহাদের কত খাতির। যে স্কুলের মেয়ে একটু অভিনয় করিতে পারে ও দেখিতে ভাল সে সিনেমা আর্টিষ্ট হইতে চায়। পুলিসের কি জমকাল পোষাক এবং তাহাকে সবলোক কিরূপ মানিয়া চলে ও ভয় করে, তাহার হস্ত সঙ্কেতে সমস্ত মোটরগাড়ী, বাস, ট্রাম কিরূপ থামিয়া যায়—শিশু ভাবে পুলিশ হইতে পারিলে জীবন সার্থক। সমস্ত শিশুরাই এইরূপ বীরপূজা মূলক বা

রোমাঞ্চকর স্বপ্ন তাহাদের জীবনের কোন না কোন সময় দেখিয়া থাকে। শিশু যদি স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে থাকে এবং নানা প্রকার কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই সকল স্বপ্ন আসে আবার চলিয়া যায়। শিশুর সত্যকার সামর্থ্য ও সুযোগ যাহা আছে তাহা নির্ধারণ করিয়া শিশুকে তাহার সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে এইসব নানা প্রকারের আগ্রহ একটি সার্থক রূপ পাইতে পারে এবং তখন সে কোন্ পথে যাইবে তাহা নির্বাচন করা সম্ভব হয়। শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে যদি সংযত না করা হয় তাহা হইলে সে হয়ত এমন একটি বৃত্তিতে ঢুকিতে চাহিবে যাহার জন্য সে সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত এবং জীবনে সার্থকভাবে কোন কিছু করিয়া যাইতে পারিবে না। অথবা সে এক আগ্রহের বিষয় হইতে আর এক আগ্রহের বিষয়ে ক্রমাগত ধাবিত হইবে এবং বড় হইয়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রের পক্ষে অপ্রস্তুত থাকিয়া যাইবে। উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হইবে কেননা তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া সাফল্য অর্জনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

যেহেতু সামর্থ্য সম্ভবনাগুলির যথাযথ বিকাশ সাধন হইলে ব্যক্তি তাহার জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পায় ও সামাজিক জীবনে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয় সেই হেতু পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিশুর সামর্থ্যের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ সাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যসম্ভবনাগুলির বাঞ্ছিত বিকাশ।

কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কেহ যে নৈপুণ্য দেখায় তাহা কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত? এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা শক্ত তবে অসাধারণ কৃতিত্বের পশ্চাতে বংশগতির শক্তি থাকিবারই সম্ভাবনা বেশী। প্রতিভাশালী সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর বা লেখক অথবা সফল গণিতজ্ঞ, রাষ্ট্রনীতিবিৎ, শিক্ষক, চিকিৎসক বা পিতামাতা ইঁহারা সকলেই উত্তম বংশগতির অধিকারী। তবে এই বংশগতির শক্তিকে তাঁহারা নিজেদের যত্ন ও চেষ্টায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই শারীরিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক অন্তর্নিহিত শক্তি

অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে। শুভ পরিবেশের মধ্যে এগুলি যদি বিকশিত হইবার সুযোগ পায় তাহা হইলে প্রত্যেকে তাহার নির্বাচিত ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে পারে। তবে তাহার নির্বাচিত কাজটি এমন হওয়া দরকার যাহাতে তাহার আগ্রহ থাকিবে এবং তাহার অন্তর্নিহিত পটুত্বের উপযোগী হইবে। কোন বৃত্তি নির্বাচনের আগে পাত্রের যোগ্যতার সীমা নিরূপণ করা উচিত।

শিশু ভবিষ্যতে কি হইবে সে সম্বন্ধে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাহাকে উত্তম পরিবেশে লালন পালন করিতে হইবে এবং সে যথেষ্ট বড় হইলে বৈজ্ঞানিক সাহায্য যতটা পাওয়া যায় তাহার দ্বারা তাহার আগ্রহ অনাগ্রহ, সামর্থ্য অসামর্থ্য, মনোভাব ইত্যাদির বিচার করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় স্থির করা যাইতে পারে।

কাজের মধ্যে একটি গর্ববোধ দরকার। বয়স ও সামর্থ্য অনুসারে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শিশুকে উৎসাহিত করা উচিত। যে ছেলে নিজেদের গরুবাছুর হাঁস মুরগী দেখাশুনা করে, যে গৃহকাজের টুকিটাকি নিজের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে, যে ছেলে এমন বিদ্যালয়ের ছাত্র যেখানে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়—ইহাদের বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ অনেক বেশী থাকে।

কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখা যায় যে তাহাদের নিজেদের সব সময় আমোদে রাখিতে পারাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। আবার কোন ছেলে হয়ত সার্থক কাজ কিছু করিতে চায় কিন্তু ইহা করিতে হয় শিক্ষকের বা কোন বয়স্ক লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ পালন করিয়া অথবা সে যে কাজ করিতেছে তাহার উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারে না এবং এই রকম লক্ষ্যহীন অবস্থায় ঐসব নির্দেশ মানার বিড়ম্বনা তাহাকে সহিতে হয়। ইহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ যে পূর্ববর্ণিত ছেলেমেয়েদের মত থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য।

পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা সেজন্য ছেলেমেয়েদের এমন দায়িত্ব দিবেন যাহা তাহারা স্বাধীনভাবে করিতে চায়। তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কর্তব্যগুলির অর্থ তাহারা যেন সম্যকভাবে বুঝিতে পারে এবং তাহাদের

সাধন করে। সমবয়সীদের সহিত খেলিতে খেলিতেও শিশুমন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, দায়িত্ব পালন করিয়া কিভাবে সুখে শান্তিতে থাকিতে হইবে তাহা শিশু তাহার খেলার সঙ্গীদের সাহচর্য, স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ ও বড়দের বিচক্ষণ সহায়তায় শিখিতে থাকে।

বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুর বাড়ীতে পড়িবার জন্য একটি নির্জন স্থান থাকা এবং পড়িবার নিয়মিত সময় থাকা দরকার। সুনিয়ন্ত্রিত অথচ প্রফুল্লতায় ভরা পরিবেশই সুসংগত ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

শৈশবে ব্যক্তিত্ব সমস্যা।

বার বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের মধ্যে সত্যকার মানসিক অসুস্থতা সাধারণত দেখা যায় না। তবে তাহাদের মধ্যে আচরণ সমস্যা থাকিতে পারে। সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাদের সারাইয়া ফেলা উচিত কেননা এগুলিকে থাকিতে দিলে পরে ইহারা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আচরণ সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐসব অধ্যায়ে আলোচিত হয় নাই এইরূপ কয়েক প্রকার আচরণ সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করা হইবে।

শিশুরা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চায়। স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইলে এই প্রবৃত্তি নিন্দনীয় নয় কিন্তু ইহা যদি অসামাজিক রূপ ধারণ করে তাহা হইলে ইহার সংশোধন করা উচিত। কথাতেই আছে "ক্রন্দনম্ শিশুনাম্ বলম্।" প্রথম বয়সে কান্নাই মনোযোগ পাইবার একমাত্র উপায়। একটু বয়স বাড়িলে ইহার সহিত যুক্ত হয় হাত পা ছোঁড়া, দাপাদাপি, চিৎকার, আস্ফালন ও নানারকম আক্রোশমূলক আচরণ। এইসব আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া পিতামাতা অস্থির হইয়া পড়িলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধই হয় এবং এইরূপ আচরণ বাড়িতেই থাকে। সেজন্য এরূপ আচরণ উপেক্ষা করিয়া যাওয়া উচিত যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে মনোযোগ পাইবার এইরূপ প্রয়াস তাহাদের নিষ্ফল।

শিশু যখন দেখে যে তাহার আচরণ বড়রা অনুমোদন বা সমর্থন করিতেছেন না তখন তাহার মধ্যে নিশ্চিন্ততা বোধের অভাব দেখা যায়। শিশুর কাছ

থেকে যাহা প্রত্যাশা করা যায় যদি তাহা সে করিতে না পারে তাহা হইলে সে নানা যুক্তির সাহায্যে তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ কার্যকে যুক্ত্যাভাস (Rationalization) বলা হয়। যে ব্যক্তি তাহার আচরণ সমর্থন করে না তাহার উপর সে নিজের দোষ চাপাইয়া দেয় অথবা পরিবেশের অন্য কোন বস্তুকে দায়ী করে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকারে শিশু তাহার হীনতাকে পূরণ করিয়া লইতে চায়। কোন বিষয়ে সে সাফল্যলাভ না করিতে পারিলে সে অন্য কোন বিষয়ে চমৎকারীত্ব বা বাহাদুরী দেখাইতে চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ে যে ছেলে জনপ্রিয় হইতে পারে না সে নানারকম দুষ্টামী করিয়া জনপ্রিয়তা বা সম্মানলাভের চেষ্টা করে। শ্রেণীর শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া বাহাদুরী দেখায়, বাবার পকেট মারিয়া বন্ধুদের সিনেমা দেখায় বা রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ায় বা দামী উপহার দিয়া বাহবা পাইতে চায়। লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাইতে না পারিলে সে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা কিরূপ অন্ততঃ তাহার গল্প বলিয়াও বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে—সে অমুক সভায় গান গাহিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল, খেলার মাঠে তাহার কীর্তি দেখিয়া লোকে অবাক। অথবা তাহার পরিবারের লোকেদের কীর্তি-কলাপ সঙ্গীদের বলিয়া সে সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করে। এড্‌লার (Adler) ইহাকেই হীনতাবোধ (inferiority complex) বলিয়াছেন। বাস্তবদৃষ্টি লইয়া ও অধ্যবসায় সহকারে এই বোধের প্রেরণায় যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা ও সুনাম অর্জন করা যাইতে পারে আবার অপরিণাম-দর্শীতার ফলে ইহার শোচনীয় পরিণতীও হইতে পারে। এইরূপ আচরণকে **ক্ষতিপূরণ (compensation)** বলা হয়।

শিশুর কাজে বাধা দিলে, স্বভাবত সে ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু হয়ত তাহার মঙ্গলের জন্যই এইরূপ হস্তক্ষেপের দরকার হয়। শিশুর মেজাজ যদি এরূপ হয় যাহাতে সে এইরূপ অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে সে **নঞর্থক মূলক মনোভাব (negativistie attitue)** ধারণ করে জেদী বা একরোখা হয় বা অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ হয় এবং বড়দের কোন কথা শোনে না বা মানে না। শিশুকে যদি এমন সব কাজে নিযুক্ত হইবার যথেষ্ট

সুযোগ দেওয়া হয় সেগুলিতে সে সাফল্য অর্জন করিতে পারে তাহা হইলে এইসব আচরণ বৈষম্যের প্রতিকার ও প্রতিরোধ হইতে পারে।

দিবাস্বপ্ন।

স্বপ্ন বিলাসী শিশুকে লইয়া পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাকে অনেক সময় বিব্রত হইতে হয়। এইরূপ শিশু তাহার চারদিকে যেন তাহার নিজস্ব একটি কাল্পনিক জগৎ তৈয়ারী করিয়া রাখে। বাহিরের জগৎ তাহার কাছে দুঃসহ বলিয়া মনে হয় সেইজন্য সে তাহার নিজের জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আসন গ্রহণ করে। সে তাহার এই নিজের জগতে অনেক মহৎ কাজ ও কীর্ত্তি করে এবং এই ভাবিয়া সুখ পায় যে তাহার মত কীর্তিমান ও যশস্বী সন্তান যখন মারা যাইবে তখন তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার শোকে মুহ্যমান হইবে ও তাহার গুণের সমাদর করিয়া আক্ষেপ করিয়া মরিবে। মনের দ্বন্দ্ব মিটাইবার অল্প কিছু এইরূপ সুখকল্পনা করিলে ক্ষতি হয় না যদি বাস্তব জগতে প্রয়োজন হইলেই শিশু আবার নিজেকে মানাইয়া চলিতে পারে।

কাল্পনিক অসুখ।

জীবন যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়িবার আর এক ছল হইতেছে কাল্পনিক অসুখ। স্কুলে যাইবার সময় উতরাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত সকালের অসুখ গুরুতর হইয়া থাকে এবং তারপরই আশ্চর্যজনক ভাবে অসুখ সারিয়া যায়। অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য অথবা কোন কাজ হইতে রেহাই পাইবার জন্য মাথাধরা ও অন্যান্য জ্বালা যন্ত্রণা বেশ কার্যকরী। অবশ্য যে অর্থে আমরা কপটতা শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি এই অসুখগুলি সেই পর্যায়ের নহে। রোগের ভাল যদি কেহ করে ও জ্ঞাতসারেই সে তাহা করেন এবং রোগের কষ্ট আসলে সে ভোগে না। কিন্তু এই ধরণ অসুখ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রেরণা থাকে নির্জ্ঞানে এবং রোগীকে রোগ যন্ত্রণা সত্য সত্যই ভুগিতে হয়। সুবিধা এই যে এই রোগের দোহাই দিয়া সে অন্য বিষয় এড়াইয়া যায় বা নিজের কোন মনস্কামনা যেমন

অপরের সহানুভূতি লাভ করা—পূর্ণ করে। এইরূপ রোগের সাধারণত কোন দৈহিক ভিত্তি থাকে না—সবই মনঃ কল্পিত অথচ আপাত সত্য।

উৎকণ্ঠা।

প্রায়ই শোনা যায় কেহ বলিতেছে, "আমি বড় নার্ভাস।" আজকালকার দিনে অনেকেই এই নার্ভাস্‌নেস্‌-এ ভোগে। ইহার কারণ কি কেহই বলিতে পারে না। পরিবেশের মধ্যে যদি নিয়ম ও স্থিরতা না থাকে তাহা হইলে শিশু নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ফলে সে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে তাহার জীবন শান্তভাবে চলে না এবং আসন্ন সঙ্কটের জন্য ভীত হওয়া ছাড়া তাহার আর কিছু করণীয় থাকে না। ভয়ের আসল কারণ কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করা এবং কারণ অপসারণ করাই এই সব ক্ষেত্রের চিকিৎসা।

প্রত্যেক শিশুর জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে কোন না কোন রকমের ব্যক্তিত্ব সমস্যা দেখা যায়। তবে গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যদি শান্ত, সুশৃঙ্খল এবং প্রক্ষোভিক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকে এবং বড়রা শিশুদের সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করেন অথচ নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করানয় দৃঢ় থাকেন এবং অভিলষিত পথে তাহাদের আত্মপ্রকাশ করিবার যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতা দান করেন তাহা হইলে এইসব সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতে বা স্থায়ী হইতে পারে না। অল্প সময়ের জন্য থাকিয়া তাহারা আপনিই চলিয়া যায়।

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ।

বর্তমানে ব্যক্তিত্বকে জানিবার জন্য যে অভীক্ষা বা পদ্ধতিগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি পড়িয়া বুঝিবার সামর্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্য শিশুদের পক্ষে অনেক অভীক্ষা তেমন উপযোগী নয়। তবে শিশুদের উপযোগী করিয়া কয়েকটি সহজ অভীক্ষা নির্মিত হইয়াছে। এই অভীক্ষাগুলির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। শিশুর গৃহ, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করা দরকার। এইসব অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহারা সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর কি কি বিষয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিতে পারে।

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে যেহেতু ব্যক্তিত্বের গঠন খুবই জটিল; এবং জৈবিক ও সামাজিক নানাবিধ প্রভাব ইহার বিকাশের উপর কার্য করে সেইহেতু কোন সোজাসুজি পদ্ধতি নাই যাহার দ্বারা অনায়াসে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব। যাহা হউক, নিম্নোক্ত প্রণালীগুলির দ্বারা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

(১) জীবনেতিহাস সংগ্রহ।

এই পদ্ধতির সাহায্যে যাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দরকার তাহার পূর্বপুরুষ, গৃহ পরিবেশ, পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, অসুখ-বিসুখ, যৌন অভিজ্ঞতা, লেখাপড়া শেখার ইতিহাস, বৃত্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় যেগুলি তাহার ব্যক্তিত্বকে জানার পক্ষে সহায়ক হইবে তাহাদের পূর্ণ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়।

(২) নির্ধারণ (Rating)।

কোন্ কোন্ প্রলক্ষণ (trait) কাহার কি পরিমাণে আছে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কোন বন্ধুর সামাজিকতাকে নির্ধারণ করিতে গেলে আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারি, যথা :—

অন্যরা তাহার সঙ্গ কামনা করে
অন্যরা তাহাকে পছন্দ করে
তাহার দিকে অন্যরা নজর দেয় না
তাহার উপস্থিতি অন্যরা সহন করে মাত্র
অন্যরা তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলে
তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই

উপরের তালিকায় সামাজিকতা গুণটি যে পরিমাণে বন্ধুটির ভিতর আছে বলিয়া নির্ধারণকারীর মনে হইবে তিনি যে বাক্যটি উহা প্রকাশ করিতেছে তাহার ডানপাশের রেখার উপর 'টিক্' (tick) চিহ্ন দিবেন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

কতকগুলি ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা নির্মিত হইয়াছে যেগুলিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

নিম্নের উক্তি সত্যি হইলে "স" এর চারিদিকে একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে এবং যদি মিথ্যা হয় "ম" এর চারিদিকে একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে।

স ম দুইজন ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা থাকিলে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে দুইজনের মিল করাইয়া দিবার চেষ্টা করাই উপযুক্ত কার্য হইবে।

স ম বেশীর ভাগ লোকই তাহাদের দোষের যথার্থ সমালোচনাকে স্বীকার করে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর দিবার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া অনেক প্রকারের নামজাদা ব্যক্তিত্ব-অভীক্ষা নির্মিত হইয়াছে।

আচরণ অভীক্ষা।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উত্তরকারী কি করে, কি করিবে মনে করে অথবা করা উচিত বলিয়া মনে করে তাহারই বিবরণ আমরা পাই। কিন্তু আচরণ অভীক্ষাগুলি এরূপভাবে নির্মিত হয় যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তি সত্যই কিরূপ আচরণ করে তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ থাকে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview)।

কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হাবভাব লক্ষ্য করিয়া, কথা কহিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা করা হয়।

উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিত্বের উপর নির্জ্জান মনের প্রভাব কিরূপ তাহা জানা যায়। এইরূপ পদ্ধতিগুলির মধ্যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও মানসিক প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষা (projective tests) প্রধান। এই পদ্ধতিগুলি বিশেষ জটিল বলিয়া এস্থানে আলোচিত হইল না।

ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যেসব অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সমগ্র ব্যক্তি তাহাকে যেভাবে প্রকাশ করে তাহাই ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষগুণের কি তাৎপর্য তাহা নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের অন্য গুণগুলির সহিত তাহার সম্পর্কের প্রকৃতির উপর। ব্যক্তিত্বের কোন বৈশিষ্ট্য হয়ত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত ব্যক্তির সৃষ্টি করিতে পারে, আবার ঐ বৈশিষ্ট্যটি হয়ত অন্য প্রভাবের অধীনে অন্য ধরণের ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণের সহিত যুক্ত হইয়া সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়। সেজন্য কোন একটি বিষয়ের যেমন আর্থিক অবস্থা, পরিবারে স্থান, মানসিক সজাগতা ইত্যাদি—বিশেষ বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির অনিবার্য শক্তি সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে মন্দ অবস্থার মধ্যেও কেহ কেহ বেশ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিশালী পরিবেশের প্রভাবের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে।

মাতা যদি তাঁহার সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এমন কি অতিরিক্ত স্নেহের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করেন অথবা সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যত্ন ও আদরের সুব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই সন্তান সাধারণত জীবনে সুখী হইতে ও সুস্থ অভিযোজনে (adjustment) অভ্যস্থ হন। অন্যদিকে যে মাতা কতৃত্বপরায়ণ ও সন্তানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয় তাঁহার সন্তান সেরূপ সুখী হইতে ও সুসমঞ্জস্য জীবন লাভ করিতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ নানাকারণে বেশ দুরূহ কেননা ব্যক্তিত্ব একটি স্থির পদার্থ নহে—নিয়ত ইহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতেছে আবার এই সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রবণতা গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই সকল পরিবর্তনও পরিণাম ঘটিতেছে যেমন শিশুর সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফলে, তেমনি সে তাহার ব্যক্তিসত্বার যে সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া এই সাংস্কৃতির সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহারও ফলে। নিজস্ব ও বহিঃস্থ দুই প্রকার প্রভাবের ফলে গড়িয়া উঠে ব্যক্তিত্ব এবং কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে এই দুই সম্মিলিত শক্তির নূতন প্রবণতার উপর।

সপ্তম অধ্যায়

নির্দেশনা (Guidance)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (educational and vocational guidance) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক শিশুর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ইহার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন নির্দেশনার প্রাণস্বরূপ। দুই ব্যক্তিকে লইয়া নির্দেশনার কাজ চলে। এক ব্যক্তির থাকে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা তাহাকে সাধন করিতে হইবে এবং অপর ব্যক্তির থাকে সেই লক্ষ্য সাধনে সাহায্য করিবার মত বিশেষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কৌশল।

স্কুল বা কলেজের বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ের মধ্যে কোন্‌গুলি নির্বাচন করিতে হইবে বা কোন্ বিশেষ বৃত্তিতে প্রবেশ করিলে কেহ তাহার শক্তি সামর্থ্যকে লাভজনক ভাবে কাজে লাগাইতে পারিবে—এইসব বিষয়ে নির্দেশনা বা পরামর্শ দিতে গেলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নির্ভুল জ্ঞান, ধৈর্য এবং সুবিবেচনার প্রয়োজন।

নির্দেশনার কাজে সাফল্যলাভ করিতে হইলে ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। শিশুরা তাহাদের লক্ষ্য কি তাহা স্পষ্টভাবে নিজেরাই জানে না সেজন্য সেবিষয়ে তাহারা কিছু বলিতেও পারে না সেজন্য নির্দেশককেই কোন্ কোন্ লক্ষ্য তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে উপযোগী হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে হয়। ইহার জন্য নির্দেশককে শিশুর সামর্থ্য, আগ্রহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অতীত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতার সীমা ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হয় এবং তাহার পরে কোন্ শিক্ষার ক্ষেত্রে বা বৃত্তির ক্ষেত্রে সে তাহার গুণগুলি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতে পারে তাহা নির্ণয় করেন। শিশুকে এবং তাহার শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক সম্ভাবনাকে তিনি যেরূপভাবে

বুঝিয়াছেন এখন তিনি শিশুকে তাহার নিজের সম্বন্ধে এবং শিক্ষা বা বৃত্তির ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে প্রণিধান করিবার জন্য সাহায্য করিবেন এবং তাহার সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ বিশেষ প্রস্তুতির দরকার সেইভাবে তাহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য প্রণোদিত করিবেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যে নির্দেশক শিশুকে ও তাহার সম্ভাবনাকে জানিয়া তাহাকে বিশেষভাবে তৈয়ার হইতে সোজাসুজি নির্দেশ দেন না। শিশুর যাহাতে আত্মোপলব্ধি হয় এবং সে তাহার নিজের চেষ্টায় যাহাতে তাহার সম্ভাবনাগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে তাহাতে সাহায্য করাই নির্দেশকের কাজ। এবং ইহার পরে শিশু যাহাতে স্বইচ্ছায় তাহার সম্ভাবনাগুলি স্ফুরণের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি অবলম্বন করে তাহাই নির্দেশকের লক্ষ্য। নির্দেশনার প্রচলিত অর্থ হইতে এখানে নির্দেশনা যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

কোন বৃত্তিতে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করিতে হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্যের সমাবেশ দরকার সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত খুব কমই জানা গিয়াছে। সেজন্য বৃত্তি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া সহজ কাজ নয়। তাহা ছাড়া নির্দেশক যাহাকে নির্দেশনা দেন তাহাকে দেখিবার সুযোগ খুব কমই থাকে। যে তরুণ ছাত্র বা ছাত্রী নির্দেশনা পাইবার পর নির্দিষ্ট পথে তাহার বৃত্তি জীবন আরম্ভ করিল সে আর তাহার নির্দেশক-সঙ্গ পায় না, সুতরাং তাঁহার উপদেশ বা উৎসাহ আর পায় না। সেইজন্য নির্দেশনা এমন হইতে হইবে যাহা স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হইতে হইবে যাহাতে ইহা শুধু নির্দেশনাই হইবে না পরন্তু ইহা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের উৎস হইয়া বৃত্তি জীবনের পথে তরুণ বা তরুণীকে বরাবর লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিবে। এইরূপ না হইলে তরুণ বা তরুণীর মনে সে ঠিকপথে চলিতেছে কিনা সে বিষয়ে দ্বিধা জাগে।

আধুনিক শিক্ষায় নির্দেশনার স্থান।

কোন ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিতে গেলে শুধু তাহার শিক্ষা বা বৃত্তির দিক ভাবিয়া নির্দেশনা দিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইয়া উঠে না। ব্যক্তির পূর্ব

অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, কৃতি (achievements), আগ্রহ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা যেমন তাহার বৃত্তি নির্বাচনে নির্দেশনার জন্য প্রয়োজন তেমনি তাহার শিক্ষাগত, সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যও প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের একটি নিজস্ব ঐক্য আছে, সেইজন্য নির্দেশনা এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে সমগ্র ব্যক্তিত্বের পক্ষেই তাহা উপযুক্ত হয়। যেমন কাহারও শিক্ষার কার্যক্রম এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে শুধু তাহার বৌদ্ধিক নয়, তাহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটে, তাহার বৃত্তি ও বৃত্তি বহির্গত সামর্থ্যের বিকাশ ঘটে তাহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন সার্থক হয়। সেইজন্য গোটা মানুষটিকে এবং তাহার বর্তমান পরিবেশ ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবেশ না জানিয়া নির্দেশনা দিলে তাহা অসম্পূর্ণ হয় এবং আশানুরূপ সহায়তা দান করিতে পারে না।

বিভিন্ন শিক্ষাদার্শনিকগণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের মতের ভিন্নতা যতই থাক সকলেই কোন না কোন সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তি জীবনের অভিযোজনকে মানিয়া লইয়াছেন। এইরূপ অভিযোজনের ফলে ব্যক্তি পাইবে সত্যকার সন্তোষ এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ হইতে যতটা বেশী সম্ভব ততটা অবদান ও সেবা পাইবে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে শুধু সুনাগরিকের শিক্ষা দিলেই চলিবে না। এই শিক্ষা যাহাতে ব্যক্তির মনেপ্রাণে ওতপ্রোত হইয়া গিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও আচরণে স্থায়িত্ব লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে এইরূপ স্থায়ী ও কার্যকরী ফললাভ ছাত্র বা ছাত্রীর নিজস্ব চেষ্টা দ্বারাই সম্ভব। এইরূপ চেষ্টার প্রেরণা এবং চেষ্টায় সাহায্যদান অবশ্য শিক্ষক করিতে পারেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইরূপ চেষ্টার স্থায়িত্ব নির্ভর করে ছাত্র বা ছাত্রীর সজ্ঞান সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার উপর।

নিজের সুখ ও সমাজ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনকে গড়িয়া তোলা ক্রমেই শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর রূপে স্বীকৃত হইতেছে এবং এজন্য পূর্বে যেমন শিক্ষক শ্রেণীতে উত্তমরূপে পাঠদান করিবে ইহাই

আশা করা হইত এখন সেক্ষেত্রে শিক্ষককে শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে দেখা হইতেছে। যে শিক্ষক যে মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছে এবং বিদ্যালয় চালান হইতেছে তাহার সম্যক ধারণা আছে তিনিই তাঁহার প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে তাহার নিজের জীবনকে সমাজের মঙ্গলকর্মের মধ্য দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতেই সচেষ্ট হন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নির্দেশনার দ্বারা তাহার মধ্যে আনয়ন করেন অভিলষিত পরিবর্তন।

শিখণের মূল্যায়ণ।

পূর্বে শিক্ষাদানের অর্থ এই ছিল যে শিক্ষক শ্রেণীতে বক্তৃতা দিয়া বা ব্যাখ্যাসহ কোন কিছু প্রদর্শন করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের দিতেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান, নৈপুণ্য ও মনোভাবের কি পরিবর্তন এইরূপ শিক্ষাদানের দ্বারা ঘটিত বিশেষভাবে প্রস্তুত অভীক্ষার দ্বারা যথন মূল্যায়ণ করা হইল তখন দেখা গেল যে শিক্ষকের এত পরিশ্রম আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করিতেছে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন মনোবিদ এবং শিক্ষাবিদ্‌রা আবিষ্কার করিলেন যে ছাত্রছাত্রীরা যখন নিজেদের চেষ্টায় যখন কিছু করে—তাহা মানসিক বা শারীরিক যাহাই হউক, সেইগুলিই প্রকৃতপক্ষে শেখে। শিক্ষক যাহা বলেন বা করেন তাহার প্রভাব তাহাদের উপর তেমন কিছু পড়ে না যদি না তিনি তাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য কাজে লাগাইতে না পারেন এবং তাহাদের চেষ্টাকে কার্যকরী নির্দেশ না দিতে পারেন। সেজন্য নিজেদের চেষ্টায় ছাত্রছাত্রীদের শিখণের কাজে অংশ গ্রহণ করান শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ এবং একাজে নির্দেশনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শিখনের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

কেহ কোন জিনিষ শিখিতেছে বলিলে আমরা কি বুঝি? কোন বিশেষ অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট প্রণালীতে আচরণ করাকেই শিখন বলা হয়। এইরূপ আকাঙ্ক্ষিত প্রণালীতে আচরণ করিবার প্রবণতাকে জোরদার করাই শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষার্থী যখন নির্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করে, চিন্তা করে, কথা বলে বা অনুভব করিতে চেষ্টা করে এবং পরে

অনুরূপ অবস্থায় তাহার পূর্বের প্রবণতা জোরাল হইতে থাকে তখন বলা হয় সে শিখিতেছে।

উপরের বক্তব্যটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাক। ধরা যাক যে শিক্ষক চাহেন যে অক্ষরেখা বলিলে তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা ভূগোলের কোন বিশেষ বিষয়কে বুঝিতে পারিবে, এখানে অক্ষরেখা এই লিখত বা উচ্চারিত শব্দটি একটি শিখন পরিস্থিতি বা অবস্থা। এই অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ অক্ষরেখা শব্দটি পড়িলে বা শুনিলে তাহারা কি নির্দিষ্ট প্রণালীতে অর্থাৎ ভূগোলে ঐ কাল্পনিক রেখার ব্যবহার সম্বন্ধে যে ধারণা দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তাহারা চিন্তা করিতে পারিবে?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের ঐ বিষয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও তাহাদের ঐ বিষয় ধারণা করিবার সামর্থ্যের উপর। এখানে শিক্ষককে বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর পরিপক্বতা ও প্রস্তুতি কতদূর হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া তাহার সামনে এমন শিখন পরিস্থিতি উপস্থাপন করিতে হইবে যাহা সে চিনিতে ও বুঝিতে পারে।

শিখন তখনই সার্থক হয় যখন শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যথাযোগ্য সাড়া (response) দিতে পারে এবং বাঞ্ছিত ফললাভ করায় বা কোন সমস্যা সমাধান করায় বা কৌতূহল নিবৃত্তি করায় বা অস্বস্তি বা অতৃপ্তি দূর করায় সন্তোষ লাভ করে। সার্থক শিখনের একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে এই কার্য সিদ্ধির বোধ ও তৃপ্তি। সেইজন্য কোন শিখন পরিস্থিতিতে শুধু যথাযোগ্য সাড়া দিতে পারিলেই পরে ঐরূপ সাড়া দিবার প্রবণতা দৃঢ় হয় না। এই প্রবণতার দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব নির্ভর করে শিক্ষার্থী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া বা তাহার অতৃপ্তি দূর করিয়া কতটা সন্তোষ লাভ করিতে পারিয়াছে। সেইজন্য যদি শিখনের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য, কৌতূহল বা অতৃপ্তি না থাকে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে সন্তোষ লাভেরও কোন সুযোগ থাকে না কাজে কাজেই কোন শিখনও হয় না।

সুতরাং দক্ষ শিক্ষক এক্ষেত্রে তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের অন্তরঙ্গভাবে জানেন। একদিকে তিনি যেমন তাহাদের উদ্দেশ্য ও অতৃপ্তি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন অন্যদিকে তিনি তাহাদের সামর্থ্য ও মনোভাবও জানেন। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ, উদ্দেশ্য, মনোভাব, জ্ঞান, নৈপুণ্য ও সামর্থ্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে জানা না থাকিলে শ্রেণীর কাজ কর্ম শিক্ষক এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারেন না যাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ণমাত্রায় সন্তোষ লাভ করিতে পারে এবং ফলে শিক্ষা হয় সার্থক। শিক্ষকের এই জ্ঞান ও উপলব্ধি তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা কি শিখিবে এবং কখন শিখিবে তাহা বুঝিতে তাঁহাকে সাহায্য করে এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি তাহাদের নির্ভুল শিখনের পথে সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহ দিয়া লইয়া চলেন এবং তাহাদের কৃতকার্যের জন্য সন্তোষ অনুভব করিতে দেন যাহাতে শিক্ষা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। সুতরাং শিখনের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে শিখনকে সার্থক করিতে গেলে নির্দেশনার কত গভীর ও ব্যাপক প্রয়োজন।

নির্দেশনার বিভিন্ন ক্ষেত্র।

সভ্যতার সমৃদ্ধি ও জটিলতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। মানুষের তৈয়ারী নানারূপ প্রথা, আচার অনুষ্ঠান, নিয়মকানুন ও কুশলতা এত ব্যাপক ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে সেগুলি বুঝিতে এবং তাহাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে গেলে শিশুদের বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া উচিত। সুবিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবন ধারণের শিক্ষা দেওয়া আধুনিক বিদ্যায়তনগুলির লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের বাহিরে যে শিক্ষা ও নির্দেশনা শিশুদের পাইবার কথা তাহা যদি তাহারা না পায় তাহা হইলে তাহার দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন গৃহের দায়িত্ব শিশুর কককগুলি অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া। খাওয়া, শোওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ থাকা এবং অন্যদের সহিত সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া মানাইয়া চলা—এগুলি শেখান গৃহের কর্তব্য। কিন্তু পিতামাতা যদি এবিষয়ে

অবহেলা করে বা শিক্ষা দিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বিদ্যালয়কেই এবিষয়ের নির্দেশনার ভার লইতে হইবে কারণ সমাজের লোক তাহাই আশা করিবে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরিকল্পনার কথা হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে স্নানের ব্যবস্থা এবং যাহাদের বস্ত্রের অভাব আছে তাহাদের বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

শিশুর নৈতিক ও ধর্মীয় ভাবের বিকাশ গৃহ ও ধর্মস্থানে হইবে এইরূপ আশা করা হয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাহা সন্তোষজনক ভাবে হইতেছে না তাহা হইলে বিদ্যালয়কেই ইহার ভার লইতে হয়। শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস ও মনোভাব গঠন এবং পূর্বে অর্জিত অসৎ গুণগুলি দূরীকরণের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপরই আসিয়া পড়ে। সামাজিক নির্দেশনার সাহায্যে বিদ্যালয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মনোভাব গঠন করিয়া তোলে।

সমগ্র সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও আনন্দের জন্য সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত কলার চর্চা বর্তমানে বিশেষ কাম্য বলিয়া গণ্য করা হয় সুতরাং বিদ্যালয়ে এইসব মেধার বিকাশের জন্য ব্যবস্থা ও নির্দেশনা প্রচলিত হইয়াছে।

ভবিষ্যতে শিশু কি পেশায় বা বৃত্তিতে নিযুক্ত হইবে তাহা সাধারণত পিতামাতা বা অভিভাবকরা নির্ধারণ করিয়া দেন এবং শিশুও পেশা নির্বাচনে আপন ইচ্ছার পূরণ করিতে পারে। মোট কথা ইহা সম্পূর্ণ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু দেখা যায় যে এইরূপ নির্বাচনের ফল অনেক সময় শুভ হয় না। যে যে কাজের যোগ্য নয় সে সে কাজে নিযুক্ত হইলে শুধু যে তাহার নিজেরই দুর্ভাগ্য তাহা নহে সমাজও প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অযোগ্য লোকেদের ভার বহন করিতে হয়। এইরূপ পরিস্থিতি নিবারণের জন্য আজকাল প্রথম হইতেই ভাল ট্রেনিংএর এবং নির্দেশনার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

সাধারণতঃ শরীর, বুদ্ধি ও প্রক্ষোভ একই সঙ্গে সমভাবে বিকশিত ও পরিপক্ক হইতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় প্রাক্ষোভিক বিকাশ শারীরিক

ও বৌদ্ধিক বিকাশের তুলনায় দ্রুত হইতে থাকে বা বিপরীতভাবে দেহ ও মনের বিকাশের তুলনায় প্রাক্ষোভিক বুদ্ধি কাঁচা অবস্থায় থাকে। ইহার ফলে ব্যক্তির নিজের জীবনে এবং সমাজ জীবনে অপ্রীতিকর অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট আসিয়া পড়ে। সুতরাং হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রেও নির্দেশনা অতীব প্রয়োজনীয় যদিও দুরূহ।

বিদ্যালয়ের কাজে নির্দেশনা বলিতে সাধারণত মনে হয় বিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে পড়ান হয় তাহাদের মধ্য হইতে কোন্‌গুলি শিক্ষার্থী বাছিয়া লইবে তাহাতেই শুধু সাহায্য করা। কিন্তু এখন দেখা গিয়াছে যে কার্যকরী শিক্ষা তখনই ঘটে যখন লেখাপড়া শিখিতে গিয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধাগুলি নির্ধারণ করা হয়, শেখার কাজে তাহার মনে উদ্দীপনা জাগান হয় ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা হয়। কোন তরুণ বা তরুণীর পক্ষে কি শেখা উচিত এবং কিরূপ শিক্ষায়তনে শেখা উচিত সে সম্বন্ধে সার্থক পরামর্শ দিতে গেলে তাহার বৌদ্ধিক সামর্থ্যগুলি শিক্ষার মান, সমাজ পরিবেশ, প্রাক্ষোভিক পরিপক্বতা, আমোদ প্রমোদের অভ্যাস, অবসর বিনোদনের প্রণালী এবং বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং শিখণকে সার্থক করিবার জন্য ইহা করিতে গেলে নির্দেশনার প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ কাজে ছাত্র-ছাত্রীরা সফলভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহা দেখা শিক্ষকের দায়িত্ব। রাষ্ট্র নানাবিধ শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্য এই যে রাষ্ট্র নিজে আরও উন্নত হইতে চায় এবং ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি ইহা যে সকল সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তুলিতেছে তাহাতে ইহার নাগরিকগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং এইগুলির সমৃদ্ধির জন্য নিয়ত প্রয়াসশীল থাকে এইভাবে নাগরিকদের সুদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চায় যাহাতে প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী কোন বিষয় হাতে নাতে কাজ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে শিখিতে পারে এবং কিছু করিতে পারার কৃতকার্যতায়

সন্তোষ লাভ করিতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও নির্দেশনা দিতে পারেন কিন্তু শিক্ষার্থীকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে বিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র সকলের কল্যাণের জন্য উন্নততর পরিকল্পনা ও সংগঠনের প্রয়োজন আছে এবং এই সকল গড়িয়া তোলার চেষ্টারও মধ্যে তাহাকে সত্যকার তৃপ্তি পাইতে হইবে। গণতান্ত্রিক আদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা অপেক্ষা মহত্তর নির্দেশনা আর নাই এবং বাস্তবিক পক্ষে ভারতে শিক্ষাপ্রদ নির্দেশনার মর্মকথা ইহাই হওয়া উচিত।

শিক্ষায় নির্দেশনা সোজা জিনিস নয়। ইহার জন্য শিক্ষককে বিশেষভাবে তৈয়ারী হইতে হয়। এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ এবং তাহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি জানিতে হইবে। সে কিরূপ জগতে বাস করে, কিরূপ গৃহ হইতে সে আসিয়াছে, সে যেরূপ বৃত্তি বা পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারে সেইরূপ বৃত্তি বা পেশায় কি কি বিষয় বা জিনিসের প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার এ সমস্তই তাহার সম্যকভাবে জানা দরকার। শুধু ছাপান পাঠ্যক্রম দেখিয়া শিক্ষার্থীকে পরামর্শ দিলে চলিবে না, তাহার জীবনের চাহিদা, আগ্রহ ও যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলে তবেই তাহা সুফলপ্রদ হইতে পারে।

পরামর্শ দানের কৌশল।

আমরা এখানে পরামর্শ দান সাধারণ অর্থে ব্যবহার না করিয়া কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ দেন। এখানে পরামর্শ দেওয়াটা নির্দেশ দানের সামিল। শিক্ষার্থীকে যাহা করিতে বলা হয় সে তাহা করিতে চেষ্টা করে—ইহার মধ্যে তাহার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকে না। আমাদের পরামর্শদাতা (counselor) কিন্তু ঐভাবে নির্দেশ না দিয়া শিক্ষার্থী নিজের যে সমস্যা আছে তাহা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে সাহায্য করেন এবং তাহার নিজের বিষয়ে সুবিবেচনার সহিত নিজেকেই চিন্তা করিতে প্রণোদিত করেন। অপরের নির্দেশে যান্ত্রিকভাবে

কাজ করা বা চলা অপেক্ষা নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ব্যবহার করা, আত্মোপলব্ধি ও সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে শিক্ষার্থীকে সমর্থ করিয়া দেওয়াই এইরূপ পরামর্শ দানের লক্ষ্য।

কি করিতে হইবে বা করিলে ভাল হয় সে বিষয়ে যখন গোলমালে পড়িতে হয় বা কিছু স্থির করিতে পারা যায় না তখন লোকের চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে চিন্তা করা আরও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় কোন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার সহিত এই বিষয়ে বা সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ সুফলদায়ী হয়। অবশ্য পরামর্শদাতার এইরূপ সমস্যার সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপারটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং এ বিষয়ে নিজেকে আবেগ মুক্ত রাখিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তাঁহার সাহায্যে সমস্যাটিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে পারে এবং যুক্তিযুক্তভাবে ইহার সমাধানের কথা ভাবিতে পারে। অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা শিক্ষার্থী তাহার সমস্যাটিকে যেভাবে বর্ণনা করিতে চায় তাহা মন দিয়া শোনেন, তাহার যাহাতে সাহায্য হয় এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তাহাকে জানাইয়া দেন এবং সে যাহাতে সমস্ত বিষয়টা বাস্তব দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন। সমস্যাটিকে যদি এইরূপ উদ্বেগ আবেগ বর্জিত ভাবে বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে সে একটি যুক্তিসঙ্গত ও আপাতত গ্রহণযোগ্য সমাধান বা সিদ্ধান্তে আসিতে পারে এবং এই কার্যের জন্য যে চেষ্টা ও উদ্যম প্রয়োজন তাহাতে সে মনেপ্রাণে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারে।

সমস্যার প্রকৃতি ও জটিলতা যেমন যেমন হইবে পরামর্শদানের কৌশলও সেইভাবে উদ্ভাবন করিতে হইবে। সমস্যাটি কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এ বিষয়ে কি কি তথ্য জানা আছে বা জানা যাইতে পারে, সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া পরামর্শদাতাকে তাঁহার কর্মপন্থা নির্বাচন করিতে হইবে। মানুষের সমস্যা প্রায়ই জটিল ধরণের হয় এবং সমাধান করাও সহজসাধ্য হয় না, সেইজন্য আনুপূর্বিক বিবরণের এতটা

প্রয়োজন। আপাত দৃষ্টিতে যাহা সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয় সমাধান করিতে গেলে দেখা যায় তাহা বেশ জটিল, বহুবিস্তৃত ও দুরূহ। সেইজন্য পরামর্শ দাতাকে সব জিনিষ খুঁটাইয়া ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত দেখিতে হইবে। এইভাবে সাহায্য করিলে অনেকের জীবনের মোড়ই ফিরাইয়া দেওয়া যায়।

পরামর্শদান এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীর নিজের যোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িয়া যায়। পরামর্শদান দিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন পরামর্শদাতার উপর পরামর্শ প্রার্থীর নির্ভরতা আসিয়া না পড়ে। স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতাই প্রকৃত পরামর্শদানের উদ্দেশ্য। এইরূপ মনোভাব সৃজন করিতে হইলে পরামর্শদানে নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষার্থী যাহাতে তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পনা যেন নিজেই উদ্ভাবন করিতে পারে এবং কাজে লাগাইতে পারে এমনভাবে তাহাকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। এই কাজে হয়ত কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে কিন্তু পরামর্শদাতাকে ধৈর্য ধরিতে হইবে। তাড়াহুড়ার দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাড়াতাড়ির খাতিরে পরামর্শ-দাতা নিজেই যদি শিক্ষার্থীর অবস্থার বা সমস্যার ব্যাখ্যা করিয়া দেন এবং তাহাকে কি করিতে হইবে বলিয়া দেন বা তাহার হইয়া করিয়া দেন তাহা হইলে পরামর্শদানের (counseling) আসল লক্ষ্যই পণ্ড হইয়া যায়। বস্তুতঃ সার্থক পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীকে পরামর্শদানের মধ্য দিয়া এমনভাবে সক্ষম করিয়া দেন যে ভবিষ্যতে আর কোনরকম সাহায্যেরই তাহার আর প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার নির্দেশনার কাজ করা বিশেষ নৈপুণ্য সাপেক্ষ। নিজের বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান, মানুষের মনোস্তত্ব সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি এবং সুনিপুণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ধৈর্যের সহিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে ক্রমে এইরূপ দক্ষতা লাভ করা যায়।

নির্দেশনায় কি কি তথ্যের প্রয়োজন হয়।

পরামর্শদাতাকে যে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হইবে সেই বিষয়টি সম্যক-ভাবে জানিতে হইবে। তাহা ছাড়া পরামর্শপ্রার্থীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে

এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে নির্দেশনা দেওয়া যাইতে পারে তাহাও জানিতে হইবে। প্রত্যেক কাজটিই বেশ দুরূহ। যেমন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে সমস্যা থাকে এবং বিদ্যালয়ে যাহা পড়ান বা শেখান হয় না এমন বিষয় সম্বন্ধেও তাহাদের সমস্যা দেখা দেয়। বস্তুত একটি পাঠ্যবিষয়ের সাহায্যে জীবনের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা যায় না। হয়ত পরামর্শদাতার কাছে কোন শিক্ষার্থী ভূগোলের কোন সমস্যা আনয়ন করিল। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যাইবে যে সমস্যাটি শুধু ভূগোলেই সীমাবদ্ধ নাই ; ইহা আরও অন্যান্য বিষয়ে পরিব্যপ্ত হইয়া আছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হয়ত মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি অনেক বিষয় আসিয়া পড়িবে। অনুরূপভাবে আপাত দৃষ্টিতে হয়ত কোন সমস্যাকে শিক্ষায় নির্দেশনার প্রসঙ্গ বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইলে দেখা যায় অন্যান্য বিষয়েও নির্দেশনার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে গিয়া আর্থিক বিষয়ে, বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে, সামাজিক জীবন-যাপন বিষয়ে পরামর্শদান, অবসর সময় কাটাইবার উপায়ের পরামর্শ, দৈহিক চিকিৎসা এবং নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে উৎসাহ দানও হয়ত প্রয়োজন হইতে পারে। কোন সমস্যার সত্যকার সমাধান করিতে গেলে বহু বিষয়ে প্রবেশ করিতে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের গণ্ডীর মধ্যে সত্যকার জীবন সমস্যা সীমাবদ্ধ থাকে না—ইহার ক্ষেত্র থাকে বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক।

নিজের বিষয় বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত থাকাই পরামর্শদাতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্য বিষয় বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থা সম্বন্ধেও তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইবে। একজন লোকের পক্ষে সর্ব বিষয়ের বা সর্বক্ষেত্রের জ্ঞান রাখা সম্ভব নয় তবে জীবনের যত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় পরামর্শদাতার পক্ষে ততই ভাল। সমস্যা সমাধানে যদি নিজের ক্ষেত্রের বাহিরে তাঁহাকে যাইতে হয় তাহা হইলে সম্ভবস্থলে পাত্রকে (counselee) সেই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে

পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। যদি এইরূপ বিশেষজ্ঞ সাহায্য অন্যত্র পাওয়া সম্ভব না হয় এবং পরামর্শদাতার খানিকটা জ্ঞান ঐ বিষয়ে থাকে তাহা হইলে অবশ্য তিনি পাত্রকে প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিতে পারেন তবে এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নহেন সে কথা পাত্রকে বলিয়া দেওয়া ভাল।

যে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হইবে সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে যদি পরামর্শ দিতে হয় তাহা হইলে পরামর্শদাতাকে তাঁহার সমাজে কি কি বৃত্তি বা পেশার সুযোগ আছে তাহা জানিতে হইবে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিভাবে সংগঠিত হইয়াছে, ঐসব শিল্পে কি কি বিশেষ বিশেষ কাজ আছে, কাজ করিবার পরিবেশ কিরূপ, বেতনের হার, উন্নতির আশা এবং কাজ পাইতে হইলে কি কি ন্যূনতম গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, কিভাবে কাজ সংগ্রহ করিতে হয়—এ সমস্তই তাঁহাকে অবশ্য জানিতে হইবে। এইসব বিষয়ে যে সব আইন কানুন আছে তাহাদের সহিত তাঁহাকে পরিচিত থাকিতে হইবে এবং এ বিষয়ে যেসব গ্রন্থ আছে সেগুলিকে বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগাইতে হইবে। Employment Exchange, University buren of employment প্রভৃতি যে সব সংস্থা আছে সেগুলির সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইতে হইবে এবং বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশায় কোথায় কোথায় শিক্ষণ পাওয়া যায় তাহাও তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকার কাজে বা বৃত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সাফল্যের সম্ভবনার তারতম্য দেখা যায়। অর্থাৎ সব লোকেই সব রকমের কাজে সমানভাবে পারদর্শী হইতে পারে না। সুতরাং পাত্র সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও খবর জানা যাইবে সেগুলি কোন্ কাজে তাহার যোগ্যতাকে নির্দেশ করে তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শদাতাকে করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে তাঁহাকে প্রথমে জানিতে হইবে বিভিন্ন কাজে যে সকল কর্মী সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাদের কি কি বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক বৃত্তি আছে যাহাদের নিজেদের মধ্যে অল্পবিস্তর মিল আছে অর্থাৎ যে যোগ্যতা একটিতে

থাকিলে সাফল্য লাভ করা যায় তাহা অন্যগুলিতেও অল্পাধিক থাকা প্রয়োজন। এবিষয়েও পরামর্শদাতাকে অবহিত হইতে হইবে। পাত্রের বিদ্যালয় কৃতি (School achievement), বিভিন্ন রকমের কাজকর্মের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অভীক্ষালব্ধ কোন সাফল্যাঙ্ক যদি থাকে তাহা হইলে সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সে কোন্ বৃত্তির যোগ্য হইতে পারে সে সম্বন্ধে পরামর্শদাতাকে সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। এইসব তথ্য কিভাবে পাওয়া যাইবে? দেখাসাক্ষাৎ করিয়া, চিঠিপত্র লিখিয়া, তাহার সম্বন্ধে লিখিত বিবরণী পাঠ করিয়া এবং অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাকে পাত্র সম্বন্ধে যাহা জানিবার আছে তাহা জানিতে হইবে। এই সমস্ত তথ্যের সমন্বয়ে পাত্র সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাইবে বৃত্তি সম্বন্ধে তাহার কি তাৎপর্য হইতে পারে তাহা তাঁহাকে সহজ ও সরলভাবে পাত্রকে বুঝাইতে হইবে যাহাতে সে উহা বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সার্থকভাবে নির্দেশন দিতে গেলে পাত্র সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে কাহারও সম্বন্ধে গভীরভাবে জানিতে গেলে তাহার পিতামাতা ও পরিবার সম্বন্ধেও জানা দরকার। পিতা ও মাতা কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা, পেশা, তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক মধুর বা তিক্ত কিনা, পরিবারে কয়টি পুত্রকন্যা আছে, কিরূপ সমাজে তাহারা বাস করেন এবং তাঁহারা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় কাটান—এই সমস্ত বিষয়ও নির্দশনার কাজে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতে পারে। পাত্রের দৈহিক বিকাশ ও রোগ চিকিৎসার ইতিহাসও জানা দরকার। এইসব বিষয় গৃহ হইতে এবং বিদ্যালয়ে যদি প্রগতিপঞ্জী (cumulative record) রাখা হয় তাহা হইলে তাহা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইগুলি দেখিয়া পাত্রের জন্মের সময় কোন আঘাত পাইয়াছিল কিনা, পূর্বজীবনে কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা, চোখের ও কানের কোন দোষ আছে কিনা, পুষ্টির অবস্থা কিরূপ, শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, রোগাক্রমণের ফলে স্থায়ী দৈহিক ক্ষতি ইত্যাদি অনেক বিষয় জানিতে পারি।

বিদ্যালয়ে যদি প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর সম্বন্ধে ভালভাবে বিবরণী লেখা হয় তাহা হইলে তাহা দেখিয়া বোঝা যায় শিক্ষার্থী কোন্ কোন্ কাজে সফলতা অর্জন করিতে পারে, শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে যে মার্ক দেন তাহা দেখিয়া মোটামুটি বোঝা যায় শিক্ষার্থী কোন্ কোন্ বিষয়ে পারদর্শী ও কোন্ কোন্ বিষয়ে পিছাইয়া আছে—পর পর পরীক্ষার মার্ক দেখিয়া বিভিন্ন বিষয়ে তাহার বুৎপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা তাহাও বোঝা যায়। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করিবার সুযোগ থাকিলে তাহার সাফল্যাঙ্ক হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা করিবার শক্তি কতটা জন্মিয়াছে, তাহা বোঝা যায়। তবে এইরূপ বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তাই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ইহার সহিত তাহার বস্তুগত বা যান্ত্রিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের এবং সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় লইয়া কাজ করিবার সামর্থ্যকেও বিবেচনা করিতে হইবে।

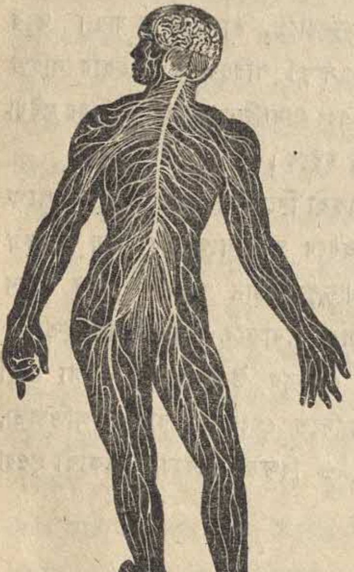
এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে কার্যকরী নির্দেশনা দিতে গেলে একপক্ষে যেমন শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে জানিতে হইবে অপরপক্ষে যে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্দেশনা দিতে হইবে তাহারও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর পূর্বজীবন, আগ্রহ, অনাগ্রহ, মনোভাব, রুচি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া সে কোন্ বিষয়ের বা ক্ষেত্রের উপযোগী বা যোগ্য তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। সার্থক নির্দেশনা দিতে গেলে যে ব্যপক অভিজ্ঞতা, গভীর সহানুভূতি, তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি, ধৈর্য ও বিস্তৃত তথ্যের অধিকারী হওয়া দরকার তাহা খুব কম লোকেরই আছে।

মানবীয় নার্ভ তন্ত্র

(Human Nervous System)

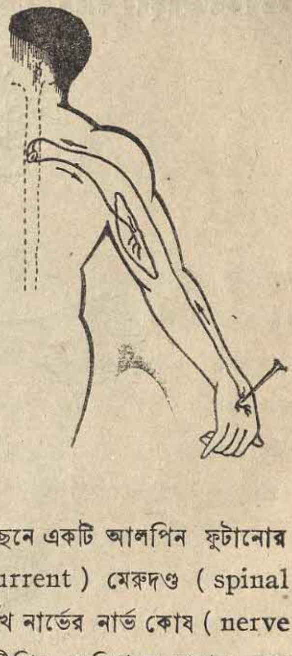
বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ নার্ভ (Affarent and Efferent Nerves)

পায়ে একটা পিঁপড়ে কামড়াইলে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি এবং পা সরাইয়া লই বা পিঁপড়েকে মারিয়া ফেলি। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের



যাহা কিছু উদ্দীপক আছে তাহাদের প্রত্যক্ষ (Perception) এবং তাহাদের প্রতি সাড়া (response) যে দৈহিক যন্ত্র দ্বারা সাধিত হয় তাহাকেই নার্ভতন্ত্র বলা হয়। পাশের ছবিতে কিভাবে নার্ভগুলি সারা দেহে ছড়াইয়া আছে তাহা দেখান হইয়াছে। নার্ভগুলির গঠন ও কার্য শারীরিক অঙ্গভেদে বিভিন্ন। চোখের দৃক্ নার্ভ (optic nerve) বাহিরের বস্তুর দর্শানুভূতি (vision) জন্মায়, কানের নার্ভ শ্রবণ, ঘ্রানজ নার্ভ (olfactory nerve) ঘ্রান, চার্মনার্ভ (cutaneous nerve) স্পর্শ, চাপ উত্তাপ, বেদনা, রাসন নার্ভ (gustatory nerve) আস্বাদন এবং আন্তর যন্ত্রীয় নার্ভ (visceral nerve) শরীরাভ্যন্তরীণ আন্তরযন্ত্রগুলির (viscera) যথা—পরিপাকযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, গ্রন্থি (gland)—অনুভূতি জন্মায়। এইরূপে যে নার্ভগুলির দ্বারা বহিঃ ও আন্তর পরিবেশের সংবেদন (sensation) মস্তিষ্কে গৃহীত হয় তাহাদের অন্তর্মুখ নার্ভ বলা হয়।

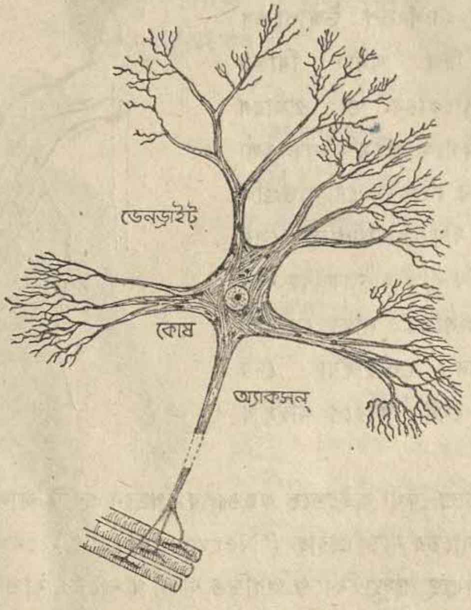
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও আন্তর যন্ত্রীয় নার্ভ বাহিত হইয়া যে সংবেদনগুলি আসে তাহাতে সাড়া (response) দেয় আর এক শ্রেণীর নার্ভ। বন্ধুকে দেখিয়া করমর্দন করিলাম ও তাহার সহিত কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভালাপ করিলাম। করমর্দন করিতে মাংসপেশীর সংকোচন করিতে হইল ও কথা কহিতে জটিল বাগেন্দ্রিয় সক্রিয় হইয়া উঠিল। যে নার্ভগুলি বন্ধু দর্শনরূপ উদ্দীপকের ফলে সাড়া দিল অর্থাৎ বিভিন্ন মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ করিল তাহাদিগকে বহির্মুখ নার্ভ বলা হয়। বাহিরের সংবেদন যে নার্ভগুলি অন্তরে লইয়া যায় তাহাদিগকে সেই কারণে অন্তর্মুখ নার্ভ বা সংজ্ঞাবহ নার্ভ বলে আর অন্তরের সাড়া যে নার্ভ গুলি বাহিরে পৌছাইয়া দেয় তাহাদিগকে সেই কারণে বহির্মুখ নার্ভ বলে।



উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে করতলের পিছনে একটি আলপিন ফুটানোর ফলে অন্তর্মুখ নার্ভের নার্ভ প্রবাহ (Nerve current) মেরুদণ্ড (spinal column) মধ্যস্থ সুষুম্না কাণ্ডে অবস্থিত বহির্মুখ নার্ভের নার্ভ কোষ (nerve cell) বা নিউরোন্ (newrone) কে উদ্দীপিত করিয়াছে যাহার ফলে বহির্মুখ নার্ভের নার্ভ প্রবাহ বাহুর মাংস পেশীর মধ্যে পৌছিয়া তাহার সংকোচন ঘটাইবে অর্থাৎ আলপিন হইতে হাত দূরে সরিয়া আসিবে। এই ঘটনা ঘটিতে অবশ্য এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময় লাগিবে কারণ নার্ভ প্রবাহ সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ গজ গতিতে প্রবাহিত হয়।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় নার্ভ প্রবাহ এক প্রকার বৈদ্যুতিক রাসায়নিক তরঙ্গ (electro- mangnetic wave)। সমগ্র নার্ভ তন্ত্র অসংখ্য

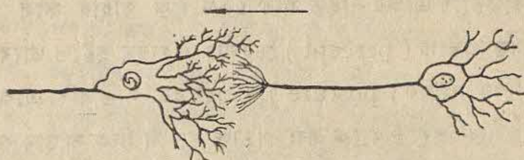
আনুবিক্ষণিক নিউরোণের সমষ্টি। প্রতিটি নিউরোণের একটি নার্ভকোষ (cell body) ও দুই প্রকার শাখা থাকে, একটি শাখাকে বলা হয় অ্যাক্সন (Axon) ও অপরগুলিকে ডেনড্রাইট (dendrite) নামে অভিহিত করা হয়। ডেনড্রাইটগুলি ছোট ছোট এবং দেখিতে অনেকটা গাছের ডাল পালার মত কিন্তু অ্যাক্সন কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফিট বড় হইতে পারে। নিম্নে



নিউরোনের একটি চিত্র দেওয়া হইল। প্রতিটি অ্যাক্সন যদিও খুব সূক্ষ্ম কিন্তু অ্যাক্সনের প্রান্ত সূক্ষ্মতর কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় এই সূক্ষ্মতর শাখাগুলির সাহায্যে অনুভূতি গ্রহণ বা মাংসপেশী উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রান্তসন্নিকর্ষ (Synapse)—পূর্বে ধারণা ছিল নার্ভতন্ত্র অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড। কিন্তু এখন প্রমাণ হইয়া গিয়াছে নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নিউরোনের সমষ্টি। ইহারা একের সহিত অপরটির সংযোগ রক্ষা করে অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের সাহায্যে। **পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে** দেখা যাইতেছে একটি নার্ভকোষের অ্যাক্সন অপর নার্ভকোষের

ডেনড্রাইটের সহিত ঘন সন্নিবিষ্টভাবে মিলিত হইয়াছে। যে স্থানে অ্যাক্সন মিলিত হইয়াছে অ্যাক্সনের সেই প্রান্ত সূক্ষ্ম কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ডেনড্রাইটগুলির সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ দুইটি নার্ভকোষের সংযোগ স্থানকে প্রান্তসন্নিকর্ষ বলা হয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে কেবল একটির সহিত আর একটির মিলন হয় না। একটি নার্ভ-



কোষের অঙ্গে বা তাহার ডেনড্রাইটের সহিত বহুসংখ্যক নার্ভকোষের অ্যাক্সন সংযুক্ত থাকে। এইভাবে প্রত্যেক নার্ভকোষ বহুসংখ্যক নার্ভকোষ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয় আবার বহুসংখ্যক নার্ভকোষকে প্রভাবান্বিত করে। রাস্তা পার হইবার সময় দূরে মোটরের হর্ন শুনিয়া হয়ত গতিরোধ করিতাম কিন্তু মোটর অনেক দূরে আছে দেখিয়া মোটরের সহিত নিরাপদ দূরত্ব রাখিয়া রাস্তা পার হইয়া গেলাম। এইরূপে অনেক সংজ্ঞাবহ নার্ভ প্রান্তসন্নিকর্ষ যোগে (synaptic junction) একটি বহির্মুখ নিউরোনের সহিত যুক্ত থাকে। কর্ণের সংজ্ঞাবহ নার্ভগুলি মোটরের হর্ন শ্রুতিগোচর করিল এবং চক্ষুর সংজ্ঞাবহ নার্ভগুলি যদি মোটর কাছে ইহা প্রত্যক্ষ করায় তাহা হইলে কর্ণের সংজ্ঞাবহ নার্ভ ও চক্ষুর সংজ্ঞাবহ নার্ভ পদদ্বয়ের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রনকারী বহির্মুখ নার্ভকে উদ্দীপ্ত করিয়া গতিরোধ করিবে কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কর্নের সংজ্ঞাবহ নার্ভ যদিও পদদ্বয়ের মাংসপেশীর নিয়ন্ত্রণকারী বহির্মুখ বা চালক নার্ভের (motor nerve) সহিত প্রান্তসন্নিকর্ষযোগে যুক্ত কিন্তু চক্ষুর সংজ্ঞাবহ নার্ভ মোটরের দূরত্ব দেখাইয়া দেওয়ায় ঐ চালক নার্ভের উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারিল না। চক্ষুর সংজ্ঞাবহ নাভ গতিকে অব্যাহত রাখিল। প্রত্যেক চালক নার্ভ এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞাবহ নার্ভদ্বারা যুক্ত থাকার ফলেই একটি যৌথ সমন্বয় চেষ্টিত

বা আচরণে লক্ষ্য করা যায় অন্যথায় আচরণে নানা গোলমাল আসিয়া পড়ে।

সাধারণত মস্তিষ্কের এবং মেরুমজ্জার ধূসর অংশে নার্ভগুলি প্রান্তসন্নিকর্ষ যোগে যুক্ত আছে। শরীরের অসংখ্য নার্ভ (গুরুমস্তিষ্কের ধূসর পদার্থে { cerebral cortex } প্রায় ১৪,০০০, ০০০, ০০০, নার্ভকোষ আছে)। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একের সহিত আর একটি যুক্ত যাহার ফলে ইন্দ্রিয়দ্বার পথে যেমন সমস্ত প্রত্যক্ষ (percept) চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকে সেইরূপ সমস্ত রকম আঙ্গিক সংস্থান (posture) ও শরীরের গতিবিধি একের সহিত অপরের সমন্বয় সাধন হইতে থাকে এবং প্রত্যক্ষ পুঞ্জ আঙ্গিক সংস্থান ও শরীরের গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এইভাবেই আমরা একস্থান হইতে অপর স্থানে গিয়া প্রথমে দূরত্ব নির্ণয় করি, গভীরতা ও উচ্চতা মাপি পরে বিচলন (movement) ছাড়াও শুধু চোখে দেখিয়া দূরত্ব, গভীরতা ও উচ্চতা বুঝিতে পারি। শারীরিক ও মানসিক সমপূরণের (integration) মূলে এই প্রান্ত সন্নিকর্ষগুলি।

প্রতিবর্ত (Reflex activities)—মাধবী অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রণব দেখিল মাধবীর ডান পায়ে একটি মশা বসিল। কিছুক্ষণ বাদে প্রণব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে ঘুমন্ত অবস্থাতেই মাধবী পা সরাইয়া লইল। প্রণব ভাবিতে লাগিল ঘুমন্ত অবস্থাতে মশার দংশন মাধবী কি করিয়া জানিতে পারিল। পরে প্রণব জানিতে পারিয়াছিল আমরা এমন কতকগুলি কাজ করি যাহার জ্ঞান আমাদের থাকে না এবং ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন হয় না। এখানে দেখা যাইতেছে কোন উদ্দীপক (এখানে মশার দংশন) গাত্র চর্মের ইন্দ্রিয় স্থানকে (Sense organ) উত্তেজিত করায় নার্ভ প্রবাহ সংজ্ঞাবাহী নার্ভের অ্যাক্সন দিয়া সুষুম্না কাণ্ডের ধূসর পদার্থের মধ্যস্থিত চালক নিউরোনকে প্রান্তসন্নিকর্ষের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করে ফলে চালক নার্ভকোষ অ্যাক্সনের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট মাংসপেশীতে নার্ভ প্রবাহ প্রেরণ করিয়া সংকোচন বা প্রসারণ ঘটায়।

সাধারণত এই সংজ্ঞাবাহী নার্ভ ও বহির্মুখী নার্ভ সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের সহিত প্রান্তসন্নিকর্ষ যোগে যুক্ত থাকে সেইজন্য জাগ্রত অবস্থায় মশক দংশণের যাতনা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে যাতনা উপেক্ষা করিয়া পা না সরাইতে পারি তবে সাধারণত দেখা যায় যে উপলব্ধি ঘটিবার বা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবার পূর্বেই কতকগুলি আঙ্গিক বিচলন (movement) ঘটিয়া থাকে। চোখের সাম্‌নে কোন পদার্থ দ্রুত নিকটবর্তী হইতে থাকিলে, যেমন, চোখের সাম্‌নে হঠাৎ হাত নড়াইলে বা তীব্র আলোক পড়িলে চোখের পাতা পড়িয়া যায়, জানুর সন্ধিস্থলের কণ্ডরাকে (tenclon) অল্প জোরে আঘাত করিলে পা সামনের দিকে লাফাইয়া উঠে। এই কার্যগুলি ছাড়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক যন্ত্রের বিচলন, গ্রন্থির রসক্ষরণ ইত্যাদি কার্যগুলি আপনি আপনি হইয়া যায় এবং সাধারণত আমাদের অজ্ঞাতেই হয়। এই সকল কার্য সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে কিরূপে নার্ভের যোগাযোগে হয় তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই কার্যগুলিকে **প্রতিবর্ত কার্য** বলা হইয়া থাকে। যে সকল কার্য এক সময় সজ্ঞান চেষ্টা করিয়া করিতে হয় তাহা কালক্রমে প্রতিবর্ত কার্যে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে যেমন চলিতে শিখিবার কালে শিশুকে প্রত্যেক আঙ্গিক সংস্থাপন ও বিচলনে গভীর মনোযোগ এবং চেষ্টা প্রয়োগের দরকার হয় কিন্তু কালক্রমে চলা যখন প্রতিবর্ত কার্যে রূপান্তরিত হইয়া যায় তখন চলা আর চেষ্টাসাধ্য থাকে না—চলা কাজ এত সহজে সম্পন্ন হয় যে চলিতে চলিতে অন্য চিন্তাভাবনা করা যায়। এই ভাবে নানা হাতের কাজ ও ললিত কলা যেমন হস্তলিখন, টাইপরাইটিং, নৃত্যগীত, চিত্রাঙ্কন সবই প্রতিবর্ত সমবায়ে পরিবর্তিত হইতে পারে ফলে আমরা আমাদের মনোযোগ ও চেষ্টা অধিকতর উন্নততর স্তরে নিয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কতকগুলি প্রতিবর্ত কার্য জন্মগত ও কতকগুলি একদা সজ্ঞাত ও চেষ্টা সাধ্য কার্যের রূপান্তর। দেহ রক্ষা ও পোষণের জন্য প্রতিবর্তগুলি, যেমন, চোখকে

অনিষ্টকর পদার্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চোখের পাতা বন্ধ করা, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ও দূষিত পদার্থ নিষ্কাসন, রসক্ষরণ ইত্যাদি—সহজাত এবং এগুলি শিখিতে হয় না স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলি কাজ করিয়া যায়।

অবুট গ্রন্থি।

কয়েক মাস হইল নন্দিতার অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতামাতা ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজনেরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। নন্দিতার আর আগের মত সদাচঞ্চল ভাবটি নাই। যে মেয়ের উৎসাহ উদ্দীপনা অফুরন্ত ছিল, যাহার জন্য তাহাকে অনেক সময় বকুনি খাইতে হইত আজকাল সে কোন কাজ না করিয়াও ঝিমাইতে থাকে। বন্ধুরা তাহাকে খেলিবার জন্য কত ডাকাডাকি করে কিন্তু তাহার যেন নড়াচড়ার প্রতি ঝোঁক কমিয়া গিয়াছে কেবল শুইয়া বসিয়া থাকিতে চায়। তাহার গায়ের চামড়া কি রকম ফুলাফুলা দেখায়। সে যে অত বুদ্ধিমতি মেয়ে ছিল, কত চটপট লেখাপড়া শিখিতে পারিত এখন তাহাকে দেখিয়া আর মনে হয় না। কোন জিনিস বুঝিতে এখন তাহার অনেক সময় লাগে, বোকার মত তাকাইয়া থাকে, তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়, কোন কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনঃসংযোগ করা, এমন কি চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মও আর সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। তাহার শরীর ও মন দুইই যেন আর বাড়িতেছে না, জীবনীশক্তিও কমিয়া আসিতেছে। নন্দিতার বাবা অতীশবাবু চিকিৎসার কিছু বাকী রাখিতেছেন না—জলের মত টাকা খরচ হইতেছে—কত ঔষধ, কত পথ্য সেবন করান হইল, স্থান পরিবর্তন করা হইল কিন্তু কিছুতেই নন্দিতার দেহমনের স্তিমিত ভাব যাইতেছে না। অবশেষে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার আবিষ্কার করিলেন যে নন্দিতার রোগের কারণ হইতেছে যে তাহার থাইরয়েড গ্রন্থি যথেষ্ট রসক্ষরণ করিতেছে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিষ্কাসিত থাইরয়েড হরমোন (Hormone) নিয়মিত সেবন ও আইওডিনযুক্ত খাদ্য খাইতে খাইতে তবে নন্দিতা আবার পূর্বের স্বাস্থ্য ও তেজ ফিরিয়া পাইল।

এই থাইরয়েড একটি অবুট গ্রন্থি অর্থাৎ এমন এক শ্রেণীর গ্রন্থি যাহার কোন নালী (duct) নাই এবং যাহা সোজাসুজি রক্ত প্রবাহের মধ্যে তাহাদের রস ঢালিয়া দেয়। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থি আছে যাহারা বটুযুক্ত (duct) এবং বটু বাহিত হইয়া তাহাদের রস আভ্যন্তরীন কোন যন্ত্রে আসিয়া পড়ে কিন্তু সোজাসুজি রক্তে গিয়া মেশে না। পাংক্রিয়াস (Pancreas) দেহের একটি গ্রন্থি ইহার দুই রকমের রসক্ষরণ হয়। একরকমের পাংক্রিয়াস রস নালীর সাহায্যে অন্ত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা অন্ত্রস্থিত খাদ্যের উপর ক্রিয়া করতঃ পরিপাকের সাহায্য করে কিন্তু আর এক রকমের রস যাহাকে ইনসুলিন (insulin) বলা হয় তাহা পাংক্রিয়াস সোজাসুজি রক্তের মধ্যে ঢালিয়া দেয় এবং দেহের মাংসপেশীগুলি ইনসুলিনের সাহায্যে রক্তাশ্রিত চিনিকে পোড়াইয়া তাপ ও শক্তি সংগ্রহ করে।

যে গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্যে রসক্ষরণ করে তাহাদের এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি বা অবুট গ্রন্থি বলা হয় এবং তাহাদের ক্ষরণকে (Secretion) হরমোন (Hormone) বলে। হরমোন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ এবং খুব অল্প পরিমাণে রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে। রক্তে হরমোনের কম বেশী থাকিবার জন্য দেহমনের নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। পাংক্রিয়াসের ক্ষরণ ইনসুলিনের কথা হইতেছিল। যদি ইনসুলিনের ক্ষরণ বন্ধ হয় তাহা হইলে মাংসপেশীগুলি রক্তাশ্রিত চিনি পুড়াইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে না, ফলে রক্তে চিনি জমিতে থাকে এবং প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। মাংসপেশীগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে, কাজকর্মে অনিচ্ছা আসে এবং একটি সাধারণ অসুস্থতা বোধ জন্মায়। এই রোগকেই ডায়াবিটিস বলা হয়। আবার ইনসুলিনের আধিক্য হইলে অতিরিক্ত ক্ষুধা, অধিক উত্তেজনার ফলে অবসাদ এবং দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। খুব বেশী মাত্রায় ইন্‌সুলিন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে অতিরিক্ত মানসিক ক্লেশ, ভুল বকা এবং অচৈতন্যাবস্থাও ঘটিতে পারে। এই সকল এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ও বৈশিষ্টহীন হইলেও ইহাদের ক্ষরিত হরমোনগুলির উপর আমাদের দেহমনের তথা ব্যক্তিত্বের সুস্থতা ও বিকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)।

ঘাড়ের নিম্ন প্রদেশে শ্বাস নালির সামনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থিটি অবস্থিত। ইহার ওজন এক আউন্সেরও কম। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ইহাই ফুলিয়া উঠিলে গলগণ্ড রূপে দেখা যায়। রোগাক্রমনে যদি থাইরয়েড় নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে রোগী তাহার পূর্বেকার উৎসাহ উদ্দীপনা হারাইয়া ফেলে এবং জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রোগের নাম "myxedema"; পায়ের চামড়া রসে ফুলিয়া উঠে, শরীরের মাংসপেশী ও মস্তিষ্ক স্থানুত্ব লাভ করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চলাফেরা ও কাজকর্মে মন্থর হইয়া পড়ে, সব জিনিষ ভুলিয়া যায় এবং কার্যকরীভাবে মনঃসংযোগ, চিন্তা বা কার্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। যদি শৈশব হইতেই থাইরয়েড নষ্ট হইয়া যায় বা বিকৃত হইতে থাকে তাহা হইলে ঠিকমত শরীরের বৃদ্ধি হয় না ও বুদ্ধির বিকাশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খুব খারাপ অবস্থায় রোগী বয়স অনুযায়ী পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত না হইয়া বামনাকৃতি থাকিয়া যায় (cretin)। দেহ বিকৃত ও অপুষ্ট থাকে এবং জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, যদিও স্বভাব শান্ত ও ধীর থাকে। এই রোগে অন্য প্রাণীদের থাইরয়েড নির্যাস সেবন করিলে মন্ত্রের মত রোগারোগ্য হয় এবং শৈশব থেকে নিয়মিত খাইয়া গেলে দেহ ও মনে স্বাভাবিক পূর্ণতা লাভ করা যায়।

থাইরয়েড থেকে যে হরমোন ক্ষরিত হয় তাহাকে থিরোক্সিন (Thyroxin) বলা হয় ইহার রাসায়নিক উপাদানগুলি হইতেছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং আইওডিন। থিরোক্সিনের মধ্যে আইওডিনই প্রধান; শতকরা ৬৫ ভাগই আইওডিন। খাদ্য পানীয়ের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ আইওডিন শরীরে গৃহীত হয় তাহা থাইরয়েডে কেন্দ্রীভূত হয়। থাইরয়েড নির্যাস না খাইয়া থিরোক্সিন খাইলেও সমান ফল পাওয়া যায়।

শারীরিক স্বতঃকৃত কার্যগুলির উপর থিরোক্সিনের যথেষ্ট প্রভাব আছে। স্বতঃকৃত কার্যগুলি বলিতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের কার্য, দৈহিক উত্তাপ রক্ষা ইত্যাদি কার্যগুলিকে বুঝায়। সেইজন্য থিরোক্সিনের অভাব হইলে

এইগুলির তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং দেহ মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া যায়। আবার থিরোক্সিনের আধিক্যে রোগী অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্তবাগীস, খিট্‌খিটে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়া পড়ে। শৈশবে এইরূপ আধিক্যে শরীর দ্রুত বাড়িতে থাকে বিশেষতঃ দৈর্ঘ্যে এবং অতিকায় দেহবিশিষ্ট হয় কিন্তু দেহের সহিত মানসিক বৃদ্ধি অসাধারণ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হইয়া থিরোক্সিনের আধিক্যে যে অবস্থা আনিয়া দেয় তাহাকে হাইপার থাইরয়েডিস্‌ম (Hyper Thyroidism) এবং ন্যূনতায় যে অবস্থা আনিয়া দেয় তাহাকে হাইপো থাইরয়েডিস্‌ম (Hypo Thyroidism) বলা হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম স্পৃহা ও খিটখিটে স্বভাব থিরোক্সিনের আধিক্যের বৈশিষ্ট্য ও অবসাদ থিরোক্সিনের ন্যূনতার বৈশিষ্ট্য। অবশ্য শুধু লক্ষণ দেখিয়া রোগ যে থাইরয়েড সঞ্জাত তাহা বলা যায় না—ইহার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

প্যারাথাইরয়েড।

থাইরয়েডের সংলগ্ন চারটি ছোট ছোট গ্রন্থি দেখা যায়। এইগুলিকে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বলা হয়। প্যারাথাইরয়েডকে সরাইয়া ফেলিলে মাংস-পেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্যারাথাইরয়েড হরমোনের অনুপস্থিতিতে নার্ভতন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্যারাথাইরয়েড হরমোন নার্ভতন্ত্রকে শান্ত ও সংযত রাখে এবং ইহার অবর্তমানে নার্ভতন্ত্র বিক্ষুব্ধ ও অতিরিক্ত সংবেদনশীল হইয়া পড়ে। রক্তে অতিরিক্ত প্যারাথাইরয়েড হরমোন থাকিলে রোগী অস্বাভাবিক শান্তশিষ্ট হইয়া পড়ে, মাংসপেশী থলথলে হয় ও উৎসাহ উদ্দীপনার একান্ত অভাব ঘটে। থাইরয়েড যেমন উত্তেজক প্যারাথাইরয়েড তেমন শান্তিকারক—দুইটির কার্য বিপরীত ধর্মী।

প্যারাথাইরয়েড হরমোনের সাহায্যে খাদ্য ও অস্থি হইতে ক্যালসিয়াম লবণ রক্তে গৃহীত হয়। রক্তে ক্যালসিয়াম যথোপযুক্ত না থাকিলে নার্ভতন্ত্র ও মাংসপেশী অতিরিক্ত উত্তেজনাশীল হইয়া পড়ে।

প্যারাথাইরয়েড হরমোনের আধিক্যে (hyper) অবসাদ ও আগ্রহহীনতা এবং ন্যূনতায় (hypo) মাংসপেশীর অতিরিক্ত সংকোচন ও ফলে ক্লান্তি, সর্বপ্রকার উদ্দীপকে তীব্র সাড়া, অল্পকারণেই মনোযোগের বিঘ্ন ও অন্যলোকের সমালোচনা বা বিরুদ্ধতার প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা উৎপন্ন হয়।

এড্রেনাল গ্রন্থি।

উভয় কিডনীর (kidney) পার্শ্বে দুইটি এড্রেনাল গ্রন্থি অবস্থিত। প্রত্যেক এড্রেন্যাল গ্রন্থি দুইভাগে বিভক্ত,—উপরের স্তরটিকে বলা হয় করটেক্স (cortex) বা বল্কল এবং অভ্যন্তরের অংশটিকে বলা হয় মেডালা (medulla) বা শাঁস। এই দুই ভাগই গঠনে ও কার্যে স্বতন্ত্র—ইহারা প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি এবং প্রত্যেকের হরমোন আলাদা।

করটেক্স গ্রন্থি আমাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কারণ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিলে বা রোগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে একটি সর্বব্যপক দুর্বলতা শরীরকে গ্রাস করিতে থাকে এবং ক্রমে মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়। করটেক্সের হরমোনের নাম করটিন (cortin) এবং মেডালার হরমোনের নাম এড্রেনিন্ (adrenin)। রক্তে খুব অল্প পরিমাণে এড্রেনিন থাকিলেও শরীরে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি উৎপন্ন করে ;

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর ও তীব্রতর হয় ;
গাত্রচর্ম ও আন্তর যন্ত্রগুলি (viscera) হইতে রক্ত প্রবাহ মাংসপেশী ও মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয় ;
পরিপাক যন্ত্রের কার্য স্থগিত থাকে ,
ফুস্‌ফুসে বেশী বায়ু প্রবেশ করে ;
লিভারের সঞ্চিত চিনি রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ;
মাংসপেশীগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না ;
চোখের তারা বড় হয়, গায়ে কাঁটা দেয় ও ঘাম হইতে থাকে।

এখন মনে হইতে পারে রক্তে এড্রেনিনের উপস্থিতিতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? দেখা যায় কেহ যখন রাগিয়া উঠে

বা ভীত হইয়া পলাইতে চায় তখন এড্রেনিনজাত পরিবর্তনগুলি প্রকট হয়। রাগ ও ভয়ের সময় হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যায়, গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, হজমের কাজ বন্ধ হয়, লিভারের চিনি কাজে লাগে এবং গায়ে কাঁটা দেয়।

এড্রেনিন ক্ষরণে শারীরিক লক্ষণগুলি দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন রাগ বা ভয়ের অবস্থা, তাহা বাস্তব বা কল্পিত যাহাই হউক না কেন, এড্রেনিন রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। রাগিয়া লড়াই করিবার সময় বা ভয় পাইয়া পলাইবার সময় শারীরিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অন্যস্থান থেকে রক্ত সরাইয়া লইয়া মাংসপেশীতে রক্ত সঞ্চালন বেশী হওয়া দরকার, বেশী পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া রক্ত শুদ্ধ করা দরকার সে জন্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়। পরিপাক যন্ত্রেব ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া সমস্ত শক্তি মাংসপেশীতে সংহত হয়, দেহের ক্লেদ ঘর্মাকারে বাহির হইয়া যায়।

ভবিষ্যতের কোন দুর্ঘটনার ভাবনা করিলেও উক্ত লক্ষণগুলি শরীরে ফুটিয়া উঠে। ছোটখাট নানা পরিস্থিতিতে, যেমন, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিবার বা গান গাহিবার বা অভিনয় করিবার বা পরীক্ষা দিবার সময় আমরা অনেকেই ঐরূপ লক্ষণগুলি অনুভব করি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে করটেক্স জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। ইহা সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে একপ্রকার সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি রোগীকে মৃত্যুপথে যাত্রী করিয়া তোলে। ইহাকে Addison's disease বলে। ক্রমোবর্ধমান দুর্বলতা ও নিস্পৃহতা, অনপনোদনীয় ক্লান্তি, কর্মবিমুখতা, ক্ষুধাহীনতা, দুর্বল হৃৎস্পন্দন, ছোঁয়াচে রোগে সহজে আক্রান্ত হওয়া এইগুলি এই রোগের বৈশিষ্ট্য। রোগীর চামড়া কাল হইয়া যায়, বাহিরের শীতাতপ সহ্য করিতে পারে না, অনিদ্রায় ভোগে, বিবেচনা শক্তি হ্রাস পায়, খিট্‌খিটে হয় এবং মিলিয়ামিশিয়া কাজ করিতে পারে না। অবশ্য করটিন সেবন করিলে এই লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়। কিভাবে করটিন শরীরকে সবল ও সতেজ রাখে তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন যে ইহা শরীরস্থ জল বা রসকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহস্থ টিস্যুগুলি হইতে জল রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে তরল ও প্রবাহ-

মান রাখে কিন্তু করটিনের অভাবে রক্ত জলের অভাবে ঘন হইয়া যায় ও সহজভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না ইহার ফলে উপরোক্ত উপসর্গগুলি আবির্ভূত হয়। এড্রেন্যাল করটেক্সের আধিক্যে পৌরুষের চিহ্নগুলি বেশী মাত্রায় প্রকট হয়। স্ত্রীলোকের মধ্যে আধিক্য হইলে স্ত্রীজনোচিত সুঢোল অঙ্গ সৌষ্ঠব হইতে পারে না, গলার স্বর গাঢ় হয়, এমনকি গোঁফ দাড়ির রেখা দেখা যায়।

পিটুইটারি গ্রন্থি।

মস্তকের মাঝখানে মস্তিষ্কের তলদেশে পিটুইটরি গ্রন্থি অবস্থিত। এই গ্রন্থি দুইভাগে বিভক্ত—সম্মুখের ভাগটিকে বলা হয় সম্মুখ লোব (Anterior lobe)। ইহা শরীরের বৃদ্ধিজনক হরমোন ক্ষরণ করে এবং পিছনের ভাগটিকে বলা হয় পশ্চাৎ লোব (Posterior lobe)। ইহার হরমোন শরীর আভ্যন্তরিন যন্ত্রগুলি যেমন পাকস্থলী, অন্ত্র রক্তবহানালী (blood vessels) ইত্যাদি মসৃণ পেশীগুলির (smooth muscles) শক্তিবর্ধন করে ও সতেজ রাখে। সম্মুখ লোব শুধু যে দেহের মাংসপেশী ও অস্থির বৃদ্ধি, ঘটায় তাহা নয়, যোনি যন্ত্রের বৃদ্ধি ও সক্রিয়তা ইহার উপর নির্ভর করে।

সম্মুখ পিটুইটরি যদি শৈশবে অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে অস্থি ও মাংসপেশী অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং এইরূপ শক্তিশালী পিটুই-টরির যে অধিকারী সে শীঘ্রই দৈত্যের মত আকার প্রাপ্ত হয়; ৭ হইতে ৯ ফুট লম্বা হওয়া তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তবে এইভাবে অপ্রাকৃত বৃদ্ধি ঘটাইয়া পিটুইটরি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে ফলে অতিকায় দেহপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্বের শক্তি সামর্থ্য হারাইতে থাকে এবং অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে সম্মুখ পিটুইটরি যদি কোনক্রমে অধিক মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে দৈর্ঘ্যে আর বৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু হাত, পা, নিম্ন, চোয়াল, নাক ও ভূরু অর্থাৎ শরীরের প্রত্যঙ্গ প্রদেশগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় এক্রোমেগ্যালী (acromegaly)।

সম্মুখ পিটুইটরির স্বাভাবিক সক্রিয়তার অভাব ঘটিলে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া রোগী বামনাকার প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কাম শক্তির অভাব থাকিলেও

বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে। বাল্যাবস্থায় এইরূপ ব্যক্তিকে পিটুইটরি নির্যাস খাওয়াইলে স্বাভাবিক ভাবেই শরীর বাড়িতে থাকে।

পশ্চাৎ পিটুইটরির সহিত দেহের মেদের সম্বন্ধ আছে। পশ্চাৎ পিটুইটরি দুর্বল হইলে শরীরে চর্বি জমিয়া বেশী মোটা হইয়া পড়ে। পশ্চাৎ পিটুইটরির অন্যান্য কার্য পূর্বে বলা হইয়াছে।

সম্মুখ পিটুইটরি শরীরের বৃদ্ধি ঘটান ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থি যেমন থাইরয়েড, এড্রেন্যাল, করটেক্স ও যৌনগ্রন্থিগুলিকে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম রাখে ও তাহাদের যথারীতি বৃদ্ধির সাহায্য করে।

আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে প্রভাবিত হয় সম্মুখ পিটুইটরির কার্যের তারতম্যের উপর। সম্মুখ পিটুইটরি ক্ষীণ হইলে দেহের মাংসপেশীগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। অবসাদ আসে, ভগ্নোদ্যম ও কর্মসমাপ্তির পূর্বেই কর্মত্যাগ করিতে ইচ্ছা আসে। অপরপক্ষে শক্তিশালী পিটুইটরি মাংপেশীগুলিকে সবল রাখে, সব বিষয়ে আগাইয়া যাওয়ার সাহস আনিয়া দেয়, আত্মসংযম ও বিচক্ষণতা উৎপাদন করে।

যোনিগ্রন্থি (The Gonads)

যোনিগ্রন্থিগুলি সন্তানোৎপাদক জীবকোষ (germcell) সৃষ্টি করে। ইহাছাড়া পুং হরমোনগুলি পুরুষ জনোচিত ও স্ত্রী হরমোনগুলি নারী জনোচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়। যৌবনকালে ইহারা সন্তানোৎপাদক শারীর যন্ত্রগুলিকে সম্যক বিকাশশীল করিয়া তোলে এবং অন্যান্য যোনিলক্ষণগুলি যেমন পুরুষের গোঁফ দাড়ী ও গাঢ় কণ্ঠস্বর এবং মেয়েদের স্তনের আবির্ভাব ও পরিপুষ্টি ঘটায়। যোনিগ্রন্থি ক্ষরিত হরমোনের অভাব ঘটিলে পুরুষত্ব ও নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না এবং নপুংসক অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রত্যেক গ্রন্থি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে না প্রায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা দেখিয়াছি থাইরয়েড, সম্মুখ পিটুইটরি, এড্রেন্যাল করটেক্স এবং যৌনগ্রন্থি ইহারা সকলেই শারীরিক বৃদ্ধির জন্য

অতীব প্রয়োজনীয়। সাধারণ বাহ্যিক আচরণের উপর বেশীর ভাগ গ্রন্থিই প্রভাব বিস্তার করে। সমবেত ও পরস্পর সাপেক্ষ ভাবেই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় থাকে।

নবম অধ্যায়

মনোবিদ্যায় পরিসংখ্যান

মাপনা (measurement) কাহাকে বলে ?

অনেক রকম ভাবে ব্যক্তি বা বস্তুর মাপ লওয়া যাইতে পারে এবং মাপের নির্ভুলতারও তারতম্য হইতে পারে। বস্তুর বা ব্যক্তির কোন গুণ বা পরিমাণের কম বেশী অনুযায়ী যদি তাহাদের পর পর রাখা যায় তাহা হইলে মাপের প্রণালী সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল হয়। ওজন, দৈর্ঘ্য বা কাজের পরিমাণের ক্রম অনুসারে লোকেদের তুলনামূলক মাপনা করা যাইতে পারে। বাংলার কৃষকেরা বৎসরে কত শস্য উৎপাদন করিতে পারে সেই অনুসারে তাহাদের ক্রম বিন্যাস (Rank) করা যাইতে পারে। রেডিওতে কোন্ কোন্ গায়কের গান শুনিবার জন্য কত কত লোক উৎসুক তাহাদের সংখ্যার কম বেশী অনুসারে গায়কের লোকপ্রিয়তার একটী তুলনামূলক মাপনা পাইতে পারি। নির্দিষ্ট দলের মধ্যে ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ক্রমিক স্থান আমরা ক্রমবিন্যাসের (Rank order) মধ্যে পাই। কিন্তু তুলনামূলক নির্দেশ ব্যতীত বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের নির্দিষ্ট মাপনা ক্রমবিন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। গজ, ফুট, ইঞ্চি বা মণ, সের, ছটাকের যেমন যোগ বিয়োগ করা যায়, ক্রমিক স্থানের সেইরূপ যোগ বিয়োগ করা যায় না কারণ কোন ব্যক্তির ক্রমিক স্থান নির্দিষ্ট দলের অন্য ব্যক্তিদের ক্রমিক স্থানের আপেক্ষিক (relative); ইহার কোন পরম (absolute) মান নাই কারণ ইহার কোন একক (unit) নাই।

কোন একটী বস্তুর দৈর্ঘ্য ৫ ফুঃ ৩ ইঃ এবং অন্য আর একটী বস্তুর দৈর্ঘ্য ২ ফুঃ ৭ ইঃ। আমাদের বলিতে হয় না যে প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তু অপেক্ষা লম্বায় বেশী। আমরা অনায়াসে বলিতে পারি প্রথম বস্তুটী (৫′ ৩″ = ৬৩″) দ্বিতীয় বস্তু (২′ ৭″ = ৩১″) অপেক্ষা ২ ফুঃ ৮ ইঃ (৬৩″ − ৩১″ = ৩২″ = ২′ ৮″)

লম্বায় বেশী বা দুই বস্তুর মিলিত দৈর্ঘ্য (৬৩″+৩১″=৯৪″=৭′ ১০″) ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। এইরূপ যোগ বিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় এই কারণে যে দৈর্ঘ্য মাপিবার একটী একক আছে যাহাকে আমরা ১ ইঞ্চি বলিয়া থাকি এবং সর্বসম্মত এই ১ ইঞ্চিকে একক ধরিয়া আমরা যে কোন বস্তুর পরম মাপন (absolute measurement) পাইতে পারি। ক্রমবিন্যাসে (Rank order) কিন্তু এইরূপ একক না থাকায় আমরা ক্রমিক স্থানের যোগ বিয়োগ বা পরম মাপন স্থির করিতে পারি না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কাহারও হয়ত দশম স্থান হইয়াছে—ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যত ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সংখ্যা অনুযায়ী তাহার স্থান দশম কিন্তু দ্বিতীয় স্থান বা দশম স্থানকে যোগ করিয়া তাহাদের সংযোগে কি যুক্ত মাপন হয় বা বিয়োগ করিয়া কি পার্থক্য হয় তাহা স্থির করিতে পারি না কেননা পূর্বের বস্তু দুইটীর দৈর্ঘ্যের ন্যায় কোন এককের সাহায্যে দ্বিতীয় বা দশম স্থানের কোন পরম মাপন স্থির করা যায় না যাহার সাহায্যে যোগ বিয়োগ সম্ভব হইতে পারে।

ব্যক্তির মাপন সাফল্যাঙ্কের (scores) দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। একটী নির্দিষ্ট কাজ করিতে কত সময় লাগিল তাহার পরিমাণের সাহায্যে সাফল্যাঙ্ক স্থির করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কখনও কখনও কার্যের কঠিনতা বা উৎকর্ষতার দ্বারাও সাফল্যাঙ্ক স্থির করা হয়। সাফল্যাঙ্ক যদি সমান সমান হারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে একটি মানকের (scale) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সাফল্যাঙ্কগুলিকে যদি ধরা যায় ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২,........এইরূপ দুই দুই করিয়া সমান ক্রমে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে একটী মানকের সৃষ্টি হইল। মনোবিদ্যা এবং শিক্ষায় (education) এইরূপ মানকের অভীক্ষা (scaled tests) আছে কিন্তু এইরূপ মাণকের কোন শূন্যস্থান (zero point) নাই। ফুট স্কেলে ১ ইঞ্চি ২ ইঞ্চি করিয়া এই মানক বাড়িয়া গিয়াছে। ফুট স্কেলের প্রথমে অর্থাৎ যেখান থেকে প্রথমে ১ ইঞ্চি মাপা হয়—যে স্থানকে আমরা শূন্য ইঞ্চি ধরিয়া লই অর্থাৎ আরম্ভের স্থানের বিন্দুতে কোন দৈর্ঘ্যই নাই এবং

তাহার পর হইতেই দৈর্ঘ্যের অস্তিত্ব সুরু হইল। এইভাবে ওজন ও কালের সময় বিভাগেরও শূন্যস্থান আছে। কিন্তু মানসিক সামর্থ্যের শূন্যস্থান কল্পনা করা যায় না। কাহারও বুদ্ধি বা স্মৃতি একদম শূন্য ইহা বাস্তবে সম্ভব নয়। বস্তুর দৈর্ঘ্য ও ওজনের মাপগুলির যোগ বিয়োগ করা যায় এবং ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে ২০ সের ওজনের বস্তু ১০ সের ওজনের বস্তুর থেকে দ্বিগুণ ভারী। মানসিক অভীক্ষার মানক অন্তর্গত সাফল্যাঙ্কগুলিও যোগ বিয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু কোন অভীক্ষায় প্রাপ্ত ৫০ সাফল্যাঙ্ক, সেই অভীক্ষার প্রাপ্ত ২৫ সাফল্যাঙ্ক অপেক্ষা দ্বিগুণ ইহা আমরা বলিতে পারি না কেননা দুইটী সাফল্যাঙ্কই মানসিক সামর্থ্যের শূন্যস্থান হইতে মাপা হয় নাই। এই বিষয়ে পরে আরও ভাল ধারণা হইবে। যে সমস্ত মানসিক গুণাগুণ এইরূপ সাকল্যাঙ্কের দ্বারা প্রকাশযোগ্য তাহাদিগকে ভেদ্য (variable) বলা হয়।

অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন রাশি।

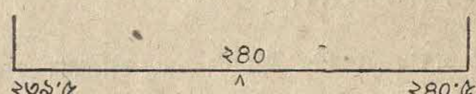
অনবিচ্ছিন্ন সংখ্যার রাশির মধ্যে ধরা হয়, কোন ফাঁক নাই। ১, ২ এই রাশিটির মধ্যে ১এর পর দুই আসিতেছে কিন্তু যদি ধরা যায় ১ এবং ২এর মধ্যে কোন ফাঁক নাই অর্থাৎ ১ একেবারেই ২ হইয়া উঠিতেছে না তাহা হইলে ১.১, ১.২ এইভাবে বাড়িয়া বাড়িয়া শেষে ২এ পরিণত হইতেছে। আরও সূক্ষ্মভাবে আমরা ধরিতে পারি ১.১ থেকে ১.২ হইবার পথে ১.১, ১.১১, ১.১২ এই সংখ্যাগুলি উহাদের ফাঁক ভরিয়া দিতেছে। এইভাবে সূক্ষ্মভাবে ভাবিতে ভাবিতে শেষে আমরা এমন সংখ্যারাশির কথা ভাবিতে পারি যাহা অব্যবহিত, অনবিচ্ছিন্ন।

মানসিক ও সামাজিক প্রলক্ষণের (traits) ভেদ্যগুলি এইরূপ অনবিচ্ছিন্ন রাশির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সমস্ত প্রকারের ভেদ্যই এইরূপ অনবিচ্ছিন্ন রাশির মধ্যে পড়ে না। লোকগণনার (census) হিসাবে দেখা গেল কোন একটী স্থানের গড় পরিবারের লোকসংখ্যার মধ্যে ৩.৪১ জন ছেলেপুলে আছে কিন্তু গাণিতিক হিসাবে ৩.৪১ জন ছেলেপুলে হইলেও বাস্তবে এইরূপ সম্ভব হয় না—হয় ৩ জন অথবা ৪ জন ছেলেই হইতে পারে এখানে ৩ এবং ৪এর মধ্যে

সত্যকারের ব্যবধান আছে। সুতরাং এইরূপ সংখ্যার রাশিকে বিচ্ছিন্ন রাশি বলা হয়।

সাফল্যাঙ্কের অবিচ্ছিন্ন রাশির অর্থ।

অবিচ্ছিন্ন রাশির সাফল্যাঙ্কগুলিকে (scores) রাশির ধারাবাহিকতার (continuum) মধ্যে দূরত্ব নির্দেশক হিসাবেই ধারণা করা হয়—সাফল্যাঙ্ক-গুলিকে বিশিষ্ট কিছু বলিয়া ধরা হয় না। এক ইঞ্চি বলিলে আমরা ফুটকাঠির একটী বিশেষ দূরত্বকে বুঝিয়া থাকি। যেমন ফুট কাঠির ৩ ইঞ্চি যেখানে লেখা আছে আর ৪ ইঞ্চি লেখা আছে এই ৩ থেকে ৪ ইঞ্চির মধ্যের ব্যবধানকেই এক ইঞ্চি বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে মানসিক অভীক্ষার একটী সাফল্যাঙ্ক বলিলে দুইটী সীমার মধ্যে একটী একক দৈর্ঘ্যকেই (unit distance) বুঝায়। কোন মানসিক অভীক্ষার ২৪০ সাফল্যাঙ্ক বলিতে ২৩৯.৫ এবং ২৪০.৫ সাফল্যাঙ্কের ব্যবধানকেই বুঝায় এবং এই ব্যবধানের ঠিক মধ্যবিন্দু হইতেছে ২৪০ সাফল্যাঙ্ক। নীচে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইল।



কোন সাফল্যাঙ্কের .৫ একক নিম্নে এবং .৫ একক উর্ধে যতগুলি মূল্য (values) থাকে সবই ঐ সাফল্যাঙ্কের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। উপরের উদাহরণ অনুসারে ২৩৯.৫ থেকে ২৪০.৫ এর মধ্যে যে সংখ্যাই হউক না কেন তাহা ২৪০ সাফল্যাঙ্ক বলিয়াই ধরা হইবে, যেমন ২৩৯.৮, ২৩৯.৯, ২৪০.০, ২৪০.৩, ২৪০.৪ সবই ২৪০ সাফল্যাঙ্ক বলিয়াই ধরা হইবে। সুতরাং একটী সাফল্যাঙ্কের গাণিতিক অর্থ তাহার নিম্নের .৫ একক হইতে তাহার উর্ধে .৫ একক পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত মূল্যকেই বুঝায়।

সাফল্যাঙ্কের শ্রেণীবিভাগ (Frequency Distribution)।

অভীক্ষা ও পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত উপাত্তগুলি (data) সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ না করিলে ইহাদের তাৎপর্য বুঝা যায় না সেইজন্য প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ক-

গুলিকে শ্রেণী বা বর্গে পুনর্বিন্যাস করিতে হয়। বর্গীকরণ প্রক্রিয়াকে আমরা তিনটী প্রধানভাগে ভাগ করিতে পারি।

(১) যতগুলি সাফল্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট সংখ্যার মধ্যে যে ব্যবধান বা গোচর (range) আছে প্রথমে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। সর্ববৃহৎ সংখ্যা হইতে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে বিয়োগ দিলেই গোচর বাহির হইবে।

(২) যতগুলি বর্গে সাফল্যাঙ্কগুলিকে ভাগ করিতে হইবে তাহাদের সংখ্যা ও আকার নির্ণয় করিতে হইবে। সাফল্যাঙ্কের গোচর (range) এবং প্রকৃতি অনুসারেই এই class interval (বর্গগুলি) স্থির করিতে হইবে।

(৩) পৃথক পৃথক সাফল্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের যথাযোগ্য বর্গে তালিকাভুক্ত (tabulation) করিতে হইবে।

এই তিন প্রকার প্রণালীর উদাহরণ ১নং তালিকায় দেওয়া হইল। ঐ তালিকায় প্রদত্ত সাফল্যাঙ্কগুলির মধ্যে ১০৭ বৃহত্তম ও ৫২ ক্ষুদ্রতম। সুতরাং এই রাশির গোচর (১০৭—৫২) ঠিক ৫৫ হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে একটী রাশিকে কয়টী শ্রেণী বা বর্গে ভাগ করা উচিত। Class interval বা বর্গ ব্যবধান এমনভাবে স্থির করা উচিত যাহাতে শ্রেণী সংখ্যা দশটার কম বা কুড়িটার বেশী না হয়।

যে interval বা ব্যবধান আমরা রাখিতে চাই তাহার দ্বারা গোচরকে ভাগ দিলে শ্রেণী সংখ্যার (class intervals) মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। আমাদের উদাহরণে গোচর ৫৫ কে ৫ (the intervals) দিয়া ভাগ দিলে ১১ হয় যাহা আসলে যতগুলি শ্রেণী সংখ্যা আছে অর্থাৎ—

১ম তালিকা

Frequency distribution এ সাফল্যাঙ্কের—বর্গীকরণ পদ্ধতি

১। সাফল্যাঙ্ক (শ্রেণী বিভাগের পূর্বে)

৬৩	৭৮	৯৫	৮৫	৮৬	৭৩	৮৬	৭৩	৯৬	৫৬
৭৮	৮৬	৮২	৮০	৬৮	৯০	৮৩	৮২	৯৯	৬৬
৮২	১০৩	৮৯	৮১	৬৫	৮৬	৮৪	৮৩	৬৩	৫৭
৭৪	৮৭	৭৩	৯০	৯০	৮৬	৮০	৯৬*	১০৭	৬৫
১০৩	৭৩	৯২	৭৮	৭৫	৮৪	৯২	৫৮†	৫২	৬৯

*বৃহত্তম সাফল্যাঙ্ক †ক্ষুদ্রতম সাফল্যাঙ্ক

২। ঐ ৫০টি সাফল্যাঙ্ক frequency distribution এ শ্রেণী বিভাগ করিলে যেরূপ হয়।

(১) class-Intervals	(২) Tallies ট্যালি চিহ্ন	(৩) f (frequency) পৌনঃ পুণ্য
১০৫—১০৯	1	১
১০০—১০৪	11	২
৯৫— ৯৯	1111	৪
৯০— ৯৪	~~1111~~	৫
৮৫—৮৯	~~1111~~ 111	৮
৮০—৮৪	~~1111~~ ~~1111~~	১০
৭৫—৭৯	~~1111~~ 1	৬
৭০—৭৪	1111	৪
৬৫—৬৯	1111	৪
৬০—৬৪	11	২
৫৫—৫৯	111	৩
৫০—৫৪	1	১
		N ৫০

১২ তাহার হইতে ১ কম। ব্যবধান (interval) ৩ হইলে ১৯টি শ্রেণী পাওয়া যাইত ; ১০ হইলে ৬টি শ্রেণী পাওয়া যাইত।

পৃথক পৃথক সাফল্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করিবার প্রণালী ১ম তালিকায় দেখান হইল। তালিকার প্রথম স্তম্ভে শ্রেণী অন্তর (class-intervals) গুলিকে ক্রমিক পর্যায়ে বিন্যাস করা হইয়াছে। স্তম্ভের তলায় সবচেয়ে ছোট এবং স্তম্ভের উপরে সবচেয়ে বড় সাফল্যাঙ্ক রাখা হইয়াছে। প্রথম অন্তর (interval) "৫০ হইতে ৫৪" ৫০ এ আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫৪ য় শেষ হইয়াছে এবং এই অন্তরের মধ্যে ৫টি সাফল্যাঙ্ক যথা ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ আছে। দ্বিতীয় অন্তরটি "৫৫ হইতে—৫৯"। ৫৫এ আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫৯ এ শেষ হইয়াছে এবং এই অন্তরের মধ্যে ৫টি সাফল্যাঙ্ক যথা ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ এইগুলি আছে। এইভাবে প্রত্যেক উর্ধতর অন্তরের মধ্যে ৫টি করিয়া সাফল্যাঙ্ক আছে—এবং সর্বশেষ অন্তর "১০৫ হইতে ১০৯" এ আরম্ভ হইয়া ১০৯এ শেষ হইয়াছে এবং পূর্ববৎ পাঁচটি সাফল্যাঙ্ক যথা ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ এই অন্তরের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে ট্যালি চিহ্নের (tally mark) সাহায্যে উপরের পৃথক পৃথক সাফল্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের নির্দিষ্ট অন্তরের (interval) পাশে রাখা হইয়াছে। যেমন প্রথম সাফল্যাঙ্ক ৬৩ "৬০ হইতে ৬৪" এই অন্তরের মধ্যে পড়ায় এই অন্তরের পাশে একটি ট্যালি চিহ্ন (tally mark) দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সাফল্যাঙ্ক ৭৮কে ঐরূপে '৭৫ হইতে ৭৯' অন্তরের পাশে একটি ট্যালির (tally) দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। তৃতীয় সাফল্যাঙ্ক ৮২ কে "৮০ হইতে ৮৪" অন্তরের পাশে চিহ্নিত করা হইয়াছে একটি ট্যালির (tally) দ্বারা। অবশিষ্ট সাফল্যাঙ্কগুলিকেও অনুরূপভাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ৫০টি সাফল্যাঙ্ক এইভাবে তালিকাভুক্ত হইয়া গেলে প্রত্যেক অন্তরের পাশে যতগুলি ট্যালি (tally) আছে তাহাদের যোগফলগুলি পৌণপুণ্য (f) নামক তৃতীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে। এই পৌনঃপুণ্য স্তম্ভের

অঙ্কগুলির যোগফলকে 'N' বলা হয়। তখন তাহাদের এই আংকিক বিন্যাসকেই frequency distribution বলা হয়।

ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে প্রথম অন্তরের প্রথম সাফল্যাঙ্ক ৫০ ধরা হইয়াছে কিন্তু সাফল্যাঙ্কগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সাফল্যাঙ্ক ৫২। "৫২ হইতে ৫৬" এইরূপ অন্তরও লওয়া যাইতে পারিত কিন্তু ৫ এককের অন্তর হইলে পাঁচের গুণিতক (multiples) ৫০, ৫৫, ৬০ এইরূপ রাশি হইলে অঙ্ক কষিবার সুবিধা হয়।

একটি frequency distribution এ অন্তরগুলির (class intervals) শেষসীমা (limits) কত প্রকারে বর্ণনা করা যায় তাহা দ্বিতীয় তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

(২নং তালিকা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তালিকার মধ্যে—ক খণ্ডে "৫০ হইতে ৫৫" অন্তরের মধ্যে ৫০ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৫ অবধি কিন্তু ৫৫কে বাদ দিয়া যত সাফল্যাঙ্ক থাকিবে তাহা এই অন্তরের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (খ) খণ্ডে অন্তরগুলির ব্যবধান (distauce) (ক) খণ্ডের মতই আছে। কিন্তু প্রত্যেক অন্তরের নিম্ন ও ঊর্ধসীমা সঠিকভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে একটী অবিচ্ছিন্ন রাশির (series) অন্তর্গত সাফল্যাঙ্ক ৫০কে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় ৪৯·৫ হইতে ৫০·৫ এই অন্তরের মধ্যে ইহা অবস্থিত অর্থাৎ ইহা একটি বিন্দু নয় ইহা একটি ৪৯·৫ হইতে ৫০·৫ অবধি সীমাবদ্ধ দূরত্ব। সেইরকম সাফল্যাঙ্ক ৫৪ এর তাৎপর্য ৫৩·৫ হইতে ৫৪·৫ সাফল্যাঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব একটি অন্তর ৫০ হইতে আরম্ভ হইয়া ৫৪ তে শেষ হইতেছে ইহাকে সঠিকভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহা ৪৯·৫ (অর্থাৎ সাফল্যাঙ্ক ৫০ এর আরম্ভ) নিম্নসীমা হইতে ৫৪·৫ (অর্থাৎ সাফল্যাঙ্ক ৫৪ র শেষ সীমা) ঊর্ধসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। (গ) খণ্ডের অন্তরগুলি যদিও ততটা সঠিকভাবে নয় কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে একই তথ্যকে উপস্থাপিত করিতেছে। ৫০—৫৪ এর অর্থ অন্তরটি ৫০এ আরম্ভ হইয়া ৫৪তে শেষ হইতেছে। কিন্তু ইহাতে অন্তরের সীমাগুলি সঠিকভাবে

২য় তালিকা

সাফল্যাঙ্কগুলিকে Frequency distribution এ তালিকাভুক্ত করিবার প্রণালী।

ক			খ			গ		
শ্রেণী অন্তর class-intervals	মধ্যবিন্দু Midpoint.	পৌনঃপুন্য F	অন্তর সমূহ	মধ্যবিন্দু	পৌনঃপুন্য	অন্তর সমূহ	মধ্যবিন্দু	পৌনঃপুন
১০৫—১১০	১০৭	১	১০৪.৫—১০৯.৫	১০৭	১	১০৫—১০৯	১০৭	১
১০০—১০৫	১০২	২	৯৯.৫—১০৪.৫	১০২	২	১০০—১০৪	১০২	২
৯৫—১০০	৯৭	৪	৯৪.৫—৯৯.৫	৯৭	৪	৯৫—৯৯	৯৭	৪
৯০—৯৫	৯২	৫	৮৯.৫—৯৪.৫	৯২	৫	৯০—৯৪	৯২	৫
৮৫—৯০	৮৭	৮	৮৪.৫—৮৯.৫	৮৭	৮	৮৫—৮৯	৮৭	৮
৮০—৮৫	৮২	১০	৭৯.৫—৮৪.৫	৮২	১০	৮০—৮৪	৮২	১০
৭৫—৮০	৭৭	৬	৭৪.৫—৭৯.৫	৭৭	৬	৭৫—৭৯	৭৭	৬
৭০—৭৫	৭২	৪	৬৯.৫—৭৪.৫	৭২	৪	৭০—৭৪	৭২	৪
৬৫—৭০	৬৭	৪	৬৪.৫—৬৯.৫	৬৭	৪	৬৫—৬৯	৬৭	৪
৬০—৬৫	৬২	২	৫৯.৫—৬৪.৫	৬২	২	৬০—৬৪	৬২	২
৫৫—৬০	৫৭	৩	৫৪.৫—৫৯.৫	৫৭	৩	৫৫—৫৯	৫৭	৩
৫০—৫৫	৫২	১	৪৯.৫—৫৪.৫	৫২	১	৫০—৫৪	৫২	১
		N—৫০			N—৫০			N-৫০

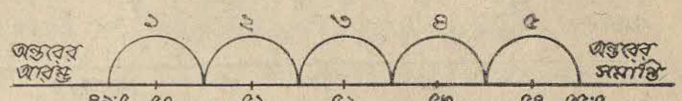
দেওয়া নাই। নিম্নের পরিলেখ (diagram) হইতে তিনরকম পদ্ধতি যে একই তথ্যকে প্রকাশ করে তাহা প্রদর্শিত হইল।

অন্তর

৫০ হইতে ৫৫

৪৯.৫ হইতে ৫৪.৫

৫০ হইতে ৫৪

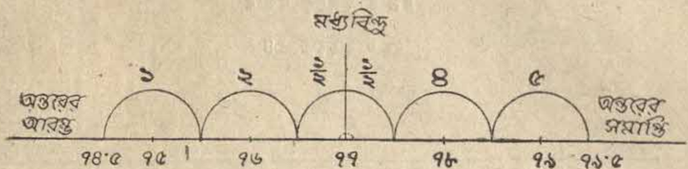


সাফল্যাঙ্কগুলিকে তাড়াতাড়ি তালিকাভুক্ত করিবার পক্ষে (ক) ও (খ) পদ্ধতির থেকে (গ) ই বেশী সুবিধাজনক। (ক) পদ্ধতিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সাফল্যাঙ্ক ৬০ অনায়াসে "৫৫ হইতে ৬০" অন্তরের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে। ঊর্ধ সীমায় ৬০ সংখ্যার উপস্থিতিই হয়ত এই ভুলের জন্য দায়ী হয়। (খ) পদ্ধতিতে নিম্ন ও ঊর্ধ সীমায় '৫ বারবার লিখিবার জন্য বহু সময় লাগে। তাড়াতাড়ি তালিকাভুক্ত করিবার জন্য (গ) পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে মনে রাখিতে হইবে যে লিখিত অন্তরগুলির সীমা বাস্তবিক সীমা নয়। "৫০-৫৪" সত্যি সত্যি আরম্ভ হইতেছে ৪৯.৫ (৫০ এ নয়) এবং শেষ হইতেছে ৫৪.৫ (৫৪ তে নয়)। এই কথা মনে রাখিতে (ক) ও (খ) এর মত (গ) পদ্ধতিও নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা যায়।

পৌণঃপুণ্য বিস্তারে (frequency distribution) কোন নির্দ্দিষ্ট অন্তরের অন্তর্গত সাফল্যাঙ্কগুলিকে ধরিয়া লওয়া হয় যে তাহারা যেন সমগ্র অন্তরের মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া আছে। অন্তর ৩, ৫ বা ১০ এককের যাহাই হউক না কেন উপরোক্ত ধারণা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তরের এইরূপ সমানভাবে ছড়াইয়া থাকার ফলে একটি অঙ্কর দ্বারা সকল সাফল্যাঙ্কের একটি সাধারণ মান পাওয়া যায়। মধ্যবিন্দুই এই সাধারণ মানকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ৭৫-৭৯ (২য় তালিকা (গ) পদ্ধতি) অন্তরটি লইতে পারি

ইহার অন্তর্গত ৬টি সাফল্যাঙ্ককেই ৭৭ এই অঙ্ক দিয়া প্রকাশ করা হইতেছে কারণ ৭৭ এই অন্তরের মধ্যবিন্দু। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ৭৭ কে কেন মধ্যবিন্দুরূপে নির্ণয় করা হইল তাহা প্রদর্শিত হইল।

মধ্যবিন্দু



একটি অন্তরের মধ্যবিন্দু বাহির করিবার একটি সরল উপায় দেওয়া হইল।

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{অন্তরের নিম্নসীমা} + \frac{(\text{উর্ধসীমা-নিম্নসীমা})}{২}$$

$$\text{আমাদের উদাহরণে } ৭৪\cdot৫ + \frac{৭৯\cdot৫ - ৭৪\cdot৫}{২} = ৭৭ \text{ (মধ্যবিন্দু)}$$

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট অন্তরের সমস্ত সাফল্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিত্ব মধ্যবিন্দু সত্যসত্যই কি করিতে পারে। ১ম তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই ৮০—৮৪ (মধ্যবিন্দু ৮২) অন্তরের মধ্যে ১০টি সাফল্যাঙ্ক আছে, ইহার মধ্যে তিনটি (৮০, ৮১, ৮০) মধ্যবিন্দুর উর্ধে আছে। "১০৫-১০৯" অন্তরের একমাত্র সাফল্যাঙ্ক ১০৭ ঠিক মধ্যবিন্দুর সহিত মিলিয়া গিয়াছে। আমাদের উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে মধ্যবিন্দু সাফল্যাঙ্কগুলির মূল্য ঠিক ঠিক প্রতিভাত করিতে পারিতেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মধ্যবিন্দু নিম্ন ও উর্ধে এইরূপ সমতা আশা করা যায় না। উপাত্ত (data) কম থাকার দরুণ বা অন্যকারণে মধ্যবিন্দু নিম্নে বা উর্ধে অধিকসংখ্যক সাফল্যাঙ্ক থাকিয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় মধ্যবিন্দুকে নির্দিষ্ট অন্তরের সমস্ত সাফল্যাঙ্কের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

একটি বিস্তারের (distribution) মধ্যে যদি যথেষ্ট সাফল্যাঙ্ক থাকে এবং

অন্তরগুলি যদি বেশী বড় না হয় তাহা হইলে একটি অন্তরের সাফল্যাঙ্কগুলির সাধারণ মূল্য হিসাবে মধ্যবিন্দুকে ভালভাবেই গণ্য করা যায়। কিন্তু এইরূপ অবস্থা না হইলেও মধ্যবিন্দুর ব্যবহারে বিশেষ ভুল হয় না কেননা শেষ পর্যন্ত সমস্ত মধ্যবিন্দুর ঊর্ধে ও নিম্নে যত সাফল্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে মোটামুটি একটি সমতা থাকে। একটি অন্তরের বৈষম্য অন্য অন্তরের বিপরীত বৈষম্যর দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া যায়।

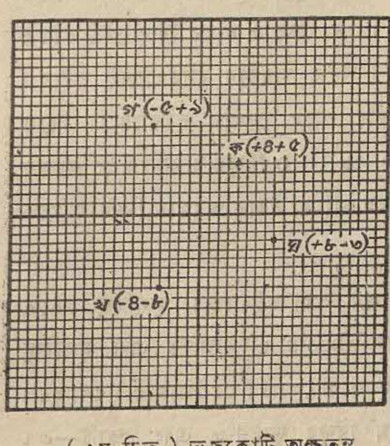
পৌনঃপুন্য বিস্তারের লৈখিক প্রদর্শন

দেখা গিয়াছে গাণিতিক উপাত্তগুলিকে লেখচিত্রের দ্বারা প্রকাশ করিলে তাড়াতাড়ি বুঝিবার খুব সুবিধা হয় এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই অধ্যায়ে পৌনঃপুন্য বিস্তারের লৈখিক প্রদর্শনের দুইটি পদ্ধতির বর্ণনা করা হইবে। এই লেখ দুইটিকে যথাক্রমে frequency polygon এবং histogram বলা হয়।

উপাত্তের চিত্র আঁকিবার সাধারণ সূত্র

Frequency polygon বা histogram প্রস্তুত করিবার পদ্ধতির বর্ণনার পূর্বে উপাত্তের লেখ আঁকিবার বীজ গাণিতিক সরল সূত্রগুলির বর্ণনা করার প্রয়োজন। দুইটি রেখার সাহায্যে লেখ (graph) আঁকা হয়। এই দুইটি রেখাকে ভুজকোটি অক্ষ (co-ordinate axes) বলা হয়। উল্লম্ব (vertical) রেখাটিকে y-অক্ষ (y-axis) এবং অনুভূমিক (horizontal) রেখাটিকে x-অক্ষ (x-axis) বলা হয়। এই দুইটি রেখা এক অন্যের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত থাকে। যে বিন্দুতে ইহারা পরস্পর ছেদ করে তাহাকে মূলবিন্দু



(১ম চিত্র) ভুজকোটি অক্ষতন্ত্র

(origin) বা o বলা হয়। ১ম চিত্রে ভুজকোটি অক্ষতন্ত্র আঁকা হইয়াছে।

মূলবিন্দু হইতেছে শূন্যবিন্দু যেখান হইতে দুইটি অক্ষের মাপ লওয়া হয়। মূলবিন্দুর (o) হইতে x অক্ষের দক্ষিণদিকের দূরত্বের মাপগুলি সদর্থক (positive) এবং বামদিকের দূরত্বের মাপগুলি নঞর্থক (negative)। অনুরূপভাবে oর উপরের y-অক্ষের দূরত্বের মাপগুলি সদর্থক ও নীচের দূরত্বের মাপগুলি নঞর্থক। x এবং y অক্ষ o-তে পরস্পর ছেদ করায় চারটি ভাগের বা পাদের (quadrants) সৃষ্টি হইয়াছে। উপরের দক্ষিণ ভাগের বা প্রথম পাদের সব x এবং y উভয় মাপগুলিই সদর্থক (+ +)। উপরের বামভাগের বা দ্বিতীয় পাদের x বিয়োগ এবং y যোগ (− +)। নীচের বামভাগ বা তৃতীয় পাদে x এবং y দুইই নঞর্থক (− −)। নীচের দক্ষিণভাগ বা চতুর্থ পাদে x যোগ এবং y বিয়োগ (+ −)।

ধরা যাউক "ক" বিন্দুর অবস্থান বাহির করিতে হইবে। ইহার অক্ষ দুইটির মান যথাক্রমে x = ৪ এবং y = ৫। x-অক্ষের উপর ডানদিকে o হইতে আমাদের ৪ ঘর গুনিয়া যাইতে হইবে এবং মূলবিন্দু হইতে ৫ ঘর y-অক্ষের উপর উপরদিকে গুনিয়া যাইতে হইবে। ৪ এবং ৫ ঘরের বিন্দু দুইটি হইতে লম্ব টানিলে যেখানে তাহারা ছেদ করিবে "ক"র অবস্থান সেইখানেই হইবে। (১ম চিত্র দেখ) "খ" বিন্দুর অবস্থান তৃতীয় পাদে দেখান হইয়াছে। ইহার অক্ষগুলি যথাক্রমে x = —৪ এবং y = —৮। o বিন্দুর বামদিকে x অক্ষের উপর ৪ ঘর এবং y-অক্ষের নিম্নের ৮ ঘর নামিয়া ইহার অবস্থান নির্ণয় করিতে হইয়াছে।

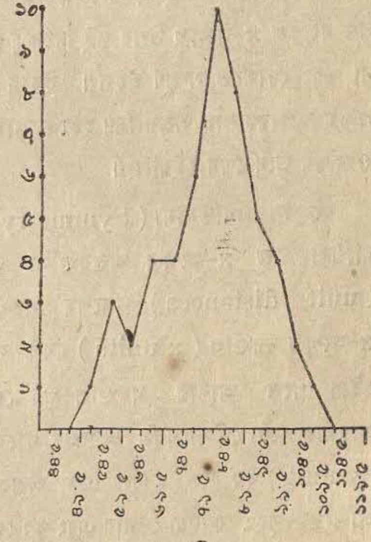
অনুরূপভাবে গ, ঘ বিন্দুকেও সংস্থাপন করা হইয়াছে। মূলবিন্দু হইতে x-অক্ষের উপর কোন বিন্দুর দূরত্বকে ভুজ (abscissa) বলা হয় এবং মূলবিন্দু হইতে y-অক্ষের উপর কোন বিন্দুর দূরত্বকে কোটি (ordinate) বলা হয়। গ বিন্দুর ভুজ—৫ এবং কোটি+৯, ঘ বিন্দুর ভুজ+৮ এবং কোটি—৩।

পৌনঃপুন্য বহুভুজ (frequency polygon) অঙ্কনের প্রণালী।

২য় চিত্রে পৌনঃপুন্য বহুভুজ (polygon) আঁকিতে ভুজকোটি তন্ত্রর কিভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা দেখান হইল। ১ম তালিকায় যে ৫০টি সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেই চিত্রাকারে এই লেখে প্রদর্শিত হইল। মূল বিন্দু হইতে অনুভূমিক রেখার (x-অক্ষ) উপর সমান দূরত্বে অন্তরগুলির সঠিক সীমাগুলি সংস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক অন্তরের পৌনঃপুন্যগুলি y-অক্ষের উপর রাখা হইয়াছে।

২য় সাফল্যাঙ্ক চিত্র—(১ম তালিকায় প্রদত্ত ৫০টি সাফল্যাঙ্ক হইতে সংস্থাপিত পৌনঃপুণ্য বহুভুজ)

১ম তালিকা থেকে দেখা যায় যে "৫০-৫৪" অন্তরের মধ্যে মাত্র একটি সাফল্যাঙ্ক আছে। চিত্রে ইহার অবস্থান দেখাইতে হইলে x-অক্ষের উপর ৫২ সাফল্যাঙ্কের (অর্থাৎ, ৪৯·৫—৫৪·৫ অন্তরের মধ্যবিন্দু) উপর আসিতে হইবে এবং y-অক্ষের উপর এক পর্যন্ত গুণিতে হইবে



২য় চিত্র

এবং পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী x এবং y অক্ষের নির্দিষ্ট দুইটি বিন্দু হইতে অঙ্কিত লম্ব যেস্থানে ছেদ করিবে তাহাই হইবে এই অন্তরের সংস্থান। এইরূপে '৫৫—৫৯' অন্তরের পৌঃপুণ্য তিন সুতরাং ইহার x-অক্ষের দ্বিতীয় বিন্দুটি "৫৪·৫—৫৯·৫" অন্তরের মধ্যবিন্দু হইতে y-অক্ষের তিনঘর উপরে থাকিবে। "৫৯·৫—৬৪·৫" অন্তরের দুইটি সাফল্যাঙ্ক, "৬৪·৫—৬৯·৫" অন্তরের চারটি সাফল্যাঙ্ক এবং অবশিষ্ট অন্তরগুলির পৌনঃপুণ্যগুলি অনুরূপভাবে অন্তরগুলির মধ্যবিন্দু হইতে উর্ধে y-অক্ষের সংখ্যানুযায়ী ঘর বরাবর সংস্থাপিত হইবে। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে

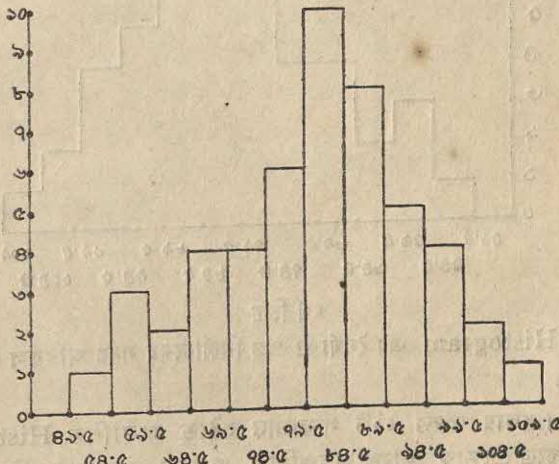
অন্তরের মধ্যবিন্দু সমগ্র অন্তরের প্রতিভূ। মধ্যবিন্দুর উপর কোটির উচ্চতা অন্তরের সমস্ত সাফল্যাঙ্কগুলির নির্দেশক। সমস্ত বিন্দুগুলি সংস্থাপিত (plotted) হইলে পর একটি রেখার দ্বারা তাহাদের পরস্পর যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ২য় চিত্রে প্রদর্শিত এইরূপ লেখচিত্রকেই পৌনঃপুন বহুভুজ বলা হয়। চিত্রটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য x-মানকের (x-scale) উপর নিম্নদিকে একটি অন্তর (৪৪·৫—৪৯·৫) এবং উর্ধদিকে আর একটি অন্তর (১০৯·৫—১১৪·৫) যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অন্তর দুইটির মধ্যবিন্দুর পৌনঃপুন্য শূন্য। সুতরাং পৌনঃপুন্য বহুভুজ x-অক্ষের উপর দুই দিকেই যুক্ত থাকিল। মধ্যে কিছু ফাঁক রহিল না এবং দেখিতে সম্পূর্ণ হইল। ইহার ফলে পৌনঃপুন্য বহুভুজটি x-অক্ষের প্রথম অন্তরের অর্ধ অন্তর নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ অন্তরের অর্ধ ও অন্তর উর্ধে শেষ হইয়াছে।

বহুভুজের প্রতিসাম্য (Symmetry) ও ভারসাম্য (balance) বজায় রাখিবার জন্য x-অক্ষের অন্তরগুলির ও y-অক্ষের পৌনঃপুন্যগুলির ঘরগুলি (unit distances) বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্বাচন করা উচিত। x-অক্ষের ঘরগুলি (x-units) বেশী লম্বা রাখিলে বহুভুজটি অতিরিক্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে আবার ঘরগুলি খুব ছোট হইলে বিভিন্ন বিন্দুগুলি অল্প জায়গার মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থায় থাকে। অপর দিকে y-অক্ষের ঘরগুলি (y-unit) খুব বড় হইলে এক অন্তর হইতে অন্য অন্তরের পরিবর্তনগুলি অতিরিক্ত বৃহৎ করিয়া দেখায় এবং খুব ছোট হইলে বহুভুজটি খুব চেপ্টা দেখায়। x এবং y অক্ষের ঘরগুলির দৈর্ঘ্য এমনভাবে ঠিক করা উচিত যাহাতে দৈর্ঘ্য প্রস্থের শতকরা ৭৫ ভাগ হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ হইলেও চিত্র সুসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। শতকরা ৭৫ ভাগের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় চিত্রটি অঙ্কিত করা হইয়াছে। চিত্রে বারটি সম্পূর্ণ অন্তর এবং গোচরের (range) প্রথম শেষের অর্ধ অর্ধ অন্তর লইয়া সর্বশুদ্ধ তেরটি বর্গ অন্তর (class-intervals) x-অক্ষের উপর রাখা হইয়াছে। সুতরাং তেরর শতকরা ৭৫ ভাগ অথবা x-অক্ষের প্রায় ১০ ঘরের সমান বহুভুজটি উচ্চ হওয়া দরকার। এই দশ ঘর (প্রত্যেক ঘর এক অন্তরের দূরত্বের সমান) y-অক্ষের

প্রত্যেক ঘর কয়টি পৌনঃপুন্য (f's) মাপিবে ঠিক করিতে হইলে সবচেয়ে বড় পৌনঃপুন্য যেটি এখানে ৭৯·৫—৮৪·৫ অন্তরের ১০ পৌনঃপুন্যকে ১০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। এখানে ভাগফল ১ হয় অর্থাৎ y-অক্ষের প্রত্যেক ঘর একটি সাফল্যাঙ্ক বা পৌনঃপুন্য (f) নির্দেশ করিতেছে।

স্তম্ভ পরিলেখ (Histogram or Column diagram)।

পৌনঃপুন্য বিস্তারকে (frequency distribution) চিত্রাকারে দেখাইবার আর একটি উপায় হইতেছে স্তম্ভ পরিলেখ অঙ্কন। ৩য় চিত্রে এইরূপ একটি স্তম্ভ পরিলেখ আঁকা হইয়াছে। ২য় চিত্রে পৌনঃপুন্য বহুভুজের দ্বারা যে সাফল্যাঙ্কগুলির বিস্তার দেখান হইয়াছে অবিকল তাহাই স্তম্ভ পরিলেখের দ্বারা ৩য় চিত্রে দেখান হইয়াছে দুই প্রকার চিত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে পৌনঃপুন্য বহুভুজে প্রত্যেক অন্তরের সাফল্যাঙ্কগুলিকে মধ্যবিন্দুর দ্বারাই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু histogarm-এ ধরা হয় যে অন্তরের মধ্যে সাফল্যাঙ্কগুলি সমানভাবে ছড়াইয়া আছে। Histogram-এর প্রত্যেক অন্তরের মানগুলি (measures) একটি আয়তক্ষেত্রের দ্বারা সূচিত হয়। অন্তরের দূরত্বের সমান আয়তক্ষেত্রের (Rectangle) তলদেশ base এবং সাকল্যাঙ্ক (f) গুলির সংখ্যার সমান ইহার উচ্চতা। "৪৯·৫—৫৪·৫" অন্তরের একটি সাফল্যাঙ্কের



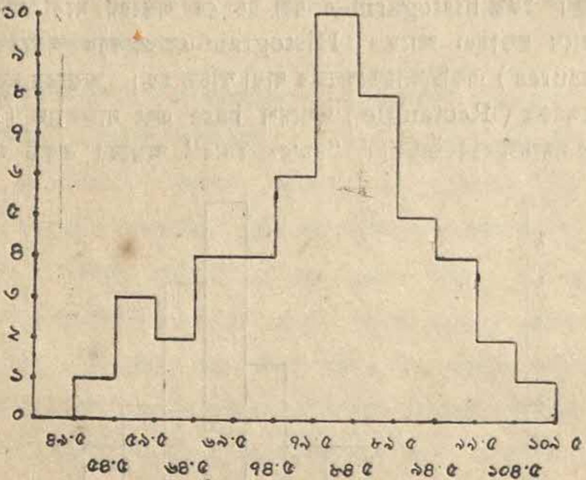
৩য় চিত্র

যে আয়তক্ষেত্র সংস্থাপন করা হইয়াছে তাহার তলভূমি ঐ অন্তরের সমান এবং

y অক্ষের একঘর সমান উঁচু। "৫৪'৫—৫৯'৫" অন্তরের তিনটি সাফল্যাঙ্ককে যে আয়তক্ষেত্র প্রদর্শন করিতেছে তাহার তলভূমি ঐ অন্তরের সমান এবং উচ্চতা y-অক্ষের তিন ঘর। এইরূপে সমস্ত আয়তক্ষেত্রগুলির তলভূমি এক অন্তরের সমান এবং পৌনঃ পুন্যের সংখ্যানুযায়ী উচ্চতা কমবেশী হইয়াছে।

১ম তালিকায় প্রদত্ত ৫০টি সাফল্যাঙ্ক হইতে সংস্থাপিত Histogram.

পর পর দুইটি অন্তরের পৌনঃপুন্য যদি সমান হয় যেমন "৬৪'৫—৬৯'৫" এবং "৬৯'৫—৭৪'৫" এই দুইটি অন্তরের পৌনঃপুন্য সমান (৪) তাহা হইলে অন্তরেরই শিরোরেখা একই হইবে। সবচেয়ে উঁচু আয়তক্ষেত্র "৭৯'৫—৮৪'৫" অন্তরের উপর আঁকা হইয়াছে কারণ এই অন্তরেরই সবচেয়ে বেশী পৌনঃপুন্য (১০) আছে। বহুভুজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্বাচন করিবার যে নিয়ম পূর্বে বলা



৪র্থ চিত্র

হইয়াছে Histogram এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ব্বাচনের সময় অবিকল সেই নিয়ম প্রযোজ্য।

১ম তালিকায় প্রদত্ত ৫০টি সাফল্যাঙ্ক হইতে সংস্থাপিত Histogram.

৩য় চিত্রে প্রত্যেক আয়তক্ষেত্রগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া আঁকা হইয়াছে। ঐভাবে না আঁকিয়া আমরা Histogram টিকে ৪র্থ চিত্রের মত নও আঁকিতে পারি। এখানে Histogram এর সীমারেখার উত্থান-

পতনের দ্বারাই এক অন্তর হইতে অন্য অন্তরের সাফল্যাঙ্কের কম বেশী সংখ্যা সূচিত হইতেছে এবং এই তথ্যটি জানাই আমাদের বেশী প্রয়োজন। বহুভূজের ন্যায় Histogram-এর ক্ষেত্রফল মোট পৌনঃপুন্যের সমষ্টি (N) সূচিত করে। প্রত্যেক অন্তরের সাফল্যাঙ্কের সংখ্যার সহিত Histogram-এর আয়তক্ষেত্রগুলি সমানানুপাতক (directly proportional) কিন্তু বহুভুজে এইরূপ অন্তর থেকে অন্তরান্তরে মোট পৌনঃপুন্যের আপেক্ষিক অনুপাতের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

সমক, মধ্যক ও ভূষক মাপনা।

যখন সাফল্যাঙ্কগুলি পূর্ব বর্ণিত পৌনঃপুনিক বিস্তারের (frequency distribution) মত করিয়া বিন্যাস করা হয় তখন একটি বা একাধিক মাপের দরকার হয় যাহা সমস্ত সাফল্যাঙ্কের একটি কেন্দ্রিয় অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ মাপ বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝিব তাহা নিম্নের বিশদ বিবরণী হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দুইটি কারণে এইরূপ মাপ লইবার প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ এইরূপ মাপ একটি দলের সমস্ত সাফল্যাঙ্কের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করা হয় অর্থাৎ সমগ্র দলের কর্মফলের মাপ এক কথাতেই ব্যক্ত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ দুই বা অধিক দলের কাজের মাপগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করা সম্ভব হয়। এইরূপ মাপ সাধারণতঃ তিনরকম আকারে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা গড় বলিতে যাহা বুঝি এই মাপগুলি প্রায় তাহাই। এই গড়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে—(১) সমক বা গড় (mean) (২) মধ্যক (mediam) এবং (৩) ভূষক (mode)

গড় কষিয়া বাহির করিবার প্রণালী

(১) সমক বা গড়—(M)

পৃথক পৃথক সাফল্যাঙ্কগুলিকে যোগ করিয়া যোগফলকে তাহাদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে তাহাদের গড় বাহির হয়। ধরা যাউক, কোন ভ্রমণকারী পাঁচদিন ধরিয়া দৈনিক ৬, ৮, ৭½, ১০ এবং ৮½ মাইল পথ হাঁটিল। তাহা হইলে সে গড়ে দৈনিক কত মাইল হাঁটিল। পাঁচদিন ধরিয়া প্রতিদিন সে যত মাইল হাঁটিয়াছে অর্থাৎ ৬+৮+৭½+১০+৮½=৪০ মাইলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ৮ মাইল অর্থাৎ দৈনিক গড়ে সে ৮ মাইল হাঁটিয়াছে। গড় মাপিবার সূত্রকে (formula) নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করা যায়।

$$M=\frac{Z\,X}{N} \qquad (\cdot)$$

সাফল্যাঙ্কের সংখ্যার প্রতীক—N X প্রত্যেক সাফল্যাঙ্কের পরিবর্তে বসিয়াছে এবং Z চিহ্ন সাফল্যাঙ্কগুলির—যোগফল নির্দেশ করিতেছে।

যদি সাফল্যাঙ্কগুলি পৌনঃপুন্য বিস্তারের মধ্যে বিন্যস্ত থাকে তাহা হইলে গড় বাহির করিবার প্রণালীর সামান্য পরিবর্তন করিতে হয়। ৩নং তালিকায় গড় বাহির করিবার প্রণালী দেখান হইল। উদাহরণে—২য় তালিকার সাফল্যাঙ্কের পৌনঃপুন্য

৩য় তালিকা

পৌনঃপুন্য বিস্তারে বিন্যস্ত উপাত্ত হইতে সমক, মধ্যক ও ভূষক কষিয়া বাহির করিবার প্রণালী—

শ্রেণী অন্তর সাফল্যাঙ্ক	মধ্যবিন্দু x	পৌনঃপুন্য f	f x
১০৫—১১০	১০৭	১	১০৭
১০০—১০৫	১০২	২	২০৪
৯৫—১০০	৯৭	৪	৩৮৮
৯০— ৯৫	৯২	৫—২০	৪৬০
৮৫— ৯০	৮৭	৮	৬৯৬
৮০— ৮৫	৮২	১০	৮২০
৭৫— ৮০	৭৭	৬—২০	৪৬২
৭০— ৭৫	৭২	৪	২৮৮
৬৫— ৭০	৬৭	৪	২৬৮
৬০— ৬৫	৬২	২	১২৪
৫৫— ৬০	৫৭	৩	১৭১
৫০— ৫৫	৫২	১	৫২
		N=৫০	৪০৪০

$$\frac{N}{2}=২৫$$

(১) $সমক=\frac{efx}{N}=\frac{৪০৪০}{৫০}=৮০\text{'}৮০$

(২) $মধ্যক=l+\left(\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}\right)i=৭৯\text{'}৫+\frac{২৫-২০}{১০}\times৫=৮২$

(৩) ভূষক=৮০—৮৫ অন্তরের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ ৮২।

বিস্তারটি লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অন্তরের মধ্যবিন্দু ও পৌনঃপুন্যকে গুণ করিয়া প্রথমে fx স্তম্ভে গুণফলগুলি রাখিতে হইবে। এইবার ঐ গুণফলগুলি যোগ করিয়া যাহা হইবে অর্থাৎ (৪০৪০) তাহাকে N অর্থাৎ সাফল্যাঙ্কের সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলেই সমক (৮০·৮০) পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক অন্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত সাফল্যাঙ্কগুলির যেন পৃথক অস্তিত্ব থাকে, মধ্যবিন্দুই তাহাদের মূল্য এক কথায় প্রকাশ করে। সুতরাং মধ্যবিন্দু যদি অন্তরস্থ প্রত্যেক সাফল্যাঙ্কের মূল্যমান হয় তাহা হইলে যতগুলি সাফল্যাঙ্ক ঐ অন্তরে আছে অর্থাৎ পৌনঃপুন্য দিয়া মধ্যবিন্দুকে গুণ করিলে পৌনঃপুন্যর মোট মূল্য পাওয়া যাইবে। পরে সমস্ত অন্তরের মোট মূল্যগুলি যোগ করিয়া N দিয়া ভাগ দিলেই গড় পাওয়া যাইবে।

এই সূত্রটিকে নিম্ন আকারে লিখা যায়—

$$M=\frac{ZFX}{N}$$

মধ্যক।

সাফল্যাঙ্কগুলিকে ছোট হইতে বড় বা বড় হইতে ছোট হিসাবে পর পর সাজাইলে যে রাশি হইবে তাহার মধ্যবিন্দুই মধ্যক। দুইরকম রাশির মধ্যবিন্দু আমাদের বাহির করিতে হইতে পারে অর্থাৎ রাশির সাফল্যাঙ্ক সংখ্যা জোড় বা বিজোড় হইতে পারে। ধরা যাউক ৭, ১১, ৯, ১৩, ১০, ১২, ১৪, ৬, এবং ৮ এই নয়টি সাফল্যাঙ্কের মধ্যবিন্দু বাহির করিতে হইবে। ইহাদের ছোট বড় হিসাবে পর পর সাজাইলে (৬, ৭, ৮, ৯, (১০), ১১, ১২, ১৩, ১৪) মধ্যক ১০ হইবে কারণ এই রাশিতে ১০ সাফল্যাঙ্কই মাঝখানে রহিয়াছে অর্থাৎ ১০ এর নীচে ৩টি এবং উপরে ৩টি সাফল্যাঙ্ক রহিয়াছে। তাছাড়া ১০, ৯·৫ হইতে ১০·৫ অন্তরেরও মধ্যবিন্দু, সুতরাং ১০ই মধ্যক। ইহা ত গেল বেজোড় রাশি হইতে মধ্যক গণনা কিন্তু রাশি যদি জোড় হয় যথা—

২১·৫

১৮, ১৯, ২০, ২১, ↑ ২২, ২৩, ২৪, ২৫

তাহা হইলে মধ্যক ২১·৫ হইবে। রাশি বেজোড় না হওয়ার কোন একটি পূর্ণ সংখ্যা মাঝখানে পাওয়া যায় না। উপর ও নীচের সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যবিন্দু বাহির করিতে গেলে দুইটি সংখ্যা ২১ এবং ২২ উভয়কে লইতে হয় কিন্তু মধ্যক একটিই হইতে পারে অতএব ২১ এবং ২২ এর মধ্যবিন্দু ২১·৫ বাহির করিতে হইবে এবং উহাই হইবে রাশির মধ্যক।

এইভাবে মধ্যক বাহির করিবার সূত্রটি নিম্নে দেওয়া হইল

$$\text{মধ্যক} = \frac{(N+১)}{২} \quad (\text{রাশির মধ্যে মধ্যকের ক্রমিক স্থান})$$

প্রথম উদাহরণে মধ্যক $\frac{৯+১}{২}$ অথবা ৫ম সংখ্যা অর্থাৎ ১০। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যক $\frac{৮+১}{২}$ অথবা ৪·৫ র্থ সংখ্যা অর্থাৎ ২১·৫।

এখন সাফল্যাঙ্কগুলি যদি পৌনঃপুনিক বিস্তারে বিন্যস্ত থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যক কিভাবে বাহির করিতে হয় দেখা যাউক। ৩য় তালিকায় এইভাবে মধ্যক বাহির করিবার উপায়টি বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু মধ্যক রাশির মধ্যবিন্দু, সুতরাং রাশির মধ্যের সংখ্যাটি বাহির করিবার চেষ্টা করা উচিত যাহার উপরে ও নীচে ক্রম অনুসারে সজ্জিত রাশির সংখ্যার অর্ধেক অর্ধেক থাকিবে।

$$\text{৩য় তালিকায় ৫০টি সাফল্যাঙ্কের } \frac{N}{2} = ২৫$$

সুতরাং উক্ত বিস্তারের মধ্যকে উপরে ও নীচে ২৫টি করিয়া সংখ্যা থাকিবে। নিম্নতম অন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে উর্ধতন অন্তরের মধ্যস্থ সাফল্যাঙ্কগুলি (অর্থাৎ পৌনপুণ্যগুলি) যোগ দিয়া গেলে অর্থাৎ নিম্নতম অন্তর ৫০—৫৫-র মধ্যে ১টি সাফল্যাঙ্ক আছে তাহার সহিত ৫৫—৬০-এর ৩টি যোগ করিয়া যোগফল ৪ হইল এই যোগফলের সহিত পরের অন্তর ৬০—৬৫-র ২টি সাফল্যাঙ্ক এইবার যোগ দিয়া (৪+২) ৬ হইল। এইভাবে যোগ দিতে দিতে দেখা গেল ৭৫—৮০ অন্তর অবধি উঠিয়া ২০ হইল। আমাদের আরও ৫টি সাফল্যাঙ্ক

হইলে তবে ২৫ পূর্ণ হয়। পরের অন্তর ৮০—৮৫ মধ্যে ১০টি সাফল্যাঙ্ক আছে। পূর্ববর্ণিত সূত্র অনুসারে এই ১০টি সাফল্যাঙ্ক অন্তরের মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া আছে ধরা হইয়াছে। এখন এই থেকে ২৫ পূর্ণ করিবার জন্য ৫টি বাড়তি সাফল্যাঙ্ক লইতে গেলে আমাদের $\frac{৫}{১০} \times ৫$ অর্থাৎ ২.৫ এই অংশটুকু ৮০—৮৫ অন্তরের প্রারম্ভিক সংখ্যা ৭৯.৫-র সহিত যোগ করিতে হইবে। ৭৯.৫ + ২.৫ অথবা ৮২ মধ্যক হইল।

পৌনঃপুন্য প্রসারে বিন্যস্ত উপাত্তের মধ্যক বাহির করিবার সূত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল

$$\text{মধ্যক} = b + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \right) i$$

b = মধ্যক যে অন্তরে আছে তাহার নিম্ন সীমা।

$\frac{N}{2}$ = সাফল্যাঙ্কের সংখ্যার অর্ধেক।

F = bএর নিম্নে যতগুলি অন্তর আছে তাহাদের মধ্যস্থ সাফল্যাঙ্কের যোগফল।

fm = মধ্যক যে অন্তরে পড়িয়াছে তাহার পৌনঃপুন্য (সাফল্যাঙ্কের সংখ্যা)

i = অন্তরের দৈর্ঘ্য

৩য় তালিকায় মধ্যক বাহির করিবার জন্য উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এখানে b = ৭৯.৫, N/2 = ২৫

F = ২০, fm = ১০ এবং i = ৫

$$\text{সুতরাং, মধ্যক} = ৭৯.৫ + \frac{২৫ - ২০}{১০} \times ৫$$

অথবা ৮২

ভূষক (mode)।

একটি সংখ্যা শ্রেণীর (series) মধ্যে যে সংখ্যাটি বেশীবার থাকে সেই সংখ্যাটিকেই ভূষক বলা হয়। ৮, ৭, ৭, ৯, ৯, ১০, ১০, ১০, ১২, ১২ সংখ্যা

শ্রেণীর মধ্যে দেখা যাইতেছে ১০ই বেশীবার আছে। সুতরাং এই সংখ্যা শ্রেণীর ভূষক ১০।

যখন সাকল্যাঙ্কগুলি পৌনঃপুন্যক বিস্তারে বিন্যস্ত থাকে তখন যে অন্তরে সবচেয়ে বেশী পৌনঃপুন্য থাকে তাহারই মধ্যবিন্দুকে ভূষক বলিয়া গণ্য করা হয়। ৩য় তালিকায় ৮০—৮৫ অন্তরের মধ্যেই বেশী পৌনঃপুণ্য আছে সুতরাং ইহার মধ্যবিন্দু ৮২ সাকল্যাঙ্কগুলির ভূষক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কোন্ দলের কৃত-কর্মের প্রতিভূ হিসাবে যে সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয় তাহাকেই আমরা গড় বলিয়া থাকি। যদি গড়ের সঠিকতার উপর বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সমক বাহির করাই সমীচীন। পরিসংখ্যানগত উচ্চ শ্রেণীর গণনায় সমকেরই ব্যবহার সমধিক হইয়া থাকে।

যখন তাড়াতাড়ি গড় বাহির করিবার প্রয়োজন হয় তখন মধ্যক বাহির করিলেই চলে।

ভূষকের ব্যবহার খুব অল্পই করা হয় এবং একপলকে মোটামুটি একটা গড় স্থির করার উপায় হিসাবেই ভূষক ব্যবহৃত হয়।

———

নির্জ্ঞান মন

আমরা যতক্ষণ জাগিয়া থাকি মন সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতনই থাকি। কিন্তু মনের এই সচেতন অংশই সব নয়, অচেতন অবস্থায় মনের এক বৃহৎ অংশ আমাদের মধ্যেই আছে। ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃসমীক্ষকেরা এই অচেতন মন বা নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে প্রভূত আলোক সম্পাত করিয়াছেন। মানসিক রোগগ্রস্থ লোকেদের চিকিৎসা করিতে করিতে নির্জ্ঞানের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে আমাদের চেতনা না থাকিলেও মানুষের চিন্তা, ভাব ও কর্মজীবনে ইহার অপরিসীম প্রভাব আছে এমন কি কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ললিতকলা, শিক্ষা ইত্যাদি সকলের উপর নির্জ্ঞানের অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই নির্জ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও উপলব্ধি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় কেননা শিশু পর্যবেক্ষণে ও শিশু শিক্ষা দানে এই ধারণা ও উপলব্ধি না থাকিলে অনেক জিনিসই অসম্পূর্ণ ও অসফল হইয়া যায় এবং বহু বিষয়ের রহস্য ভেদ হয় না ; ফলে শিক্ষক শিক্ষিকা কি করিবেন বুঝিতে পারেন না এবং হতাশ হন। এক কথায় এটুকু শুধু বলা যায় যে আধুনিক শিক্ষায় কৃতকর্ম হইতে হইলে নির্জ্ঞানকে জানিতেই হইবে।

অল্প পরিসরের মধ্যে মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা অসম্ভবই বলা যায় ; তবে শিক্ষক শিক্ষিকার একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করার চেষ্টা এখানে করা হইল।

শক্তি ও তেজ।

মানসিক জীবন শক্তি ও তেজের খেলা। মনের মধ্যে দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তি বিরাজমান। একটির নাম ইরস্ (Eros)। জীবন ও প্রেমই (love) এই শক্তির লক্ষণ। নিজের প্রতি ভালবাসা ও অন্যকে ভালবাসা,

নিজের এবং নিজবংশের জীবন ও ধারা রক্ষা করা—এসবেরই উৎস এই ইরস্ শক্তি। ইরসের বিপরীতশক্তি ধ্বংসের ও মৃত্যুর—জীবিত প্রাণীর মৃত্যু ইচ্ছা এবং জড়ত্বে প্রত্যাবর্তন করিবার অভিলাষ। এই মৃত্যু ইচ্ছা থেকেই আসে আত্মনিগ্রহ বা আত্মোপলুপ্তির অভিলাষ। আবার এই ইচ্ছা নিজের দিক থেকে যখন বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তখন বাহিরের বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুরতা ও আক্রোশে পরিণত হয়।

এই জীবনপ্রবৃত্তি বা ইরসের তেজকে বলা হয় কামশক্তি (Libido)। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি সীমার মধ্যে এই শক্তি আছে। এই কামশক্তির তীব্রতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব গঠন হইয়া থাকে—বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে এই শক্তি বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহার তারতম্যের ফলেই মানসিক স্বাস্থ্যের সাম্য বা অসাম্য ঘটিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ মানসিক শক্তি—রাসায়নিক বা দৈহিক শক্তির ইহা কোন অংশেই সমতুল্য নয়। কামশক্তি সমস্ত প্রকারের জীবন শক্তির প্রতিভূ হইলেও ইহার সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই যৌনবিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছে—সেইজন্যই কামবেগ ইহার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মনঃসমীক্ষায় কামকে নিছক যৌন ব্যাপার মনে করা হয় না; অর্থাৎ ইহা বলিতে নর নারীর যৌনইন্দ্রিয়ের সঙ্গম এবং সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই কেবল বুঝায় না। যতরকম কাজে মানুষ আনন্দ সম্ভোগ করে, তাহার সবার মধ্যেই কামশক্তি বিরাজমান। কামশক্তির প্রকাশ প্রেম—সে প্রেম আত্মপ্রেম হইতে পারে বাৎসল্য প্রেম হইতে পারে বা মানব প্রেম হইতে পারে।

এই কামশক্তির জীবনতেজ জন্মকাল হইতেই বর্তমান থাকে। বয়স্কদের মত শিশুদেরও আচরণ ইহার দ্বারা সমভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে শিশুদের মধ্যে কামশক্তি অস্পষ্টভাবে ছড়াইয়া থাকে। এই শক্তি সদা সক্রিয় এবং বেগবান। এই শক্তি নিজের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে এবং স্বকাম (narcism) জন্মায়। আবার ইহা বাহিরের বস্তু ও ব্যক্তির দিকে

প্রবাহিত হইতে পারে এবং বস্তুকাম জন্মায় (object-love)। ইহা আবার অলীক কল্পনা বিলাসেও রূপ লইয়া অন্তবৃর্ত (introversion) হইতে পারে। এই শক্তি কখনও কখনও শৈশবের প্রিয় জিনিস (love object) আঁকড়াইয়া থাকে বা সংবদ্ধিত (fixated) থাকে, আবার কখনও কখনও খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আবার শৈশবের প্রিয় বস্তুর দিকে পিছন ফিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে (regression)। এই শক্তি অবদমিত (repressed) থাকিতে পারে আবার সামাজিক বা বিশ্বজনীন মঙ্গলকর্মে বা শিল্পসৃষ্টিতে উদ্গত হইতে পারে (sublimation)।

মনঃ সমীক্ষণে কামশক্তি সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত অলোচনা আছে ধ্বংসাত্মক বা মৃত্যু প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা নাই এবং এই প্রবৃত্তির কোন নামও দেওয়া হয় নাই।

সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান।

মনের রাজত্বকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি স্তরের নামই সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান (Pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)

সংজ্ঞান বা সচেতন মন সম্বন্ধে বলার বিশেষ কিছু নাই। মনের মধ্যে কোন ক্ষণে যাহা বর্তমান আছে সে বিষয়ে আমরা পূর্ণরূপে সচেতন থাকি—মনের বিষয় বস্তু, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমরা অনুভব করি—এই বিষয় বস্তু, চিন্তা ভাবনা, কল্পনা—রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, প্রেম, প্রীতি, মমতা সবই হইতে পারে। মনের এই স্তর অন্য স্তরগুলির তুলনায় খুবই অল্পপরিসর। ইহার বিষয়বস্তু সর্বদাই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। খানিকটা বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি যেমন দৃশ্য, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদি। মনের নিম্ন স্তরগুলি হইতে অনেক বিষয়বস্তুই আমাদের চেতন মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবানুষঙ্গের (association of ideas) সাহায্যে আসংজ্ঞান মন হইতে অনেক বিষয়েই সংজ্ঞান মনে আনয়ন করা যায়। আসংজ্ঞানই স্মৃতির আধার। ইহা নির্জ্ঞান অপেক্ষা সংজ্ঞানেরই কাছা-

কাছি। অবশ্য ভাবানুষঙ্গের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে কত সহজে আসংজ্ঞানের বিষয় সংজ্ঞানে আনয়ন করা সম্ভব। ইহা ছাড়া আসংজ্ঞানে যে ভাবগুলি আমাদের পক্ষে রুচিকর নহে বা যাহা আমাদের মর্মপীড়া দেয় সেগুলি যাহাতে সংজ্ঞানে না আসিতে পারে তাহার জন্য মন সতর্ক থাকে এবং মনের এই প্রহরিতার (censorship) জন্য এই ভাবগুলি সংজ্ঞানে প্রবেশাধিকার পায় না।

ফ্রয়েডের মতবাদে নির্জ্ঞানের প্রাধান্যই বেশী। মনের অধিকাংশ অংশ লইয়াই নির্জ্ঞান মন। এই নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে আমাদের কোন চেতনা থাকে না কিন্তু এই অজ্ঞাত মন আমাদের চিন্তা ও কার্যের অমিত প্রভাব বিস্তার করে। সংজ্ঞান মনের চিন্তা ভাবনা অনুভূতি কথার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় এবং চেতন বিষয় বস্তুর মধ্যে থাকে একটি যুক্তির গ্রন্থনা। কিন্তু নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তুর এইসব বালাই একেবারে নাই—তাহা বাক্যে স্ফুট নহে; যুক্তির ধার ধারে না। বিপরীতধর্মী আবেগগুলি এখানে দ্বন্দ্ব না করিয়াই একত্রে সহঅবস্থান করিতে পারে। নির্জ্ঞানের মানস প্রক্রিয়াগুলিতে সমন্বয়ের অভাব—ইহাদের প্রকৃতি শৈশবোচিত ও আদিম। ভাব (idea) অপেক্ষা প্রক্ষোভ, কামনা ও প্রবৃত্তিই এখানে আধিপত্য করে। কিন্তু নির্জ্ঞান মনের বিষয় বস্তু আসিল কোথা হইতে? দুইদিক হইতে ইহা আসে। সংজ্ঞান হইতে যাহা অবদমিত হয় তাহা নির্জ্ঞান বিয়য বস্তুতে পরিণত হয়। আর কতকগুলি বিষয় থাকে যাহাদের সম্বন্ধে কখনও জানিতে পারি না। এগুলি যেন উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের মধ্যে বর্তায়। আদিম পূর্বপুরুষদের মনের স্মারকচিহ্নরূপেই তাহারা নির্জ্ঞানে বর্তমান থাকে।

অদস্, অহম্ ও অধিশাস্তা।

মনের মধ্যে অদস্, অহম্ ও অধিশাস্তা এই তিনটি সত্তা আছে। অদস্ (Id) সম্পূর্ণরূপে নির্জ্ঞান মনে থাকিয়া নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে। অদসই কামশক্তির আদি পিঠস্থান, সমস্ত সহজ প্রবৃত্তির উৎসমুখ। ইদসের

প্রকৃতি আদিম এবং সেইজন্য অন্ধের মত সে কেবল সুখ সূত্রেরই (pleasure principle) অনুসরণ করে অর্থাৎ কেবল সে তাহার প্রবৃত্তির তৃপ্তি চায় এবং দুঃখকে এড়াইয়া চলে। বাস্তবের সহিত ইহার কোন সংযোগ থাকে না—পরে অহমের মাধ্যমে বাস্তবের সহিত যুক্ত হয়। অদসের প্রকৃতির মধ্যে যুক্তি বা নীতির কোন অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যাহা কিছু আদিম ও প্রাণীসুলভ অদস্ তাহারই সমতুল্য।

অহম্ (Ego) খানিকটা সংজ্ঞান ও খানিকটা নির্জ্ঞান মনে বিরাজ করে। খুব শৈশবে অহম্ ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকে, কিন্তু বাস্তবের সংযোগে বা সংঘাতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। শৈশবের প্রিয় বা প্রেম বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সহিত একাত্মতার (identification) দ্বারা ইহা পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। এই প্রেম বস্তু বা প্রিয় পাত্র হিসাবে পিতামাতারই প্রাধান্য থাকে সবচেয়ে বেশী। স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের অহম্ বাস্তব সূত্র (reality principle) বা বাস্তব বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া চলে। অহম্ যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তবকে অনুভব করিতে সক্ষম। মনের নিম্নস্তরে অহম্ অদসের সহিত সংযোগ স্থাপন করে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাহার সহিত সহযোগিতা করে অথবা অন্য কথায় বলা যায় বাস্তবের সংঘর্ষ এড়াইয়া ইহা যতদূর সম্ভব অদসের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অন্যপক্ষে অবাঞ্ছিত বাসনা-কামনাগুলিকে ইহা সংজ্ঞানে আসিতে দেয় না। তাহাদের অদসের মধ্যেই অবদমিত করিয়া রাখে, অদসের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে ইহা নিয়ত নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে। অন্যপক্ষে অদসের যে প্রবৃত্তিগুলি অহিতকর নয় বলিয়া গণ্য হয় তাহাদের তৃপ্তির সুযোগ অহম্ করিয়া দেয়।

ব্যক্তিত্বের আর একটি গঠন হইতেছে অধিশাস্তা। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নৈতিক বোধ ও বাধানিষেধের রূপ এই অধিশাস্তা। এই বংশগতিলব্ধ নৈতিক বোধের সহিত যুক্ত হয় পিতামাতার কাছ হইতে প্রাপ্ত নৈতিক ধারণা। অধিশাস্তা এই দুইয়েরই মিশ্রিত ফল। অধিশাস্তার

প্রধান কাজ সমালোচনা ও বিচার। ইহার অনেকটাই নির্জ্ঞান মনে থাকে এবং সেজন্য অহমের অপেক্ষা ইহা অদসের নীতিবিরহিত (amoral) আবেগগুলির সহিত বেশী পরিচিত থাকে। এই কারণে ইহা অদসের প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমন করিবার জন্য অহমকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে। অধিশাস্তা ও অদসের যুদ্ধে অহম্ হয় যুদ্ধ ক্ষেত্র। সংজ্ঞানে অধিশাস্তা বিবেকরূপে প্রতিভাত হয়।

দ্বৈতবাদ ও দ্বন্দ্ব।

মনঃসমীক্ষণ মতবাদে অনেক দ্বৈতবাদের প্রচলন আছে। দুইটি পরস্পর বিপরীতধর্মী জিনিস লইয়াই দ্বৈতবাদ; পূর্বে জীবন ও মৃত্যু প্রবৃত্তি, সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান এবং অদস ও অহমের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব, ভালবাসা ও ঘৃণা এইরকমের অনেক বিপরীতধর্মী জোড়া আছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ জোড়া হইতেছে সুখসূত্র ও বাস্তবসূত্র। সুখসূত্র অনুসারে মানুষ সুখ পাইবার হইলেই তাহার তৃপ্তি চায় অথবা দুঃখ এড়াইতে চায়—এই সুখ পাওয়া সমাজানুমোদিত কিংবা শ্রেয় কিনা তাহা বিচার করে না কিন্তু বাস্তব সূত্র অনুযায়ী মানুষ সুখ পরিণামে অসামাজিক বা অহিতকর হইলে তাহা ত্যাগ করে এবং পরিশেষে শুভ পরিণাম প্রাপ্তির জন্য দুঃখকেও বরণ করে। সুখসূত্র মানিয়া চলে অদস্। খুব ছোট শিশুদের এবং উদ্বায়ু (neurosis) রোগগ্রস্থদের কার্য বা আচরণে সুখসূত্র পরিস্ফুট হয়। বাস্তব সূত্র অনুযায়ী অহম্‌কে দেখিতে হয় যে, যে কামনা-বাসনার নিবৃত্তি করিতে হইবে তাহা বহিঃজগতের আইনশৃঙ্খলা বা রীতি প্রথা অনুসারে অনুমোদিত কিনা। সমাজ বিধিবহির্ভূত কাজ করিতে গেলে দুঃখ বা শাস্তি পাইতে হয় সুতরাং এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে বাস্তব জগতের সহিত সংঘর্ষ না বাধাইয়া করা যায় ও ফলপ্রাপ্তি হয় অথবা বাস্তবের দাবী অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। শৈশবে সুখলালসা ও বাস্তব জগতের মধ্যে অহোরহ সংঘাত বাঁধিয়া যায় কিন্তু ক্রমশঃ একটি

শক্তিশালী অহমের বিকাশ হইতে থাকায় ইহার মধ্যস্থতায় সাধারণত একটি আপোষ স্থাপিত হয়। অহম্ সুখস্পৃহা ও বাস্তবের দাবীর মধ্যে একটি সুস্থ সমন্বয় আনয়ন করে। কিন্তু মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা মনের এই শান্তিজনক অবস্থা আনিতে অপারগ হয়।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধাপ।

মনঃসমীক্ষণ মতবাদের কেন্দ্রে রহিয়াছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারণা। এই বিকাশকে প্রধান তিনটি ধাপে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ধাপ জন্মকাল হইতে ৫।৬ বয়ঃক্রম পর্যন্ত, যাহাকে কচি অবস্থা (infantile period) বলা হয়। ইহার পর বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সময়কে অনুপক্রম কাল (latent period) বলা হয় এবং সর্বশেষ ধাপ ১৮ বা ২০ বৎসর বয়স অবধি থাকে যাহাকে কৈশোর কাল বলা হয়। প্রথম ধাপ অর্থাৎ কচি অবস্থা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাল বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সবিশেষ আগ্রহের সহিত এই অবস্থা অধ্যয়ন করা হয়। এই সময়ের বিকাশ বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দেহে সুখানুভূতির স্থানগুলি বা কামস্থানগুলি এই সময়ে নির্দিষ্ট হইতে থাকে এবং কামশক্তিকে সংলগ্ন করিবার পাত্রও শিশু খুঁজিয়া পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'কাম' এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কামশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহমের বিকাশও হইতে থাকে।

জন্মের সময় শিশুর কামশক্তি সর্বদেহে অস্ফুটভাবে ছড়াইয়া থাকে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরের তিনটি স্থানে যথাক্রমে ইহা কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। প্রথমে আসে মুখ-কাম অবস্থা (oral erotic stage)। এই সময় মুখেই কামশক্তির তৃপ্তি হইতে থাকে। মাতৃস্তন চুষিয়া ও পান করিয়া এবং আঙ্গুল চুষিয়া শিশু পরম পরিতোষ লাভ করে—ইহার পর সে চিবাইয়া ও কামরাইয়া আরাম পায়। চিবাইয়া ও কামড়াইয়া যে আরাম পাওয়া যায় তাহা মুখ-ধর্ষকাম (oral sadistic) অবস্থা বলা হয়। শিশুর মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা

এই অবস্থার ফলেই উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পর আসে পায়ু কামের (anal erotioism) অবস্থা এই অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগে এবং এতদসম্বন্ধিয় অঙ্গের মধ্য দিয়াই আসে সুখসম্ভোগ। এই অবস্থার প্রথমে মলমূত্র ত্যাগটাই সুখজনক থাকে কিন্তু মলমূত্র ধারণেই সুখানুভূতি পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সর্বশেষে শিশু লিঙ্গ-কাম (phallic stage) অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়। এই সময় যৌন অঙ্গের সুখপ্রদায়ী সম্ভাবনা সে আবিষ্কার করে এবং ব্যবহার করিতে থাকে। অবশ্য যৌবনাগমে কামেন্দ্রিয় যেভাবে ব্যবহার করা হয় এই সময় তাহা সেইভাবে ব্যবহার করা হয় না। বয়স্ক লোকেদের মধ্যে যে সব নানারকম গোলমেলে অবস্থা দেখা যায় সেগুলি বিকাশের এইসব প্রারম্ভিক অবস্থায় সংবন্ধন (fixation) অথবা প্রত্যাবৃত্তির (regression) ফলেই উৎপন্ন হয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কাম্‌ড়াইয়া শিশু যে সুখ উপভোগ করে সেই অবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি হইলে স্বভাবে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়—নিষ্ঠুর কাজকর্ম করিয়া যেন একপ্রকারের সুখ পাওয়া যায়। মলমূত্র রোধ করিয়া শিশু যে আরাম পায় সেই অবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি বা ফিরিয়া আসিলে লোভ ও একগুঁয়েমী উৎপন্ন হয়। বয়স্কব্যক্তিদের মধ্যে মুখ ও পায়জ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। সাধারণতঃ মাই ছাড়াইবার সময় মুখ-কাম ক্ষুণ্ণ হয় এবং মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার ফলে পায়ু-কাম ব্যাহত হয়। সার্থকভাবে এই কার্য সমাধা হইলে শিশু বাস্তব জগতের দাবী উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহার অহম্ শক্তিশালী হয়।

পূর্বে কামপাত্র খুঁজিবার কথা বলা হইয়াছে। এই অন্বেষণও তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথম অবস্থায় শিশুর কামপাত্র কেহই থাকে না। এই অবস্থায় কামসম্ভোগ শরীরের বিবিধ অনুভূতির মধ্যেই সীমিত থাকে। এই সময় কামশক্তি কোন কিছুকে আশ্রয় না করিয়া শিশুর নিজের দৈহিক সুখসম্ভোগেই ব্যাপৃত থাকে। অহম্ যখন বিকশিত হইতে আরম্ভ করে তখন কামশক্তি এই সদ্যজাত অহমের দিকে ধাবিত হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে নার্সিসম্ বলা হয়। গ্রীক উপকথায় বর্ণিত আছে যে রাজপুত্র নার্সিসাস্ জলে তাহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তিনি নিজের সঙ্গেই নিজে প্রেমে পড়িয়া

যান। এই প্রাথমিক নার্সিসাস্ অবস্থায় অহম্ অদসের তেজে মণ্ডিত হয়। মনের এই অবস্থা ন্যূনাধিকভাবে সারাজীবনই থাকে—বেশীমাত্রায় না হইলে থাকা বাঞ্ছনীয়ও বটে। এই নার্সিসিসমের অবস্থায় সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি হইলে আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের উদ্ভব হয়। কৈশোরে নার্সিসিসমের তরঙ্গ দ্বিতীয়বার জীবনের তটে আসিয়া লাগে। তৃতীয় অবস্থায় শিশু বাইরের কামপাত্রকে আবিষ্কার করে। স্বভাবতই পিতামাতার দিকেই তাহার কামশক্তি ধাবিত হয় কারণ তাহারাই বিশেষ করিয়া মা তাহার সর্বসুখের উৎস। লিঙ্গকামের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থা আসে।

ইডিপস গূঢ়ৈষা ও উপস্থচ্ছেদ

মনঃসমীক্ষণের অনেক আবিষ্কার অস্বাভাবিক ও উদ্ভুত বলিয়া মনে হয়—বিশেষ করিয়া শিশুর যৌনজীবন ও পিতামাতার প্রতি কামাসক্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা আপাত দৃষ্টিতে অশ্লীল, অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে এই আবিষ্কারগুলি মনঃসমীক্ষকদের স্বকল্পিত নহে। তাঁহারা রোগচিকিৎসা করিতে করিতে যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিয়াছেন তাহারই যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; শ্লীলতা বা শোভনতাকে বজায় রাখিতে গিয়া তাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্যকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে মতবিরোধ ও তর্ক যাহাই থাক আমরা, শিক্ষক শিক্ষিকা, এই মতবাদের সারাংশটি খোলা মন লইয়া জানিয়া রাখিব এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা যাচাই করিয়া দেখিব।

পূর্বে বলা হইয়াছে কামপাত্র নির্বাচনের (object choice) সময় উপস্থিত হইলে স্বভাবত শিশুর ভালবাসা পিতামাতার দিকেই যায়। পুত্রের মুখ-কাম তৃপ্ত হয় মাতৃস্তন্যের দুগ্ধপানে, চুষিবার আরাম এবং আহারের তৃপ্তি সে এইভাবে পাইতে থাকে। সে মায়ের প্রতিই আসক্ত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। লিঙ্গ কামের (phallic phase) আবির্ভাব হইলে মায়ের প্রতি এই আসক্তি কামাসক্তির রূপ ধারণ করে এবং ইডিপাস গূঢ়ৈষার (oedipus complex) সৃষ্টি হয়। গ্রীকদেশে একটি পৌরাণিক উপকথায় বর্ণিত আছে যে থিবের

রাজা ইডিপাস না জানিয়া তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিলেন এবং মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গূঢ়ৈষার নামকরণ হইয়াছে। মায়ের সহিত যৌনসম্মিলনের বালকের অজ্ঞাত ইচ্ছা এই গূঢ়ৈষায় ব্যক্ত হয়। এখানে এই কথাটা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে এই ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে থাকে এবং বালক কদাপিও এই ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। মার আদর আপ্যায়ন সোহাগ ভালবাসা বা মায়ের সহিত একত্রে শয়ন এই সবের ভিতর দিয়াই এই ইচ্ছার পূরণ হয়। প্রেমপাত্র হিসাবে মায়ের প্রতিরূপ (imago) নির্জ্ঞান মনে মনঃসৃষ্টি (fantasy) হিসাবে বিরাজ করে। মায়ের স্নেহভালবাসার ফলে যে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হয় তাহা নহে ইহা বালকের প্রকৃতির মধ্যে জন্মগত-ভাবে নিহিত থাকে। যে নির্জ্ঞান মন সে বংশানুক্রমে পায় তাহাতেই বাস করে এই গূঢ়ৈষা। মার প্রতি যৌন আকর্ষণ যত বাড়িতে থাকে তত বাবাকে বালক তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখিতে থাকে এবং বাবার প্রতি তাহার একটি আক্রমণাত্মক মনোভাব জন্মে যাহা তাঁহার ক্ষতি এমন কি মৃত্যুও কামনা করিতে পারে।

পিতৃ-ঘৃণার ফলে শৈশবে আর একটি গূঢ়ৈষার উদ্ভব হয়। বালকের একটি নির্জ্ঞান ভয় হইতে থাকে যে পিতা তাহার উপর প্রতিশোধ লইবে। এই প্রতিশোধ শারীরিক ক্ষতির আকার ধারণ করিতে পারে। এই সময়ে সে তাহার যৌন অঙ্গকে (penis) আবিষ্কার করে এবং এটি তাহার মূল্যবান সম্পদ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে এই নবাবিষ্কৃত ধন হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া তাহার ভয় হয়। ইহাকেই উপস্থচ্ছেদের ভয় (Castration Cómplex) বংশানুক্রমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বালক তাহার নির্জ্ঞান মনে বহন করিয়া আনে। এই ভয়ের ফলে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা নিরাকৃত হয় অর্থাৎ উপস্থচ্ছেদের ভয়ে বালক মাতার প্রতি অজাচারের (incestuous) ইচ্ছা ত্যাগ করে। একদিকে মাতার প্রতি কামাসক্তি তখন উদ্গতি লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ভালবাসায় পরিণত হয় এবং অন্যদিকে বালক পিতার সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে থাকে এবং পিতার কার্যফল সে তাহার নিজেরই বলিয়া মনে করে।

মেয়েদের বেলায় ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার আগে উপস্থচ্ছেদের ভয় আসে। বালিকা বালকদের মত পুরুষাঙ্গ তাহার মধ্যে না দেখিয়া সে নিজেকে ঐ অঙ্গ হইতে বঞ্চিত মনে করে এবং এই মাতাই এই অভাবের কারণ মনে করিয়া সমস্ত রাগ তাঁহার উপর গিয়া পড়ে। মাতার প্রতি ভালবাসা এইভাবে ঘৃণায় পরিবর্তিত হওয়ায় বালিকা পিতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং পৌরষহানির মর্মবেদনা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কিছুটা সান্তনা লাভ করে। এইভাবে বালিকার ইডিপাস গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হয়। বালিকাদের ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার সমাধান হইতে বালকদের অপেক্ষা দেরী হয়। বালকের ক্ষেত্রে উপস্থচ্ছেদের ভয় এই গূঢ়ৈষাকে নিরাকরণ করে কিন্তু বালিকার ক্ষেত্রে সেরূপ ভয় এ সময় থাকে না কারণ উপস্থচ্ছেদের ভয় এই গূঢ়ৈষা সৃষ্টির পূর্বেই বালিকার মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত মাতার সহিত একাত্মতা বোধ এবং পিতার প্রতি মনোভাবের উদ্গতির দ্বারা বালিকার মধ্যে ইডিপাস গূঢ়ৈষার সমাধান হয়। বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম রজদর্শনে বালিকার মধ্যে উপস্থচ্ছেদের গূঢ়ৈষার পুনরাবির্ভাব হইতে পারে। ইহা প্রকাশ পায় এই সময়কার ভয় ও লজ্জার মধ্যে।

ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বিকাশ।

এতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিত্ববিকাশের স্বাভাবিক ধারার বর্ণনা করা হইতেছিল। শৈশবে সবলোকেরই যৌন বাসনার গূঢ়ৈষা থাকে তবে স্বাভাবিক বিকাশের পথে উদ্গতি ও একাত্মীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলির যথেষ্ট পরিমাণে সমাধান হইয়া যায়। গূঢ়ৈষাগুলির সার্থকভাবে সমাধান না হইলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ অস্বাভাবিক হইতে থাকে এবং নানারকম অসুস্থ লক্ষণ প্রকাশ পায় যেগুলি মানসিক রোগেও পর্যবসিত হইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শৈশবের প্রেম-পাত্রের প্রতি যৌনাসক্তি উদ্গতির সাহায্যে নিছক স্নেহভালবাসা ও শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয় কিন্তু যদি এই যৌনাসক্তি স্বাভাবিক নিয়মে রূপান্তরিত না হইয়া শৈশবের প্রেমপাত্রেই আটকাইয়া থাকে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে সংবন্ধন (fixation) বলা হয়। এই অবস্থায় কামশক্তির বিকাশের পথ ব্যাহত হয় এবং শৈশব প্রেমপাত্রেই বন্দী হইয়া থাকে। এইরূপ

অবস্থায় দুইপ্রকারের মন্দফল ভুগিতে হয়। প্রথমতঃ বাস্তবের সঙ্গে যুঝিবার জন্য যে শক্তি ও তেজের প্রয়োজন তাহা কামশক্তি থেকে পাওয়া যায় কিন্তু বন্দী কামশক্তিকে এখন কাজে লাগান যায় না। শৈশব-সংবন্ধন যুক্ত ব্যক্তি এই কারণে জীবনযুদ্ধের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য কম শক্তি পায় এবং অল্পতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা মুষড়াইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ তাহার মনে যে অজাচারের ইচ্ছা আছে তাহাকে অবদমিত রাখিতে এবং চেতন মনে তাহার আগমনকে রোধ করিতে তাহার আরও বাড়তি শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। ইহার ফলে তাহার মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে পারিত শক্তির অভাবে অঙ্কুরেই তাহাদের বিনাশ সাধন হয়। একজন ব্যক্তি কতদূর এবং কি পরিমাণে কৃতকর্ম হইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে কত শক্তির অধিকারী সে হইবে। এই বিষয়টি শিক্ষক শিক্ষিকার অবহিত হওয়া দরকার এবং শিশুর জীবন বিকাশে এক্ষেত্রে তাঁহারা সক্রিয় সাহায্য দান করিতে পারেন। বিদ্যালয় পরিবেশ যদি এমন হয় যেখানে নানারকম ললিতকলা, শিল্পকর্ম, আদর্শ চরিত্র শিক্ষক শিক্ষিকা, দেশাত্মবোধ, বিনোদনাত্মক অনুষ্ঠান, জ্ঞানপ্রদায়ী কাজকর্ম ইত্যাদি থাকে তাহা হইলে উদ্গতি ও একাত্মীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং শিশুদের জীবনশক্তি এইভাবে বিস্তৃত ও বিকাশশীল হইতে পারে। তাহাদের দেহে মনে কাজ কর্মে চিন্তা ভাবনায় তখন নূতন তেজ নূতন উৎসাহ দেখা দিবে এবং ভিতরের শক্তি মুক্তিলাভ করিবে সার্থক জীবনের অগ্রগমনে। অতিরিক্ত কামশক্তি শৈশব ইচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে মানুষ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার জীবন উপযোজনের অক্ষমতা (maladjustment) এবং মনোব্যাধিতে বিড়ম্বিত হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে সংবন্ধনের মাত্রা নির্ভর করে ব্যক্তির ধাতুগত প্রকৃতির উপর। কাহারও কাহারও মধ্যে কামশক্তি যেন নড়িতে চায় না—একই জায়গায় লাগিয়া থাকে, স্থিতি স্থাপক গুণের অভাব হয় কিন্তু একথাও ঠিক যে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার উপরও কামশক্তির ক্রমবিকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা গৃহে, বিদ্যালয়ে এবং বাহিরের সমাজ-জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুকে প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা—বিদ্যালয়েতো দিতেই পারেন এমন

কি গৃহ সংযোগ এবং সম্প্রসারিত কার্যসূচীর (extension programme) মাধ্যমে গৃহে ও সমাজেও যাহাতে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা শিশু পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

অল্পাধিক মাত্রায় আমরা সকলেই শৈশব গূঢ়ৈবার অবশিষ্টাংশ পোষণ করিয়া থাকি এবং এইরূপ শৈশব-সংবন্ধনের ফলে বয়স্কদের আচরণের মধ্যেও কিছু কিছু অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আচরণ এত বিশৃঙ্খল হইয়া যায় যে শেষপর্যন্ত তাহা মানসিক রোগে গিয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি কারণ বা পরিস্থিতির ফলে স্বাভাবিক আচরণ মানসিক রোগে পরিবর্তিত হইতে পারে। অহম ও অধিশাস্তের কাছ হইতে অদস যদি অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে যথেষ্টভাবে সংগোপন করিয়া রাখিতে না পারে তাহা হইলে মনের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব ও গোলমাল আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবের সহিত বুঝিবার জন্য অহমের কামশক্তির প্রয়োজন সেজন্য যথেষ্ট কামশক্তি সংবন্ধন মুক্ত থাকা প্রয়োজন। বাস্তবের কঠিনতা বা সুসাধ্যতাও আচরণের উপর প্রতিফলিত হয়। যদি বাধাবিঘ্ন দুরতিক্রমনীয় হয় এবং জীবনে অনেক আশাভঙ্গ সহিতে হয় তাহা হইলে আচরণে তাহার পরিণাম শুভ হয় না। অহমের বিকাশ কিরূপ হইয়াছে তাহাও গুরুত্বপূর্ণ। সবল ও শক্তিশালী অহম মানসিক স্বাস্থ্য নানা অবস্থায় রক্ষা করে। আবার অহম যদি ছেলেমানুষের মত হইয়া থাকে এবং শৈশবকালীন মানসিক অন্তঃদ্বন্দ্বে জড়িত হইয়া থাকে তাহা হইলে পরিণত আচরণের ও মনোভাবের বিকাশ হয় না। শৈশব ইচ্ছাগুলির প্রতি অধিশাস্তার দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অধিশাস্তা এই ইচ্ছাগুলিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে আবার কঠোরতাও অবলম্বন করিতে পারে। অতিরিক্ত কঠোর অধিশাস্তা মনে আনে দারুণ বিষাদ এবং জীবনে কোন স্পৃহা থাকে না।

জন্মগত ও অবদমিত অদস্ ইচ্ছাগুলিকে বাস্তবের দাবীর সহিত মানাইয়া লইবার জন্য সুস্থ ও অসুস্থমনা ব্যক্তিরা কতকগুলি কৌশল বা ছলাকলা (mechanism) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভিতরে অদস্ ও অধিশাস্তার

চাপ এবং বাহিরে সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও বাস্তব জগত-ভিতরে বাহিরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির সহিত যুঝিবার জন্য অহম্ এইসব ছলচাতুরীর আশ্রয় লয়। কতকগুলি কৌললের ছায়া আদসের ইচ্ছাপূরণ হয় আর কতকগুলি অবদমিত বাসনা থেকে প্রতিরক্ষা (difence) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিরক্ষা হিসাবে যে সব কৌশল ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে **অবদমনই** (respression) মূল কৌশল। অধিশাস্তা—
এই কৌশলের সাহায্যে বেদনাদায়ক বা অস্বীকৃত ইচ্ছা বা ভাবকে চেতনমনে আসিতে দেয় না। বিপরীত আবেগ, মনোভাব বা ইচ্ছার দ্বারা অবদমিত ইচ্ছার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার আর একটি কৌশল আছে। যাহা এইরূপ **প্রতিক্রিয়ার আকার** (reaction formation) ধারণ করিয়া আসে। অনেক সময় অবদমিত যৌন বাসনা যৌন বিষয়ে উৎকট আশঙ্কার রূপ লইয়া আসে—যৌন ব্যাপারের প্রসঙ্গমাত্রেই এইরূপ লোক আঁৎকাইয়া উঠে এবং এবিষয়ে অতিরিক্ত লজ্জা ও চাপাচাপি ভাব দেখায়। পিতা বা মাতার প্রতি যদি অবদমিত আক্রোশ জমা থাকে তাহা হইলে তাহা এখন হয়ত তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাভক্তি ও কল্যাণ কামনার রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—এই প্রবচনটির মধ্যে এই কৌশলই ব্যক্ত হইতেছে। আমরা এমন কতকগুলি কাজ করি সেগুলির প্রেরণা আসে অবদমিত ভালবাসা বা আক্রোশ হইতে। কিন্তু এগুলিকে এইভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য দরকার হয় এসব কাজকে সমাজবিধি সম্মত যুক্তি দিয়া সমর্থন করা। এইরূপ করিলে আচরণের আসল উদ্দেশ্যকে অহমের স্বীকার করিবার দরকার হয় না। এই কৌশলকে যুক্ত্যাভাস বলা হয়। অনেক সময় আমাদের অক্ষমতা বা অবহেলা ঢাকিবার জন্যও যুক্ত্যাভাসের প্রয়োগ করিয়া থাকি যেমন, 'নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ'। অদসের যে ইচ্ছাগুলি আমাদের নিজস্ব বলিয়া মানিয়া না লইতে পারি সেগুলি অনেক সময় আরোপ করি বাহিরের বস্তু বা ব্যক্তির উপর। এই কৌশলকে বলা হয় **প্রক্ষেপ** (projection)। কাহারও নিজের ভিতরের ধ্বংসাত্মক বা অনিষ্টকারক ইচ্ছা

সে বাহিরের লোকেদের উপর আরোপ বা প্রক্ষেপ করিতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে অন্যেরা তাহার অনিষ্ট বা ক্ষতি করিতে চাহিতেছে।

অবদমন, প্রতিক্রিয়ার গঠন, যুক্ত্যাভাস এবং প্রক্ষেপ—এই কৌশলগুলি প্রতিরক্ষামূলক। আর কতকগুলি কৌশল আছে যেগুলির দ্বারা ইচ্ছাপূরণ হয়। এইগুলির মধ্যে **উদগতিই** (sublimation) মুখ্য। কামশক্তি যে লক্ষ্য পাইতে চায় তাহা অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত হইলে তাহা এমন আগ্রহে বা কার্যে রূপান্তরিত হইতে পারে যাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত পূর্বের আসল লক্ষ্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না। নানা পেশা বা বৃত্তি সম সামাজিক কাজকর্ম, ধর্ম,সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে যে আগ্রহ সঞ্চার হয়, দেখা যায় যে উদগতির সাহায্যেই কামশক্তির এইরূপ রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে।

একাত্মতা (identification) আর একটি মনের কৌশল। এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের মনোমত ব্যক্তিদের সহিত অথবা তাহাদের কীর্তি ও যশের সহিত একাত্মতা বোধ করিয়া তৃপ্তি পাই। প্রথমে ছেলেরা বাবার সহিত ও মেয়েরা মায়ের সহিত এইরূপ একাত্মতা অনুভব করে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বোধ, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, সর্বজীবে প্রেম সবই এই একাত্মত্য ভাবেরই সম্প্রসারণ। আবার অন্যদিকে সিনেমায় উপন্যাসে ভাল চরিত্রের সহিত অপরাধীদের সহিতও একত্মতা বোধ করিয়া আমাদের স্বভাবের একদিক অজ্ঞাতে তৃপ্ত হয়।

অবাঞ্ছিত কৌশলগুলির মধ্যে **প্রত্যাবৃত্তি** বেশী গুরুতর। কামশক্তি শৈশবে যেভাবে তৃপ্তি পাইত বয়স্ক মানুষের মধ্যে তাহা যদি সেভাবে তৃপ্তি পাইতে চায় সেই কার্যকেই **প্রত্যাবৃত্তি** বলে। বাস্তবের কঠোরতার সহিত যুঝিতে অহম অসমর্থ হইলে প্রত্যাবৃত্তির প্রবণতা জন্মে। এই অবস্থায় নানারূপ উদ্বায়ুসুলভ (neurotic) লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

অবদমিত আকাঙ্ক্ষা **মনঃসৃষ্টির** (fantasy) মধ্যে সহজে প্রকাশিত হইতে পারে। দিবাস্বপ্নের মধ্যে আমাদের যেন ইচ্ছাপূর্তি ঘটে।

অবদমিত কামনা বা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা শারীরিক রোগ

লক্ষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই বিপরিণাম (conversion) আখ্যা দেওয়া হয়। মানসিক দ্বন্দ্বের এইরূপ শারীরিক রোগ লক্ষণের ভিতর দিয়া সমাধানই বিপরীনামী হিষ্টিরিয়ার রূপ ধরিয়া আসে। অবদমিত ইচ্ছা বা তাহাদের বিরোধিতা ব্যথা বেদনা, অসাড়তা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগলক্ষণে রূপান্তরিত হয়।

কামজ (libidinal) তেজ যখন একটি ভাব হইতে অন্যভাবে সঞ্চালিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে **অভিক্রান্তি** (displacement) বলা হয়। স্বপ্ন ও প্রতীক আচরণ (symbolic behaviour) অভিক্রান্তি প্রক্রিয়ার দ্বারা বোঝা যায় ও ব্যাখ্যা করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলেই মিথ্যা আতঙ্কের (phobias) সৃষ্টি হয়। বদ্ধ স্থানের নির্দোষ পদার্থের অমূলক ভয় এই ভাবেই জন্মে। ভয়ের আসল কারণ থাকে মনের গভীরে সেই ভয় স্থানচ্যুত হইয়া অন্য পদার্থে বা অবস্থায় বর্তায়। এই অবস্থায় অন্য পদার্থ বা অবস্থা আসল ভয়ের প্রতিভূ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শক্তিশালী অবদমিত প্রবণতাকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না অথচ ইহার সহিত জড়িত প্রক্ষোভ প্রকাশ পাইতে পারে।

স্বপ্ন

স্বপ্নে নির্জ্ঞানের অবদমিত বিষয়বস্তু প্রকাশ পায়। নির্জ্ঞান কিভাবে কাজ করে বুঝিবার পক্ষে স্বপ্নই মনোসমীক্ষকদের প্রধান সহায়। অহং-এর নির্জ্ঞান অংশ স্বপ্নের মধ্যে খোঁজে আত্মতৃপ্তি। এই অংশের প্রকৃতি শৈশবোচিত ও যুক্তিহীন। স্বপ্ন অধ্যয়ন করিতে করিতে মনসমীক্ষকেরা এইসব তত্ত্বের সন্ধান পান।

মনঃসমীক্ষণের মতানুসারে সমস্ত স্বপ্নই অর্থপূর্ণ। যে স্বপ্ন দেখে তাহার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক দ্বন্দ্ব স্বপ্নের মধ্যে প্রতিভাত হয়। শুধু যে সমস্ত স্বপ্ন তাহাই নহে স্বপ্নের ছোট ছোট উপাদান বা অবস্থাও এদিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে স্বপ্নে যেসব দৃশ্য বা ঘটনা দেখা যায় শুধু তাহাতেই স্বপ্নের কোন অর্থ উপলব্ধি করা যায় না। এইগুলিকে স্বপ্নের **আপাত বিষয়**

(manifest content) বলা হয়। স্বপ্নের এই আপাত বিষয় প্রধানত দৃক প্রতিরূপ (visual imagery) আকারে প্রকাশিত হয়। এই আপাত বিষয় স্বপ্নের **অন্তরশায়ী বিষয়কে** (latent content) আবৃত করিয়া রাখে। এই অন্তশায়ী বিষয়কে উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে স্বপ্নের অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। নির্জ্ঞান কামনা ও উৎকণ্ঠা স্বপ্নের অন্তরশায়ী বিষয়। স্বপ্নের আকারে আসিতে গিয়া এইগুলি বিকৃত হইয়া যায়। জাগ্রত অবস্থাতেও নির্জ্ঞানের আবেগ চেতনা মনে আসিবার পথ খোঁজে কিন্তু অহমের সতর্কতায় তাহারা তখন আসিতে পারে না। ঘুমন্ত অবস্থায় অহমের পাহারা যখন কিছুটা শিথিল হইয়া পড়ে তখন নির্জ্ঞানের বিষয় আবির্ভূত হইবার সুযোগ পায়। তবে নিদ্রিত অহম যে একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে তাহা নহে। স্বপ্ন প্রহরীর (drem censor) আকারে অহম্ নির্জ্ঞান কামনাকে যথেষ্ট বাধা দেয়। এই প্রহরার প্রভাবে অদস্ স্বপ্নের যে সত্যকারের তাৎপর্য তাহা অহমের কাছে লুকাইতে বাধ্য হয় এবং ছদ্মাকারে স্বপ্নকে উপস্থাপিত করিতে হয়। যখন অদসের আবেগ বেশী শক্তিশালী হইয়া পড়ে অথবা তাহার ছদ্ম আবরণ খুব ক্ষীণ হয় তখন অহম্ খুব বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে এবং প্রতিরক্ষার জন্য হয়ত ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে যেমন স্বপ্নাতঙ্কে (night mare) আমরা জাগিয়া উঠি। যে উপায়ে অদস্ অন্তরশায়ী কামনাবাসনাকে স্বপ্নের আপাত বিষয়ে রূপান্তরিত করে তাহাকে স্বপ্নকার্য (dream work) বলা হয়।

মূলতঃ স্বপ্ন মাত্রেই ইচ্ছাপূরণের উপায়, তবে আপাত বিষয় বিভিন্নভাবে আহরিত হইতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহারই পুনরাবৃত্তি বা সম্প্রসারণ স্বপ্নের উপাদান হইতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অভিক্রান্তির ফলে প্রক্ষোভ তাহার আসল জিনিস হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্য জিনিসে বর্তায়। স্বপ্নের আপাত বিষয় ইহাও হইতে পারে। প্রতিকের (symbols) সাহায্যে এইরূপ অভিক্রান্তি সাধিত হইতে পারে। কতকগুলি প্রতীক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সৃষ্ট হয় কিন্তু এমন কতকগুলি প্রতীক আছে সর্বজনীন ও সর্বকালীক। সর্ব লোকের পক্ষেই এই প্রতীকগুলির

তাৎপর্য সমান। ফ্রয়েড এইরূপ কতকগুলি শাশ্বত প্রতীকের বর্ণনা করিয়াছেন। তরবারী, চাবুক, বৃক্ষ ইত্যাদি লম্বা ও সূঁচাল পদার্থ পুরুষের প্রতীক ; ঘর, পাত্র ও ব্যাগ নারীর প্রতীক ; সিঁড়িতে উঠা নামা করা রতিক্রিয়া নির্দেশ করে ; জল হইতে বাহির হইয়া আসা জন্মগ্রহণের প্রতীক। শাশ্বত প্রতীকের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল এইরূপ বহু প্রতীক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের অবদান।

ব্যক্তিগত অভিযোজনের (personal adjustment) যে সকল সমস্যা আছে তাহাদের উপর মনঃসমীক্ষণ যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়াছে। দলের সহিত অভিযোজন শিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ পূর্বে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বস্তুত অন্য ব্যবস্থা যতই ভাল হউক বা ব্যক্তিগত গুণাগুণ যতই থাকুক সফল অভিযোজন না হইলে শিক্ষা সার্থক ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মনোবিদরা সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ, মানসিক প্রতি-ক্রিয়া এবং ক্রিয়াত্মক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াগুলি লইয়া প্রধানত গবেষণা করিতেন। এইসব গবেষণার কাজ বিজ্ঞান সম্মত ও সঠিক হইলেও সত্যকার মানবজীবনে যে সব গুরুতর সমস্যা আছে সেগুলি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হইত না। মনঃসমীক্ষণ ব্যক্তিত্ব ও আচরণের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে মনোবিদদের অবহিত করিয়া তোলে।

মনঃসমীক্ষণে মানুষের আচরণের সক্রিয়তা ও প্রয়াসের দিকের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শিখন সক্রিয় লেনদেনের মধ্য দিয়া ঘটে। এই সত্য উপলব্ধি করিতে মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষাব্রতীদের সাহায্য করিয়াছে। পূর্বে শিখনে যে আগ্রহ সঞ্চার একান্ত প্রয়োজন এবিষয়ে শিক্ষাব্রতীরা ততটা সচেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু মনঃসমীক্ষণই আগ্রহ সঞ্চারের গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের মর্মোদঘাটন করিল। যদিও আগ্রহের উৎস সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাব্রতী ও মনোবিৎ ফ্রয়েডের সহিত একমত নহেন কিন্তু মনঃসমীক্ষণই মানবীয় প্রেষণা (human motivation) সম্বন্ধে অন্বেষণে তাঁহাদের প্রবৃত্ত করিয়াছিল এবং ইহার ফলে এ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীরতর উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন।

ফ্রয়েড দেখাইয়াছিলেন যে মানুষের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা সব যে কেবল সজ্ঞানেই সম্পন্ন হয় তাহা সত্য নহে। নির্জ্ঞানে যে শক্তিগুলি আছে মানুষের আচরণে তাহার যথেষ্ট এমনকি সর্বাত্মক প্রভাব আছে। আমরা মনে করি যে 'ভেবে-চিন্তে-বুঝে' আমরা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতেছি কিন্তু মনঃসমীক্ষণ দেখাইল যে সংজ্ঞানের চিন্তাযুক্তি ছাড়াই আচরণ বহুলাংশে নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয় যে সম্বন্ধে আমাদের কোন অনুভব থাকে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অভিযোজন বুঝিতে গেলে এই তত্ত্বটি জানা অপরিহার্য। শিশুদের নানা জিনিস শিখিবার প্রতি মনোভাব, শিক্ষনীয় বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করিতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং নানারকম সমস্যামূলক আচরণ বুঝিবার চাবিকাঠি নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক অর্জিত প্রবৃত্তি যেগুলির অস্তিত্ব মানুষ পরে ভুলিয়া যায় তাহারা যে কিরূপ অমিত ও অমোঘ প্রভাব তাহার আচরণের উপর বিস্তার করে তাহা দেখাইয়া মনঃসমীক্ষণ এই ভুলিয়া যাওয়া প্রবৃত্তিগুলির প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে সম্যক অধ্যয়ন করিতে মনোবিৎ ও শিক্ষাব্রতীদের প্রবুদ্ধ করে।

মনঃসমীক্ষণ দেখায় যে সর্বপ্রকার আচরণেরই নির্দিষ্ট কারণ থাকে। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত কারণটি বোধগম্য হয় না কিন্তু আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। অনেক জিনিস যেমন কথার ভুল বা বাতিক যেগুলি ভুলক্রমে বা দৈবাৎ ঘটে বলিয়া মনে করা হয় তাহাদেরও প্রেরণা মনের মধ্যে থাকে। খাপ খাওয়াইতে না পারা বা সমস্যা মূলক আচরণেরও আমরা কারণ খুঁজিয়া পাই না কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহাদের সুনির্দিষ্ট কারণ পরম্পরা খুঁজিয়া বাহির করা যায়। ব্যক্তি সম্বন্ধে এবং তাহার অতীত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য জানিতে পারিলে তাহার প্রত্যেক আচরণের কারণ বাহির করা যাইতে পারে।

মনঃসমীক্ষণ শৈশবকালীন বিকাশ এবং অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। শৈশবে দেহে মনে বাড়িয়া উঠার প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতা ব্যক্তির পরবর্তী জীবন ও আচরণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করে। সেইজন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচরণ বুঝিবার জন্য ইহা তাহার শৈশবের বিকাশ ও

শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যান্বেষণ করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সকল নাগরিক হইতে হইলে শৈশবের বিকাশ ও শিক্ষা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ইহার দিকে মনঃসমীক্ষণ মনোবিৎ ও শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Books Consulted :—

Skinner Charles E., and Harriman Philip Lawrence Eds. —*Child Psychology,* 1960.

Lindgren, Henry Clay.—*Educational Psychology in the classroom,* 1956.

Deese Games—*The Psychology of Learning.* 2nd Ed., 1958.

Strong Ruth.—*An Introduction to Child Study.* 4th Ed., 1959.

Keller, Tred S. *Learning—Reinforcement Theory.*

Skinner Charles E. Ed.—*Educational Psychology,* 3rd Ed., 1956.

Nunn, Sir Percy.—*Education : Its Data and First Principles.* 3rd Ed., 1949.

Allsoff, A. H.—*The Essentials of Psychology for Stndent Teachers,* 1954.

Ross, James S.—*Groundwork of Educational Psychology.* New edition, 1956.

Woodworth, Robert S. and Marquis Donal G.—*Psychology.* Ist Asian Ed, 1961.

Beaumont Henry and Macomber Freeman Glenn. —*Psychological Factors in Education,* Ist Ed., 1949.

Pressey Sidney L.—*Psychology in Education,* 1959.

Sorenson, Herbert—*Psychology in Education* 3rd. Ed. 1954.

Strong, Ruth—*The Role of the Teacher in Personnel Work.* 4th Ed., 1953.

Murphy, Gardner.—*An Historical Introduction to Modern Psychology*, 1938.

Woodworth, Robert S.—*Contemporary Schools of Psyeho-logy*. 2nd Ed., 1937.

Jones, Earnst.—*Papers on Psycho Analysis*, 1938.

Freeman, Frank N.—*Mental* tests, Rev. Ed., 1939.

Stratemeyer, Florence B. and others.—*Developing a Curriculum for Modern Living*, 2nd Ed., 1957.

Shaffer, Laurance Frederic and Shoben, L. Joseph, Jr. —*The Psychology of Adjustment*, 2nd Ed., 1956.

Garrett, Henry E.—*Statistics in Psychology and Education*, 5th Ed., 1959.

Walker, Helen M. and Lev, Joseph.—*Elementary Statistical Methods*. Rev. Ed., 1958.

———

পরিভাষা

অনুভূতি	...	Feeling
অন্তর্বৃত্তি	...	Inrtoversion
আসংজ্ঞান	...	Pre-conscious
উদ্গতি	...	Sublimation
কণ্ডরা	...	Tendan
কামশক্তি	...	Libido
ক্ষতিপূরণ	...	Compensation
নির্জ্ঞান	...	Unconscious
প্রত্যাবৃত্তি	...	Regression
প্রলক্ষণ	...	Trait
বস্তুরতি, বস্তুকাম	...	Object-love
মনোরোগবিদ্যা	...	Psychiatry
মনঃসমীক্ষণ	...	Psychoanalysis
মনঃসমীক্ষক	...	Psychoanalyst
মাপনা	...	Measurement
সংজ্ঞান	...	Conscious
সংবন্ধন	...	Fixation
স্বকাম	...	Narcism
যুক্ত্যাভাস	...	Rationalization

যাঁহারা শিক্ষার কার্যে ব্রতী হইতে চলিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই বইটি প্রধানতঃ লেখা হইয়াছে। অনুরাগী সাধারণ পাঠক পাঠিকাও বইটি পড়িয়া শিশুপালন ও শিক্ষায় মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ বুঝিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কার্যকরী অভিজ্ঞতার ফল বইটিতে স্থান পাইয়াছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে শিক্ষক শিক্ষিকা কিভাবে শিক্ষার কার্যে পূর্ণ উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত কার্যকরীভাবে কাজে লাগাইতে পারেন তাহা প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ সরল ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।